KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x 9.5" 17.78. x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩৮/২ ৩৮/৩ ৩৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ, আশ্বিন ১৩৮৩ কার্তিক - পৌষ ১৩৮৬ মাঘ - চৈত্র ১৩৮৬
	Condition : Brittle / Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৩

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

* চিত্তে ফুর্তি উত্তম লিভারের লক্ষণ

আপনার লিভার একটি আশ্চর্য যন্ত্র। নিত্য যে-আহার্য আমরা গ্রহণ করি তাতে পুষ্টিকর ও ক্ষতিকর দুই পদার্থই বর্তমান। লিভারের কাজ ক্ষতিকর পদার্থ বর্জন করে পুষ্টিকর পদার্থ সংগ্রহ করা। দুঃখের বিষয় আমাদের আহার্যে ক্ষতিকর পদার্থই বেশি। এর বিষক্রিয়ায় লিভার ক্রমশ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। ফলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়—আহারে অনিচ্ছা, রাত্রে অনিদ্রা, অকারণে ক্লান্তি, অবসাদ, ইত্যাদি। এমন অবস্থায় অবিলম্বে ভালো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত লিভারজেনের কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন

এখন ট্যাবলেট
আকারেও
পাওয়া যাচ্ছে

লিভারজেন

এখন ট্যাবলেট আকারেও পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবহারে বা বহনে এখন সুবিধে অনেক বেশি, খরচও অনেক কম

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ কলকাতা ১৪

PSL 3

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ আমেরিকার চিঠি ২১৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ এখন ভাবনা ২২২

দিনেশ দাস ॥ মরা ফেনা ২২৪

হরপ্রসাদ মিত্র ॥ সত্যি মশাই ২২৬

আবুল হোসেন ॥ দেবো, সব দেবো ২২৮

অম্লান দত্ত ॥ সোভিয়েত কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ২২৯

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥ নটি ২৩৯

আঁন্দ্রে জিদ্ ॥ সাহিত্যিক স্মৃতি ও বর্তমান সমস্যা ২৯৮

আলোচনা ॥ মোহিতকুমার হালদার, অমলেন্দু দাশগুপ্ত ৩০৮

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ৩১৩

সমালোচনা—অতীন্দ্রনাথ বসু, লীলা মজুমদার, সরোজ আচার্য, নরেশ গুহ, হরপ্রসাদ মিত্র ৩১৫

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

মামুলি চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করতে পারে, এমন একখানি বাংলা বই
'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেক বাঙালীর পঠনযোগ্য

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকে বৈদিক-হিন্দু-বৌদ্ধযুগ, পাঠান-মোগল ও বৃটিশযুগ পর্যন্ত বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে, প্রায় দুই শত গ্রামের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সমাবেশ ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব এ-বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেবল পুথিনির্ভর গবেষণার গতানুগতিক ধারার বিষয়ক ব্যতিক্রম। পরিশেষে ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীধরণী সেন প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন বিতর্কাধীন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

—'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' নামে প্রকাশিত রচনাবলীর পরিবর্ধিত ও পুনর্বিন্যস্ত গ্রন্থরূপায়ণ—

৫৬খানি আর্টপ্লেটে প্রায় ১৫০ হাফটোন চিত্র, যা পূর্বে অধিকাংশই প্রকাশিত হয়নি, বহু মানচিত্র ও রেখাচিত্রসহ, ৮১৬ পৃষ্ঠার বই, রেক্সিন বাঁধাই। মূল্য ১৮৲ টাকা।

পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠাগারিকরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। গ্রামাঞ্চলের ক্রেতারা স্থানীয় পুস্তক-বিক্রেতাকে অর্ডার দিন অথবা অগ্রিম মূল্য ও রেজিষ্ট্রী ডাকখরচ পাঠান।

সকলের পঠনযোগ্য ও সংগ্রহযোগ্য বই

॥ পুস্তক প্রকাশক ॥ ৮৷১বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অষ্টাদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

চতুরঙ্গ

কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩

আমেরিকার চিঠি

হুমায়ুন কবির

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সাম্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। নিগ্রোসম্প্রদায়ের প্রতি অবিচারের প্রসঙ্গ বাদ দিলে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় সামাজিক সাম্যের এত স্পষ্ট ও ব্যাপক নিদর্শন মিলবে না। আমেরিকার ইতিহাস এ সাম্যবাদী মনোভাবের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। নানাদেশের নানাজাতির বিদ্রোহীরা এসে এখানে ভিড় করেছিল বলে সকল রকমের সামাজিক স্তরভেদের বিরুদ্ধে আক্রোশ আমেরিকাবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য তার রকম বেরকম প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রতিক্রিয়ার পরিণতি হাস্যকর। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়েই আমেরিকা-বাসী সজোরে এবং সগর্বে ঘোষণা করেছিল যে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকবে না, রাজতন্ত্র বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু আমেরিকানের মনে অভিজাতশ্রেণীর প্রতি গোপন অনুরাগ নানাভাবে ধরা দেয়। এককালে ইয়োরোপের বিত্তহীন অভিজাতশ্রেণীর পুরুষেরা লুপ্ত ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের জন্য আমেরিকা যাত্রা করত। সে যাত্রা ব্যবসায় বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। বর্তমান যুগে সামরিক অভিযানের অবকাশ'ত নেই বললেই চলে। আমেরিকাবাসী ধনী কন্যাকে বিবাহ করে ঐশ্বর্য সংগ্রহের সাধনায় ইয়োরোপীয় বিত্তহীন অভিজাতের এ অভিযান বহুক্ষেত্রে কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির অবাধ সংমিশ্রণ ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশের বহু জাতি দেশ ও সভ্যতার সমাবেশ ও সহযোগের পরিচয়ও আমেরিকায় মিলবে। তিনশ' বছর আগে সে ইতিহাসের সূত্রপাত, কিন্তু তার গতি ও পরিমাণ গত একশ' বছরের মধ্যে যে ভাবে বেড়ে চলেছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না। এত রকম পাঁচ-মিশেলী সত্ত্বেও যে একটি বিশেষ আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গী ও আমেরিকান জাতি গড়ে উঠেছে, তার কারণ খুঁজতে গেলে যে সমস্ত শক্তি ও প্রভাবের পরিচয় মেলে, আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীকে তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। তাই আমেরিকার বিষয়ে কোন কথা বলতে চাইলেই আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থের খাতিরেও আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। আজকাল সবাই মেনে নেয় যে জনসাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বর্তমানে আলোচনার কোন অবকাশ নেই। তাই এ কথা বললে হয়ত আশ্চর্য শোনাবে যে ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আমেরিকার পূর্বে কোন দেশেই হয়নি। পুরাকালে কোন দেশেই সর্বসাধারণের শিক্ষার অধিকার বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়নি। অধিকারভেদের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা মুষ্টিমেয় লোকেই পেয়েছে। অধিকারভেদের ভিত্তি নিয়েও অনেক কথা বলা চলে। ব্যক্তিগত শক্তি বা গুণের বদলে বংশমর্যাদা দিয়েই সাধারণত অধিকার নির্ণয় হ'ত। ক্বচিৎ দু'এক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রম মিলবে, কিন্তু অধিকাংশের বেলায়ই কৌলিকবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন ব্যক্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। তারই ফলে ভারতবর্ষে জাতিভেদের পত্তন। গুণগত পার্থক্যের বদলে বংশগত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের মূল্যবিচারে ভারতীয় সমাজের অবনতিও তাই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই পুরাকালে বিদ্যার্জন সর্বসাধারণের পক্ষে দুর্লভ ছিল। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জ্ঞানভাণ্ডারকে যক্ষের ধনের মতন আঁকড়ে পড়ে থাকত—নিজেদের গোষ্ঠি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বাইরে যাতে সে জ্ঞান ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এক বিশেষ শ্রেণী জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করবে, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের শ্রেণীবিভাগ যে রকম স্পষ্ট এবং দৃঢ়, সর্বত্র তার পরিচয় না মিললেও এ শ্রেণীবিভাগের মূলতত্ত্ব প্রাচীনকালের প্রায় সকল দেশে ও সমাজেই মিলবে। সমাজের কার্যকলাপের তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ সে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিজের নিজের বংশগত বা কৌলিক কর্তব্যপালন বিধাতার বিধান বলে মেনে নিয়েছে। মধ্যযুগেও মোটামুটিভাবে একই ধারা চলে এসেছে। এখানে-ওখানে খানিক অদল-বদল সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে।

এই চিরাচরিত ধারাকে অস্বীকার করেই আমেরিকার বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। তাই সে বিপ্লবে রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে বংশগত মর্যাদা ও কৌলিন্যকে অস্বীকার করবার প্রয়াসও দেখা দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদের যাঁরা পত্তন করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও ধনী, তাঁদের অভিজাত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁরা এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের সমানাধিকারকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ না করলে আমেরিকার বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাঙলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা দেখি যে দিল্লীর প্রভুত্বকে অস্বীকার করার জন্য পাঠান সুলতানেরা মনেপ্রাণে বাঙালী বনে গিয়েছিলেন—অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবার জন্য আমেরিকাবাসী অভিজাত নিজের আভিজাত্যকে অগ্রাহ্য করে মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সকলের সমানাধিকার থাকবে এই স্বীকৃতির মধ্যেই আমেরিকার ভবিষ্যত শিক্ষাপ্রণালী ও আদর্শের সন্ধান মিলবে। প্রথম দিন থেকেই তাই আমেরিকার রাষ্ট্রনেতারা মেনে নিয়েছিলেন যে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অন্যতম অবশ্য কর্তব্য।

আদর্শ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই এ আদর্শকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু

স্বীকৃতির ফলে সর্বসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। ওয়াশিংটন ঘোষণা করেছিলেন যে শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা না হলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলতে পারে না। জেফারসন তাঁর বিভিন্ন সমাজসেবার উদ্যোগের মধ্যে সার্বিক শিক্ষাপ্রচলনের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিরাট দেশে জনসংখ্যার স্বল্পতার ফলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে। অল্প লোকের দ্বারা অনেক কাজ করাবার চেষ্টায় নানা ধরনের যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আমেরিকায় যন্ত্রসভ্যতার যে উৎকর্ষ, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না। যন্ত্রকে চালাতে হলে যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য, এবং সাধারণ শিক্ষার অভাবে যান্ত্রিক পারদর্শিতা বা কৌশল আসতে পারে না। আমেরিকার যন্ত্রসভ্যতার উৎকর্ষের প্রয়োজনেও তাই শিক্ষার প্রসার বেড়েছে। এবং প্রথম থেকেই সবাই মেনে নিয়েছে যে ব্যক্তি বা সমাজের প্রগতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আমেরিকায় তাই সর্বপ্রথম সার্বিক শিক্ষার প্রচলন হয়। গোড়ায় আমেরিকান নাগরিক চার পাঁচ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা পেত, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও পরিমাণ দুই-ই বেড়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক বালকবালিকাকেই বাধ্যতামূলকভাবে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হয়। এবং আজ দাবী উঠেছে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত করতে হবে। ষোল বৎসর পর্যন্ত স্কুলে থাকার অর্থ যে প্রত্যেক বালকবালিকা অন্তত দশ বৎসর শিক্ষালাভ করে, আঠারো বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বারো বৎসর হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষার এ রকম ব্যাপক ব্যবস্থা নেই। বিলাতে পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ রয়েছে, রুষ দেশে এখনো সে মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত, কিন্তু অল্পদিন হল সোভিয়েট রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত করেছে যে ১৯৬০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে সতেরো বৎসর পর্যন্ত করা হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকায়ও টনক নড়েছে, এবং কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত না হলেও অন্তত আঠারো বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলনের দাবী প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বাঁধাধরা শিক্ষা সুরু হয় ছয় বা সাত বৎসর বয়সে, কিন্তু তার আগেও শিশুদের জন্য নানা ধরনের মনোরঞ্জন ও মনোবিকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। কিণ্ডারগার্টেনত রয়েছেই, তা ছাড়াও বহু স্থানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন বৃত্তির পূর্ণ পরিণতির জন্য খেলাধুলা এবং একক বা সমবেত নানা ক্রিয়াপদ্ধতির আয়োজনের প্রভাব নেই। ভবিষ্যৎ নাগরিকের পূর্ণবিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা সমাজের সর্বপ্রথম কর্তব্য, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ নেই। ছোট ছোট সহর গ্রামগুলিতেও প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দালান কোঠা আসবাবপত্র সব এত পরিপাটি যে বহুক্ষেত্রে আমাদের দেশের কলেজেও তার তুলনা মেলে না।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং সর্বব্যাপী করে আমেরিকা তুষ্ট হয়নি, তাকে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ এবং সার্থক করবার জন্যেও চেষ্টার অন্ত নেই। শিক্ষার উৎকর্ষ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে, তাই শিক্ষকের কৃতিত্ব, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সঙ্গতির দিকেও আমেরিকা দৃষ্টি দিয়েছে। গত আট দশ বৎসরে শিক্ষকের অবস্থার অনেক উন্নতি

হয়েছে, কিন্তু তবু এ কথা মানতে হবে যে আমেরিকার সমাজে শিক্ষকের এখনো স্বকীয় মর্যাদা মেলেনি। কেবল আমেরিকা বলে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শিক্ষকের অর্থনৈতিক সংস্থান ভাবনার বিষয়। বহুক্ষেত্রে মোটা মেহনতের কাজের মজুরের যে আয়, প্রাথমিক শিক্ষককে তাই নিয়ে দিন যাপন করতে হয়। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় শিক্ষকের সংখ্যাল্পতার সমস্যা দেখা দিয়েছে, এবং তার সুযোগ নিয়ে সমাজের দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ শিক্ষকের আর্থিক অনটন দূর করবার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকায় বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাও প্রায় সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে স্কুলে যেতে হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ কিশোর কিশোরীই আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পাঠক্রম বজায় রাখে। তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। নানা দেশের যে সকল নরনারী আমেরিকায় অভিযাত্রী হয়ে এসেছিলেন, তাদের অধিকাংশই স্বদেশে শিক্ষার সুযোগ পাননি। প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত না হলেও তাঁরা সাহসে বুদ্ধিতে এবং বহুক্ষেত্রে চরিত্রেও বৈশিষ্ট—তা না হলে স্বদেশের পরিচিত পরিবেশ পরিত্যাগ করে বিদেশ বিভূঁয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় নামতেন না। আমেরিকায় এসে তাঁরা নিজের শক্তিতে নিজের ভাগ্য নির্মাণ করেছেন, তাই তাঁরা যে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে সকল রকম শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেবেন, তাতে বিচিত্র কি? আমেরিকার সমাজসংগঠনে যে বৈশিষ্ট্য, তার ফলে শিক্ষার জন্য আগ্রহ আরো প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার সামাজিক সাম্যের কথা আগেও বলেছি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সে সাম্য আরো সজীব হয়ে উঠেছে। সমাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে পৌঁছবার উপায় হিসাবে শিক্ষা আমেরিকায় যে ভাবে কার্যকরী, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। এককালে শিক্ষার অর্থ ছিল লেখা পড়া আঁক কষা। এক কথায় পুঁথি-সর্বস্ব বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষাকেই শিক্ষা মনে করা হত। যতদিন সমাজের এক নগণ্য অংশ শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিল, ততদিন এ ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা যখন প্রথম সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দিল তখনও এ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ছিল মোটে চার পাঁচ বৎসর, এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে লেখাপড়া আঁক কষা ভিন্ন অন্য কিছু শেখা সম্ভব হত না। তা ছাড়া শৈশবে ও প্রথম কৈশোরে বালক-বালিকাদের স্পৃহা, রুচি বা শক্তির বিশেষ কোন তারতম্য বোঝা যায় না। দশ এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালকবালিকাই একই ধরনের শিক্ষা লাভ করলেও তাই কোন ক্ষতি নাই। এগারো বারো বছর বয়সের পরে কিন্তু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটে হতে সুরু করে। বাধ্যতামূলক এবং ব্যাপক শিক্ষার মেয়াদ যখন চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়স ছাড়িয়ে সতেরো আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, তখন বিভিন্ন ধরনের রুচি ও স্পৃহা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার তারতম্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পুরাকালে এ সমস্যা কোনদিন প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ যে মুষ্টিমেয় কিশোর কিশোরী প্রাথমিক শিক্ষার দরজা অতিক্রম করে মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার স্তরে পৌঁছত, বুদ্ধিপ্রধান পুঁথিনির্ভর শিক্ষা তাদের রুচি ও স্পৃহার উপযোগী বলে তারা সহজেই সে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম কিশোর কিশোরীরা বহুল সংখ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রণী হয়। বর্তমানে বোধহয় শতকরা আশীজন কিশোর কিশোরীই মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, কিন্তু এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতিও বদলেছে। পুরাকালের পুঁথি-

সর্বস্ব শিক্ষার বদলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা মানব-চরিত্রের সমস্ত রুচি ও শক্তিকে বিকশিত করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রমের অবতারণা করেছে। ফলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা যে রকম বিচিত্র ও বহুমুখী, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কোনকালে অথবা বর্তমানে অন্য কোথাও তার নজীর মেলে না। শিক্ষার বৈচিত্র ও বহুমুখীনতা আমেরিকায় যে ভাবে বিকশিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্তের ফলে আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচিত্র ও বহুমুখী করবার প্রয়াস স্পষ্ট।

ভারতবর্ষে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল সংস্কারের দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে। যাঁরা এ দাবী তুলেছেন, তাঁদের প্রধান বক্তব্য যে প্রত্যেক মানুষের রুচি বা শক্তি অনুযায়ী তাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিলে তবেই সমাজ অধিক লাভবান হবে। কিশোর বয়সেই এ সমস্ত পার্থক্য প্রথম দেখা দেয়। তাই শৈশবে প্রাথমিক শিক্ষা একধর্মী হলেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে। আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বব্যাপী হবার ফলেই প্রথম এ দাবী উঠেছিল, এবং বর্তমানে প্রায় সমস্ত পৃথিবীই সে দাবী মেনে নিয়েছে।

শিক্ষাকে বহুমুখী করবার দাবী যে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার মানকে অবনত করেছে, সে কথাও মানতে হবে। নানান ধরনের রুচি ও স্পৃহার তুষ্টিসাধনের চেষ্টায় অনেক অনুপযোগী বিষয়েরও শিক্ষাক্ষেত্রে আমদানী হয়েছে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলা হয় যে আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলে রেকাবী বাসন ধোয়ার ক্লাশও খোলা হয়েছে, এবং তার জন্যও হয়তো ডিগ্রী দেওয়া হবে। হাসি ঠাট্টার কথা ছেড়ে দিলেও এ কথা মানতে হবে যে মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের দাবী মেটাবার বিভিন্ন উপাদান শিক্ষার বিষয় হিসাবে সমান উপযোগী নয়। পূর্বে এ বিষয়ে উন্মাসিকতা এবং সঙ্কীর্ণতার বাড়াবাড়ি ছিল, এক মানসিক উৎকর্ষের উপকরণ ভিন্ন অন্য কোন কারণে কোন বিষয়কে শিক্ষণীয় মনে করা হয়নি। ফলে গণিত, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি একান্তভাবে বুদ্ধিনির্ভর বিষয়ের মধ্যেই পাঠক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে যে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, তারও স্বীকৃতি এ সনাতনী শিক্ষা-দর্শনে মেলে না। বস্তুতপক্ষে বহুযুগ পর্যন্ত দর্শনের ছায়াচ্ছন্নতলে বিজ্ঞানের একটু সঙ্কুচিত স্থান মিলেছে, এবং এখনো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মতন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক দর্শন হিসাবেই বিজ্ঞানের পরিচয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্থান আজ কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি খানিকটা অবজ্ঞার মনোভাবের পরিচয় আজও মেলে। কৃষিবিজ্ঞান বা পশু-পালনতত্ত্ব সত্যিকার পাঠ্যবিষয় হতে পারে কিনা, তা নিয়ে আজও মাঝে মাঝে তর্ক ওঠে। কিন্তু আমেরিকায় এ সমস্ত বিষয় অধ্যয়নের ফলে সে দেশের যে আর্থিক ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি, তার ফলে আজ আর কেউ সরাসরিভাবে এ সমস্ত বিষয়কে অগ্রাহ্য করতে পারে না। দুটি কারণে আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার এ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। যতদিন সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষী ছিল, ততদিন সে শিক্ষা দর্শন-ঘেঁষা বলে কেউ আপত্তি করেনি। আমেরিকায় সে শিক্ষা প্রথম সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয়, এবং তার ফলে বিচিত্র রুচি ও শক্তির অধিকারী লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীর শক্তি সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী পাঠক্রমের দাবী প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অন্যদেশে হয়ত সে দাবী এত সহজে গৃহীত হত না, কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের ফলে নতুনকে গ্রহণ করতে আমেরিকাবাসী কখনো দ্বিধা করেনি। পূর্বেও বলেছি যে যারা এসে আমেরিকায় নতুন সমাজ পত্তন করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে এসেছিল। যারা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহ করেনি, তাদের মনেও প্রচলিত সমাজ বা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্য ও আদর্শের উত্তরাধিকারী বহু মানবের একত্র সমাবেশে কোন বিশেষ দেশের ঐতিহ্য বা আদর্শের বন্ধন স্বভাবতই শ্লথ হয়ে এসেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ এবং নানা ধরনের রুচি ও দাবী মেটাবার প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ তাই আমেরিকায় অতি সহজেই সাধিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্প্রসারণকে পৃথিবীর শিক্ষাতত্ত্বে আমেরিকার বিশেষ অবদান বলা চলে। বস্তুতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এত পাঁচমিশেলী আর কোথাও দেখা যায় না। রান্নাবান্না, সেলাই, কাপড়তৈরী—এককথায় ঘরকরনার সমস্ত কাজ শেখবার ব্যবস্থা স্কুলেই হয়। ক্ষৌরকর্ম, কাঠের কাজ, কামার কুমোরের কাজও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়। কৃষিকাজ বা গৃহপালিত পশুপাখীর দেখাশোনাও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে কোন কোন স্কুলে মোটর চালানো শেখানো হচ্ছে। এক কথায় ঘরে বা বাইরে করণীয় সকলরকম কাজেরই হাতে খড়ি শিক্ষায়তনে হয়। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্যুত নয়—প্রতিপদে জীবনের কাজের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ।

এ ব্যবস্থার ফলে নানারকমে আমেরিকার সমাজ লাভবান হয়েছে। শিক্ষায়তনে যদি সকল রকমের কাজ এক সাথে শেখানো হয়, তবে কোন বিশেষ বৃত্তির প্রতি বিরাগ বা অবজ্ঞার মনোভাব গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা স্বভাবতই কমে যায়। আমেরিকায় শ্রম ও শ্রমিকের যে ইজ্জত, মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমের ফলে তা সমস্ত সমাজে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলেই যে পৃথিবীর নানাদেশের নানা ভাষাভাষী নানাজাতির বংশধরেরা একপুরুষে পুরোপুরি আমেরিকান বনে যায়, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী বিকাশের ফলে বিভিন্ন দেশের যে সব ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসে, তারা নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় খুঁজে পায়। ভাষাপ্রধান পাঠক্রমে বিদেশাগত ছাত্রছাত্রীর যে অসুবিধা, নানাধরনের কর্মপ্রধান পাঠক্রমে তা' হয় না। ভাষা ভাল করে না জানলেও কাঠের কাজ বা লোহার কাজ বা সেলাই রান্না বিদেশাগত ছাত্রছাত্রী সহজেই শিখতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের আবহাওয়ায় ক্লাসে এবং বাইরে ইংরিজি ভাষার ব্যবহার সব সময়েই তারা শিখতে থাকে, এবং ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হবার আগেই তারা মনেপ্রাণে আমেরিকান হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে দেখা গিয়েছে যে বিদেশাগত আমেরিকানদের প্রথম পুরুষে ইংরিজি ভাষা সম্বন্ধে খানিকটা দুর্বল এবং স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি খানিকটা অনুরাগী থাকলেও দ্বিতীয় পুরুষে তাদের ছেলেমেয়েরা অত্যুগ্রভাবে আমেরিকান হতে চায়, পিতৃপুরুষের দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে অবজ্ঞা কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিকভাবে প্রকাশ পায়। তৃতীয় চতুর্থ পুরুষে সে উগ্রতা আবার কমে আসে, এবং তখন পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি নতুন অনুরাগ দেখা দেয়। এতে আশ্চর্য হবার কারণ নাই। যতদিন জাতীয়তা সম্বন্ধে নিজেদের বা অপরের মনে কোন সন্দেহ থাকে, তারা যে আমেরিকান সে কথা জোর করে জাহির করবার ততদিনই প্রয়োজন থাকে। সে সন্দেহ নিরসন হলে এবিষয়ে বাড়াবাড়িও থেমে যায়।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালী জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান উপায় এ কথা মেনে নিয়েও কিন্তু আমেরিকার শিক্ষাবিজ্ঞানীরা তার সমালোচনায় পঞ্চমুখ। তাঁদের মতে

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাধারার গলদের ফলেই আমেরিকার জীবনে বহু গ্লানি দেখা দিয়েছে। আমেরিকায় শিক্ষার মান কমে গিয়েছে এবং এখনো কমছে। একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যতখানি শেখে, জানে এবং বোঝে, বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতে ইয়োরোপের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক স্কুল শেষ করবার আগেই তা আয়ত্ত করে। বর্তমানে আমেরিকার সমাজজীবনে যে চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা, নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের বিকাশ, বহু শিক্ষাবিদের মতে অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাই তার জন্য প্রধানত দায়ী। যাঁরা এ ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচক, কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যুক্তিদোষে দুষ্ট হলেও তাঁদের বক্তব্যের দু'টি প্রধান কথা অস্বীকার করা চলে না।

বিরুদ্ধ সমালোচকদের মতে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বড় গলদ এই যে শিক্ষা সম্প্রসারণের অজুহাতে শিক্ষাধারার ঐক্য ও সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। বিভিন্ন রুচি ও শক্তির অধিকারী বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের রুচির দোহাই দিয়ে যদি কেবলমাত্র তাদের মর্জি মাফিক বিভিন্ন বিষয় পড়তে দেওয়া হয়, তবে শিক্ষা নিরর্থক হয়ে পড়তে পারে। বর্তমানে আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের যে ফিরিস্তি থাকে, তাদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, বহুক্ষেত্রে কোন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা পর্যন্ত নেই। ছাত্রছাত্রীরা সেই বিচিত্র বিষয় সমাবেশের মধ্য থেকে খুশীমত কয়েকটি বিষয় বেছে নেয়, কিন্তু সে সমস্ত বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ বা সম্বন্ধ আছে কিনা তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। অসংবদ্ধ কতগুলি বিষয় সম্বন্ধে তথ্য হয়ত শেখে, কিন্তু তাতে পুরোপুরি মানসিক বিকাশ হয় না। সাহিত্য, গণিত বা ইতিহাস না পড়েও লোকে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে সেখানে শিক্ষা প্রণালীতে গলদ রয়েছে এ কথা মানতেই হবে। মাধ্যমিক স্কুলে যদি সাতটি বিষয় পাঠ্য নির্ধারিত হয়, ছাত্র বা ছাত্রী হয়ত ইংরিজি, মোটর চালানো, ব্যায়াম, ভূগোল, কাঠের কাজ, সেলাই এবং ক্ষৌরকর্ম এই সাতটি বিষয় নিয়ে ফিরিস্তি ভরে দিল, কিন্তু তার ফলে তার না হ'ল মানসিক বিকাশ, না হ'ল বিশেষ কোন বৃত্তি বা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ। এক কালে মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীর বিষয় নির্বাচনের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাকত না। ফরাসী বিপ্লবের পরে নেপোলিয়ন যে পাঠক্রম সংগলিত করেছিলেন, তাতে ভাষা, সাহিত্য গণিত ইতিহাস ভূগোল প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য ছিল। বর্তমানেও রুশ দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যে পাঠক্রম, তাতে ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে সমস্ত বিষয় পড়তে হয়, ব্যক্তিগত রুচি বা স্পৃহাকে বিন্দুমাত্র স্বীকার করা হয় না। এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে আমেরিকা একেবারে বিপরীত মুখে চলেছে। আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর অবাধ স্বাধীনতা ও রুষদেশের শিক্ষাপ্রণালীতে নির্বাচনের অধিকার পর্যন্ত অস্বীকার—এ দু'টি বিরোধী আদর্শের সমন্বয় করে একপক্ষে নির্বাচনের স্বাধীনতা ও অন্যপক্ষে পাঠক্রমের সংহতি স্থাপন করতে পারলেই মাধ্যমিক শিক্ষার সত্যিকার উৎকর্ষ সম্ভব হবে।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় গলদ শিক্ষার মানের অবনতি। সমাজের সকল ছেলেমেয়েরাই মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, অথচ সকলের সে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় সাধারণভাবে এ মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে যে ছেলেমেয়েদের সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে, তারা যেন কখনো আশাভঙ্গের মনোকষ্ট না পায়। পূর্বেই বলেছি যে সারা আমেরিকায় উৎসাহ এবং সাফল্যের এমন একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছে যে পরাজয় বা বাধাবন্ধকের কথা তারা শুনতেই চায় না। এ-রকম মনোবৃত্তি কাজে উৎসাহ

এনে দেয়, কিন্তু মানুষের জীবনে জয়পরাজয় দুইকেই সমানভাবে গ্রহণ করতে না পারলে কখনো কখনো বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অন্যক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যকে এমনভাবে বড় করে দেখবার ফলে শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে। কিশোর বয়সে কেউ যেন বিফলতার দুঃখ না পায় এ দাবী মেটাবার চেষ্টায় পরিশ্রম বা সাধনার মূল্য কমে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা জানে যে লেখাপড়া করুক আর না করুক, অধীত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিক আর না দিক, তাদের স্কুল জীবন সফল হবেই, কাজেই অল্পবয়স থেকেই তারা পড়ালেখাকে খানিকটা অবহেলা করতে শেখে। অবশ্য সকলের বেলায় এ কথা খাটে না। আমেরিকাতেও সত্যিকার জ্ঞানসাধকের অভাব নেই, কিন্তু তাদের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অন্যদেশের সঙ্গে তুলনীয় হলেও শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে অনেক কম। আমেরিকার বহু শিক্ষাবিদ খেদের সঙ্গে বলেছেন এবং আজো বলেন যে সতেরো আঠারো বৎসর বয়সে আমেরিকান তরুণ তরুণী সাধারণত যে জ্ঞানের অধিকারী, বহুক্ষেত্রে ইয়োরোপের কিশোর কিশোরীরা পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই তা অর্জন করে। এমন কি আমেরিকার প্রতিবেশী ক্যানাডায় সতেরো বৎসরের শিক্ষার্থীকে যতখানি শিখতে হয়, আমেরিকান শিক্ষার্থীর তুলনায় তা অনেক বেশী।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার এ দুর্বলতা কলেজী শিক্ষায় বহুপরিমাণে দূর হয়ে যায়। পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় কাজের অভাব নেই। অভাব মানুষের। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার পরেও যারা বিদ্যা অর্জন করতে চায়, তারা নেহাৎ জ্ঞানান্বেষার জন্যই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। অর্থোপার্জনের দাবী মেটাবার জন্য কলেজী শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রবাহূতের স্থান নেই বললেই চলে। মেধাবী ও একাগ্র ছাত্রই কলেজে ভর্তি হয়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার গলদ শোধরাতে দু'এক বৎসর কেটে যায়। কলেজের তৃতীয় বৎসরের পর থেকে এবং বিশেষ করে প্রথম ডিগ্রীলাভের পরে আমেরিকায় শিক্ষার যে মান, পৃথিবীর যে কোন দেশের শিক্ষাধারার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গলদের বিষয় কিন্তু আজ আমেরিকার শিক্ষাবিদ খুবই সচেতন হয়ে পড়েছেন। আমেরিকার বিপুল ঐশ্বর্য এবং জনসাধারণের সহৃদয় ব্যবহার ও উদারতা সত্ত্বেও দেশে বিদেশে আমেরিকানদের নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়। ইয়োরোপের লোক সবরকমে আমেরিকার সাহায্য নিয়েও আমেরিকাবাসীকে খানিকটা অবজ্ঞা করে। এককালে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায়নি। আমেরিকাবাসী স্বদেশ ও স্বজাতি নিয়ে মশগুল থাকত, বাহিরের পৃথিবীর ব্যাপার নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাত না। দুই মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সে অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। বর্তমানে বহু ব্যাপারে আমেরিকাবাসীর হাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব এসে পড়েছে, কিন্তু তবু ইয়োরোপের বাসিন্দা তাদের পুরোপুরি স্বীকার করতে চায় না। গত চল্লিশ বৎসরে আমেরিকা বিভিন্ন দেশকে নানাভাবে যে বিপুল সাহায্য করেছে, মানুষের ইতিহাসে তার তুলনা সহজে মিলবে না, কিন্তু যারা উপকার পেয়েছে, তারাও তা' স্বীকার করতে চায়নি। বস্তুতপক্ষে বহুক্ষেত্রে উপকারের প্রতিদানে আমেরিকার ভাগ্যে বিরাগই জুটেছে বেশী।

আমেরিকার অনেক শিক্ষাবিদেরা মনে করেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতা এ অবস্থার জন্য দায়ী। সুসংবদ্ধ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করলে সংহত ও আত্মস্থ মানুষ গড়ে উঠবে। বিভিন্ন বিষয় এলোপাথারী ভাবে পড়লে চরিত্রেও যে খানিকটা অনুশাসনহীনতা আসবে তাতেও বিচিত্র কি? মাধ্যমিক শিক্ষার শ্লথতার ফলে ব্যক্তি-চরিত্রে দৃঢ়তা আসে না, এবং

বয়স্ক আমেরিকানের মধ্যেও কৈশোরসুলভ চপলতা থেকে যায়। খালি চপলতা বলে নয়, কৈশোরের যে আত্মপ্রত্যয়, বয়স্ক লোকের মধ্যে তার অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখলে অনেক সময়ে বিসদৃশ লাগে। কঠিন সমস্যার জটিলতাকে অস্বীকার করাও তরুণসুলভ অনভিজ্ঞতার পরিচয়—বহুক্ষেত্রে জটিলতম রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার যে সহজ সমাধান আমেরিকাবাসী করতে চায়, তাতে অন্য দেশকর্মীর মনে যুগপৎ উপহাস ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই সব কারণেই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমেরিকাবাসীর প্রতি খানিকটা বিরাগ জমে উঠেছে, আমেরিকান চরিত্রের বিপুল উদ্যম, বিরাট কর্মক্ষমতা ও উদার সহৃদয়তার পুরোপুরি কদর হয়নি।

[ক্রমশঃ]

এখন ভাবনা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এখন একটু চোখে চোখে রাখো—
দিনগুলো ভারি দামালো;
দেখো,
যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামালো দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
গড়াতে গড়াতে
আগুনের মধ্যে না পড়ে।

আমার ভালবাসাগুলোকে নিয়েই
আমার ভাবনা।
এখন সেই বয়েস, যখন
দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—
কাছেরটাই ঝাপসা দেখায়।

এখন সেই বয়েস, যখন
আচমকা মাটিতে
প'ড়ে যেতে যেতে মনে হয়
হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভাল হত।
পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর দুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র;

দেয়ালে গুলীর দাগ,
ভাঙা শ্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত।
মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নিচে
যৌবনকে পণ ধরেছে জীবন।

ঠিক তেমনি দূরে,
কত দূরে ঠিক জানি না,
আজও দেখতে পাচ্ছি—
হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে।
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে
আমি তার বলিষ্ঠ হাত দুটো দেখতে পাচ্ছি
আমি শেষ বারের মত
মাটিতে প'ড়ে যাবার আগে
আমার ভালবাসাগুলোকে
নিরাপদে তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই।

মরা ফেনা

দিনেশ দাস

হঠাৎ নক্ষত্রলোক থেকে
পিছ্‌লিয়ে পড়েছি অথই
বিস্তীর্ণ বালির তটে,
ছোট এক বালির মতই।
সারাদিন মৃতবৎ
অবাক্‌ বিস্ময়ে শুনি সমুদ্রের গম্ভীর ধ্রুপদ,
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
অজস্র সবুজ জল
উজ্জ্বল
অপার,
আর এক পৃথিবী যেন সবুজ পাতার।

কখন
এলো সে চোরা-ঢেউয়ের মতন,
সে এক নুলিয়া-মেয়ে
যেন নীল সমুদ্রের টুক্‌রো মনে হয় :
বুকেতে জমাট দুটি নীল মেঘ—
ফসলের সম্ভাবনা, সৃষ্টির আবেগ;
ভ্রূভঙ্গে তরঙ্গ-ভঙ্গ, চোখে মহাসমুদ্র বিস্ময়।

সে এক আশ্চর্য মেয়ে :
স্বচ্ছ-নীল দেহের ভিতর দিয়ে তার
দেখি দূর-সমুদ্রের অগাধ বিস্তার,
যেখানে সমুদ্র-দিন মাথামাখি হাওয়ায় ফেনায়
বিচিত্র আলোর রঙে আপনার মুখ দেখে
জলের বিরাট আয়নায় :
কখনো বা জলের ধনুকে
অসংখ্য ফেনার ফুলে ভেঙে পড়ে কল-কোতুকে।

সে-মেয়ে কখন গেছে নেমে
বালি ভেঙে ভেঙে,
চকিতে
এখনো আমি পারি চিনে নিতে,

পর পর
বালির উপর
স্থির
দুটি
নিটোল পায়ের গোছ
গভীর নিবিড়।

সময়ের চরে
ঢেউ ওঠে নামে পড়ে।
উৎসুক
শিশুর মত একা একা কুড়োই ঝিনুক—
ছোট মৃত প্রাণ যত, ছোট ছোট সমুদ্রের শব।
আমি তো মৃতকে নিয়ে খেলা করি,
শব নিয়ে করি উৎসব।
সে এক আশ্চর্য নারী :
তবু সে আরেক মৃত—সাদা বালিয়াড়ি
মরা এক সাদা ফেনা
আমার প্রাচীন এই প্রাণের উপর—
সে-প্রাণ হয়তো এই ধু-ধু বালুচর॥

সত্যি মশাই

হরপ্রসাদ মিত্র

সত্যি মশাই, এক-এক সময় আমিও চাই—
আর-কিছু সুখ,—অন্যরকম প্রাপ্তি—মানে,
অন্তত এই সংসারে সব গণ্যদের—
ইচ্ছা-পালন ঘটায় যে-সব ফলন, তাই।
গাধার মতন শরীর পাতন গাধার থাক্,
সোনায় মোড়া হোক্ সে গাধা
—তারপরে সে পালিয়ে যাক্!

সোনায়-সোনায় পোষ মেনে বেশ শক্তি হয়।
অশেষ কষ্ট ভোলার সুখে ভক্তি হয়।
তাছাড়া,—এই মন্দ পায়ের মন্থরতাও উহ্য রয়।
সত্যি মশাই, সোনার গাধা হওয়ার স্বপ্ন তুচ্ছ নয়।
কিন্তু দেখুন, তেমন কিছু হতে যে চাই সংগতি—
প্রভুকে নয়, প্রভুত্বকেই নিত্য মানার সম্মতি।
বুকের মধ্যে মনটা আছে, মনের মধ্যে আপ্রুচি—
যতোই তাকে খাটো করি বাড়ছে ততোই ভির্কুটি।
না-খেয়ে সে পদ্য লেখে, না-পেয়ে সে ফুরিয়ে যায়
ঠিক বলেছেন—কালের চক্র নগণ্য ঘাস গুঁড়িয়ে যায়!

ঘাসের পরে ঘাসের কিন্তু মহামিছিল উদ্যত
এবং মহাকালের জাঁতায় কেই বা থাকে অক্ষত?
শক্ত-নরম, মন্দ-ভালো সকল বস্তু এক দরে
পিষে-পিষে হচ্ছে মাটি মহাকালের যন্তরে।
কোথায় গেলেন জনক-রাজা, কোথায় গেলেন বাল্মীকি?
আজকে যাঁরা প্রধান তাঁরাও সবাই তো নন বল্মীক-ই!

চীনের পাঁচিল ভাঙ্লো দেখুন,—সমুদ্ররাজ ইংরেজের
প্রতাপ গেছে, তম্বিটা আজ দৃশ্য সুয়েজ-সংযোগের।
বুদ্ধ গেছেন, যীশু গেছেন, সক্রেটিস ও গান্ধীজি!
ঘাসের তুচ্ছ প্রাণটা যাবে, সেটাই কি-আর ভিন্ রীতি?
সত্যি মশাই, ঠিক বলেছেন—যাবারই নাম জাগৃতি।
ভাব্তে-ভাব্তে এমনি করেই সত্যেতে হয় সম্প্রীতি!

যেতে-যেতেই ক্লান্তি আসে,—বাতের মালিশ, সঞ্জীবন
পেতে গেলেই পয়সা লাগে, তাই দিতে হয় অর্থে মন।
কপালে হল চালাবে কাল, রগের চুলে পাক ধরে।
প্রথম দিনের অনন্ত প্রেম প্রতি-দিনের ঘর করে।
প্রেমের এমন দুর্দশাতেই নিষেধ ছিল রবীন্দ্রের।
ঘরে-ঘরে ছাড়ছে নাড়ী মল্লিকা আর গোবিন্দের।

তাইতো মশাই, মাঝে-মাঝে আমিও চাই—
আর-কিছু সুখ, অন্যরকম প্রাপ্তি,—মানে,
আপ্রুচিটার চূড়ান্ত ঘুম,—ঘুমের সুখে—
তৃপ্তি ফুটুক্ সোনার গাধার চোখে-মুখে।

দেবো, সব দেবো

আবুল হোসেন

দেবো, সব দেবো, যা যা চাও—
কল্‌মিলতা নুয়েপড়া মাচা
দাওয়ার শালিকসুদ্ধ খাঁচা
টিকের ছাইতে ভরা কল্‌কে দু'টো
গোয়ালে ছড়ানো ভাঙা ঘুটো
বাতায় শিকেয় তোলা ফুটো
পেতলের কলসিটা
মাদুর বালিশ তেলচিটা
এখনো যা আছে।

ধানতো আর নেই, পাটও শেষ
বছর বছর ডোবে দেশ
আম জাম কাঠালের
জমি গেছে ঢের,
ফল নেই গাছে।

নাও, যা যা পারো নিতে
চৌদ্দপুরুষের ভিটে
গোয়ালের গরু
ঘরের মা বোন জরু
ছেলের মেয়ের শব।
সাহেব, দিয়েছি, দেবো সব।
মরবে কি মানুষটা?
মনে ঢাকে ফানুষটা?

ঝাঝরা বুকের মধ্যে শুধু
জ্বলবে আগুন ধু ধু
থাকবে দু'চোখ ভরে ঘৃণা
সেতো আর নিতে পারবেনা!

সোভিয়েত কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

অম্লান দত্ত

খ্রুশ্চোভের বিবৃতিতে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের যে চেহারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে।১

গোড়ায় কয়েকটি তথ্য স্মরণ করা যাক।

নিজের নীতি অথবা খেয়ালের বশবর্তী হ'য়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা স্ট্যালিনের অভ্যাসের অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিপার্শ্বস্থ সকলের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা নাকি তাঁর মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়।২ শুধু সন্দেহের বশবর্তী হ'য়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন হাজার হাজার নিরপরাধ কর্মী। কাল্পনিক অভিযোগের বাস্তবতা প্রমাণে এবং মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ে সোভিয়েত পুলিশবাহিনী অনন্যসাধারণ কুশলতা অর্জন করে। অভিযুক্তের মুখ থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের সোভিয়েত প্রণালী যেমনই অব্যর্থ তেমনই ভয়াবহ। এই প্রণালীতেই স্ট্যালিনের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা 'সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচর' বলে প্রমাণিত হয়ে যান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কম্যুনিষ্টদলের কেন্দ্রীয় সমিতির ১৩৯ জন সভ্য ও সভ্য-প্রার্থীদের ভিতর ৯৮ জনকে গুলি ক'রে মারা হয়; এঁদের অধিকাংশই নিহত হন ১৯৩৭-৩৮ সালে। এ-অবস্থায় কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে স্ট্যালিনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়।

এসব কথা অবশ্য সম্পূর্ণ নূতন নয়, অন্তত তাঁদের কাছে যাঁরা সোভিয়েত স্বৈরাচারের প্রকৃতি মোহমুক্ত মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণে বিপরীত কাহিনীই কম্যুনিষ্ট প্রচারে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট নেতা হ্যারি পলিটের একটি প্রাক-খ্রুশ্চোভ বিবৃতি ধরা যাক। ১৯৫৩ সালে ৭ই মার্চে "ডেইলি ওয়ার্কারের" পাতায় পলিট ভক্তি-গদগদ ভাষায় বলেছেন : স্টালিন, ইতিহাসে যিনি একটি নূতন স্বর্ণময় অধ্যায় যোগ ক'রে গেলেন, যাঁর ভাস্বর কীর্তি অবিনশ্বর...যিনি স্বৈরাচারী কখনই ছিলেন না, অনুশাসন প্রয়োগে কখনও প্রবৃত্ত হননি, সর্বক্ষণ ব্যগ্র ছিলেন অপরের বক্তব্য অনুধাবন করতে, অপরের মতামতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে...।৩ হ্যারি পলিট কি জ্ঞাতসারে অসত্য প্রচার করছিলেন? হয়তো। অথবা

---

১ খ্রুশ্চোভের যে গুপ্ত বিবৃতি মার্কিণ পররাষ্ট্রদপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়, ব্রিটিশ ও অন্যান্য কম্যুনিষ্টদল তাকে ভিত্তি করেই দলীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেন। "প্রাভ্‌দা" ও অন্যান্য সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত পরবর্তী বিবৃতির সঙ্গেও এই আদি বিবৃতির সামঞ্জস্য আছে।

২ কম্যুনিষ্টশাসিত পোল্যাণ্ড থেকেও এই মর্মে অভিযোগ আনা হয়েছে।
"How monstrous and pathologically suspicious must have been the thoughts of a man who could suppose that numerous members of the Central Committee were enemies or imperialist agents." (Radio Warshaw, 29th March, 1956). "Many honest activists who opposed Stalin in various matters fell victim to repression. Methods of provocation were used; false accusation were forged; abuses took place during investigations in order to bring about the condemnation of the accused." (*Trybuna Ludu*, 28th March, 1956).

৩ "Stalin, who has written golden pages in world history, whose lustre

হয়তো সোভিয়েত ভক্তিতে তাঁর বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে বস্তুবাদের সঙ্গে ভক্তিরসের, আদর্শধর্মিতার সঙ্গে নীতিশূন্যতার আশ্চর্য সংমিশ্রণ এ-যুগের অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার।

খ্রুশ্চেভের বিবৃতিতে স্ট্যালিনী অত্যাচারের অন্যান্য যে-সব দিক প্রকাশিত হয়েছে তা-ও লক্ষ্য করবার যোগ্য। এখানে শুধু দু'একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথেষ্ট। বিবৃতিতে প্রকাশ :

"All the more monstrous are the acts whose initiator was Stalin and which are rude violations of the basic Leninist principles of the nationality policy. Thus, already at the end of 1943 a decision was taken and executed concerning the deportation of all the Karachai from the lands on which they lived. In the same period, at the end of December, 1943, the same lot befell the whole population of the Kalmyk Autonomous Republic. In March, 1944, all the Chechen and Ingush peoples were deported and the Chechen-Ingush Automomous Republic was liquidated . . . The Ukrainians avoided meeting this fate only because there were too many of them and there was no place to which to deport them."

অর্থাৎ জাতীয় অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের নীতি মুখে নিয়ে কম্যুনিষ্টরা যখন মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র প্রগতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ সোভিয়েত দেশে তখন একে একে বহু ছোট ছোট জাতি ও গোষ্ঠিকে সমগ্রভাবে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করবার অমানুষিক জুলুম চলছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্ট্যালিনী জুলুম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সমান ভয়াবহ। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের এই অধিনেতাটি শুধু ভবিষ্যতকে নয়, অতীতকেও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন। বিপ্লবের আদিযুগের ইতিহাস নূতন ক'রে লেখা হলো স্ট্যালিনের নির্দেশে, তাতে সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়ে ঘোষিত হলো স্ট্যালিন-মাহাত্ম্য।১

২

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা হিসাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈরিতা ও অবরোধনীতির উল্লেখ করা হয়। বিপ্লবের পর শিশুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ইতিহাস সুবিদিত। আর তিরিশের যুগের মাঝামাঝি নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধায়োজন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে সঙ্গত ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল একথাও অনস্বীকার্য। তবু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈরনীতির সাহায্যে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা শুধু আধা সত্যের মর্যাদাই পেতে পারে। স্ট্যালিন

time can never efface . . . . Never the dictator, never to lay down the law, always eager and willing to listen, to understand another's point of view . . ."

১ "In speaking about the events of the October Revolution and about the Civil War, the impression was created that Stalin always played the main role, as if everywhere and always Stalin had suggested to Lenin what to do and how to do it."

কম্যুনিষ্টদলের কর্মাধ্যক্ষ হবার আগেই ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদী উগ্রপন্থীরা শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখে মাথা নত ক'রে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। বিশের দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত দেশে দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার সাহায্য নূতন বন্ধুত্বের সুরই ব্যক্ত করেছে। বিশের দশকের মাঝামাঝি লোকার্ন চুক্তি এবং অন্যান্য ঘটনার ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তির সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়েছে। এদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে; অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। সংক্ষেপে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিপদের সম্ভাবনা এ-যুগে বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে। অথচ এ-যুগেই স্ট্যালিনী একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। এ-যুগেই গুপ্ত পুলিশবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; সোভিয়েত আইন ক্রমশ কঠোর হ'য়ে স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে; আর দলের ভিতর বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ সংকীর্ণ হ'য়ে এসেছে। তিরিশের দশক যখন শুরু হোলো হিটলার তখনও ক্ষমতায় আসেননি, বরং স্ট্যালিনের ১৯৩০ সালের বক্তৃতায় জার্মানীতে কম্যুনিষ্টবিজয়ের আশু সম্ভাবনাই ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রে ততদিনে স্ট্যালিনী জুলুমের ভিত্তি দৃঢ়ভাবেই প্রস্তুত হ'য়ে গেছে। খ্রুশ্চেভের বিবৃতির একটি অংশ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

"Stalin put the party and the N.K.V.D. up to the use of mass terror when the exploiting classes had been liquidated in our country and when there were no serious reasons for the use of extraordinary mass terror."

দেশের ভিতর যখন বিরুদ্ধ শ্রেণী নির্মূল, অথবা প্রায় নির্মূল, এবং হিংসাত্মক নীতি প্রয়োগের অন্যান্য কারণও যখন অনুপস্থিত তখনই স্ট্যালিন কম্যুনিষ্ট দল ও পুলিশবাহিনীকে দেশময় সন্ত্রাসনীতির সমর্থনে ব্যবহার করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি বার্টাম ডি. উলফের একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। উলফ লিখেছেন :

In the early days of civil war, intervention and famine, when the state was most in danger, art was most free. The state did not begin to dictate in detail until the danger had passed, just as the Menshevik Party was not finally outlawed until the Civil War and the Polish War were safely over . . . . In the war years of 1939-45, when the state was once more in danger and its very survival was in question, there was a new era of comparative liberalism. Then censorship relaxed and poets like the gentle Akhmatova, silenced for more than twenty years, were given a chance to be published. But no sooner was the danger safely past than the Soviet dictators began a renewed war on their own people. The year 1946 saw Zhdanov delivering his declaration of war on Soviet artists, writers and musicians in Stalingrad. Thus the relation between danger to the State and total terror is just the opposite of what is generally imagined." (*Six Keys to the Soviet System*, pp. 99-100).

সোভিয়েত আমলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে বিশেষভাবে সেই যুগে নয় যখন রাষ্ট্র বিপন্ন, বরং সেই যুগে যখন রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত বিপন্মুক্ত।

৩

অর্থাৎ, রুশদেশে স্বৈরাচারী শাসনের অভ্যুত্থানের কারণ খুঁজতে হবে অনেকাংশে সোভিয়েত ব্যবস্থায় ও কম্যুনিষ্ট নীতির মৌলিক গলদে।

সাম্যবাদীরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের দু'টি গলদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে-সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বিরাট সেখানে টাকার জোর সহজেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। তা ছাড়া পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন প্রত্যক্ষ ও প্রাত্যহিক যোগাযোগ নেই; শিল্পের ক্ষেত্রেও সাধারণ শ্রমিকের মতামত শিল্প-পরিচালনায় প্রতিফলিত হবার সন্তোষজনক উপায় নেই। এদিক থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় একটা নূতন সম্ভাবনা নিহিত ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের স্থানীয় সমিতির ভিতর দিয়ে সাধারণ কর্মীর মতামত শিল্পের ও রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করবে, গণতন্ত্র গণস্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশা সোভিয়েত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের যুগে বহু আদর্শবাদীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই আশা কেন ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো, শ্রমিক-কৃষকের সমিতি কেন সাম্য-স্বাধীনতার নূতন যুগের সূচনা না ক'রে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হলো, এ প্রশ্ন আজকের যুগের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গ, যাঁকে লেনিন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে গিয়েছিলেন মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। রুশবিপ্লবের অল্পকাল পরেই লুক্সেমবুর্গ তীক্ষ্ম ভাষায় তাঁর মত প্রকাশ করেন :

"With the repression of political life in the land as a whole, life in the Soviets must also become more and more crippled . . . . . Without unrestricted freedom of press and assembly, without a free struggle of opinion, life dies out in every public institution in which only the bureaucracy remains as the active element."

শ্রমিক-কৃষকের সমিতি গণতন্ত্রের ভিত্তি হতে পারে সেই দেশেই যে দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ণ, সরকারী নীতিকে সমালোচনা করার সুযোগ অবারিত। বিরোধী মতবাদ সংগঠনের অধিকার যেখানে অবলুপ্ত, সেখানে সরকারী শাসনযন্ত্রই সর্বকর্তৃময়। আর সর্বপ্রকার গণসমিতিই সেখানে শাসনযন্ত্রের করায়ত্ত। শ্রমিক ও কৃষক-সংগঠন সে-ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বাহন না হ'য়ে রাষ্ট্রের নির্দেশে গণপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্টদল আজও একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিরোধী দল গঠনের স্বাধীনতা সে-দেশে অনুপস্থিত। এ বিষয়ে খ্রুশ্চেভের মতবাদ লেনিন তথা স্ট্যালিনের-ই অনুগামী। সোভিয়েত সরকারী বিবৃতিতে বারবারই একদলীয় শাসনের সমর্থন করা হয়েছে।

এ-সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদলের যুক্তি মার্ক্সবাদের উপর নির্ভরশীল। বিরোধীদল বিরোধী শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিফলন। সাম্যবাদ যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উৎপাদনের যন্ত্র যে সমাজে

রাষ্ট্রের করায়ত্ত, সে দেশে শ্রেণীবিরোধের বাস্তব ভিত্তি অনুপস্থিত। কাজেই সাম্যবাদী দেশে বিরোধীদল নিষ্প্রয়োজন।

উৎপাদনযন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পেলেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব লোপ পায় না। যতদিন বণ্টনের প্রশ্ন আছে ততদিন স্বার্থের সংঘাতও সম্ভব। আর যেখানেই কাম্যবস্তু সীমায়িত, অর্থাৎ অশেষ নয়, সেখানেই বণ্টনের প্রশ্ন অনিবার্য। যে-সমাজে উৎপাদনযন্ত্র সমাজের সম্পত্তি ব'লে স্বীকৃত, সে-সমাজেও আয়ের বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠির ভিতর স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। ক্ষমতা নিয়ে সংঘাতও একই কারণে। ক্ষমতা এমন বস্তু যে, একের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে অন্যের ক্ষমতা তাতে সংকুচিত হবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, মানুষের স্বার্থের সংঘাতের মূলে আছে কাম্যবস্তুর সীমাবদ্ধতা। অর্থ, ক্ষমতা ইত্যাদি যতদিন মানুষের প্রধান কাম্য সামগ্রী হ'য়ে থাকবে ততদিন সমাজে স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য। আর উৎপাদনযন্ত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই ক্ষমতা অথবা অর্থের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা সুশমিত হবে, এমন মনে করবার কারণ নেই।

স্বার্থের বিরোধ নিরপেক্ষভাবেও মতবিরোধের অন্যতম কারণ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। বিভিন্ন মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই ক্রমশ সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠি অথবা দল অপর সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠি অথবা দলের মতামতকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রথম থেকেই উপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে এ সিদ্ধান্তের ফলে মিথ্যাকেই দীর্ঘায়ু করা হবে।

কাম্যবস্তুর সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার ফলে মানুষে মানুষে যে স্বার্থের সংঘাত, সে সংঘাত বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিন্তু ধনতন্ত্রের বিলোপের সঙ্গে এই সংঘাতের বিলোপের কল্পনা ভ্রান্তি মাত্র। সমাজ যেখানে অচল, অনড় এবং সামাজিক ব্যবস্থার জটিলতা যেখানে কম সেখানে অবশ্য পারস্পরিক অধিকার সম্বন্ধে সর্বস্বীকৃত কোন প্রাচীন নীতির অবলম্বনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অনুচ্চার থাকতে পারে। কিন্তু সচল ও জটিল কোন সমাজব্যবস্থায় বিরোধ উচ্চারিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সে-অবস্থায় বিরোধী মতবাদের অনুপস্থিতিই অস্বাভাবিক লক্ষণ। যে সমাজে বিরোধী মতবাদ সংগঠনের অধিকার অস্বীকৃত সে সমাজে শাসকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য; এবং সেই কেন্দ্রীভূত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সমর্থনে নানা মিথ্যা মতবাদ সেখানে প্রশ্নাতীত সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রত্যাশিত। স্ট্যালিনের শাসনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ইতিহাসের পুনর্লিখন সমাজের উক্ত অন্তর্নিহিত ঝোঁকের একটি চমকপ্রদ অভিব্যক্তি মাত্র।

৪

কম্যুনিষ্ট মতবাদীরা বলে থাকেন যে, সাম্যবাদী সমাজে বিরোধীদল সংগঠনের স্বাধীনতা নিষ্প্রয়োজন। বিরোধী মতাবলম্বীরা কম্যুনিষ্টদলের ভিতর থেকেই তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করবেন।

কিন্তু কম্যুনিষ্টদলের ভিতর থেকে বিরুদ্ধবাদীরা মতপ্রকাশের অধিকার কতটুকু পেতে পারেন? কম্যুনিষ্ট নীতির মৌলিক সমালোচনা সোভিয়েত দেশে নিষিদ্ধ। এ-বিষয়ে সরকারী বিবৃতিতে কোন অস্পষ্টতা নেই। ১৯৫৬ সালে ৪ঠা এপ্রিল 'প্রাভদা' পত্রিকায়

বলা হয়েছে :

"Communist Party rules give every Communist the right to discuss all questions of party freely. But . . . . the party cannot permit the freedom to discuss problems to be interpreted as the freedom to propagate views alien to the spirit of Marxism-Leninism because this contradicts the provisions of party rules and party principles."

অর্থাৎ কম্যুনিষ্টদলের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত দলগত প্রশ্নই সভ্যদের স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী কোন মত প্রচার করবার অধিকার কারো আছে, কারণ দলের নীতি এতে খণ্ডিত হয়।

একদলীয় শাসনের সমর্থকদের একটি কথা বিবেচনা করতে বলি। তাঁরা কি মনে করেন যে তাঁদের মতবাদ অন্য কোন দলের ভিতর থেকে তাঁরা কার্যকরীভাবে প্রকাশ করতে পারতেন? পারতেন না বলেই কি তাঁরা স্বতন্ত্রদল গঠন করেননি? যে-কারণে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োজন, সেই একই কারণে মত সংগঠনের অধিকারও অপরিহার্য। যে-সমাজে মত সংগঠনের স্বাধীনতা নেই সে-সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ নয়। বিরোধী মতাবলম্বীদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠিত সরকার শুধু এই একটি অঙ্গীকারই দাবি করতে পারেন, যে, মত প্রচারে তাঁরা গণতান্ত্রিক পথই অবলম্বন করবেন, হিংসাত্মক উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে প্রয়াসী হবেন না, আর মতপ্রচারের যে অধিকার তাঁরা দাবি করেন প্রতিপক্ষেরও সেই অধিকারকে তাঁরা সম্মান ক'রে চলবেন। এই সর্ত যাঁরা খণ্ডন করবেন শুধু তাঁদেরই গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

যতদিন শাসকদল সংগঠিত, ততদিন বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক সংগঠনের অধিকার স্বাধীন সমাজব্যবস্থার অন্যতম মৌল সর্ত। একদলীয়ত্বের সমর্থনে সোভিয়েত শাসকবর্গ ব'লে থাকেন যে, রুশদেশে কম্যুনিষ্টবিরোধীদল বিদেশী পুঁজিপতিদের সাহায্য লাভ করবে। একই যুক্তি আমরা ফ্যাসিস্টদের মুখেও শুনেছি : কম্যুনিষ্টদলকে যে-আইনী করা দরকার, কারণ কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিদেশী সাহায্যে পুষ্ট। এ-ধরনের যুক্তি মারাত্মক আধা সত্য। শুধু বিদেশী সাহায্যকে পুঁজি করে কোন দলই জনসমর্থন লাভ করতে পারে না। বিদেশী সাহায্য যাতে কোন দলের হাতে বে-আইনীভাবে পৌঁছতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সঙ্গত। সতর্কতা সত্ত্বেও যে-পরিমাণ সাহায্য বিপক্ষদলের হাতে পৌঁছতে পারে তা নিয়ে আজকের যুগে কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারকে, এমন কি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথেও, উল্‌টে দেওয়া যায় না। এ-কথা সোভিয়েত সরকারের অজানা নেই। বিদেশী ষড়যন্ত্রের নামে আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক বিরোধিতার অধিকার কেড়ে নেওয়া আসলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার চিরকালীন অভ্যাস।

সাম্যবাদী সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণী অনুপস্থিত। সে-সমাজে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সমালোচনা ক'রে যদি কোন দল জনসমর্থন লাভ করেন তবে একথাই মনে করতে হবে যে এই সমর্থনের পিছনে টাকার জোর প্রধান নয়, যুক্তির জোরই হয়তো প্রধান, অন্তত জনগণের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে বিরোধী মতবাদের কোথাও কোন গভীর যোগসূত্র আছে। বিরোধীদলের দুর্বল যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্য সোভিয়েতদেশে কম্যুনিষ্টদলের তো সুযোগের অভাব হবার কথা নয়। তাহলে বিরোধীদলকে সংগঠনের স্বাধীনতা দিতে

সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ অসম্মত কিসের ভয়ে?

এ-কথা বলা হয়েছে যে, সোভিয়েতদেশে বিরোধীদল গঠনের কোন দাবি নেই। স্ট্যালিনী অত্যাচারের যুগেও এ-কথাই আমরা বারবার শুনেছি। কিন্তু বিরোধীদল গঠনের দাবি যদি উঠে না থাকে সেদিন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী যদি ধ্বনিত না হ'য়ে থাকে, তবে এ-সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, ভয়ে মানুষ স্তব্ধ হয়েছিল। লেনিনী আমলে এই দাবি শোনা গিয়েছিল। সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে এই দাবি আবারও শোনা গেছে; আর একই সঙ্গে শোনা গেছে এই দাবিকে স্তব্ধ ক'রে দিতে সরকারী হুংকার।

চীনদেশে অবশ্য কম্যুনিষ্ট ছাড়া আরও কয়েকটি দল আছে। কিন্তু অন্যান্য দলগুলি কম্যুনিষ্টদলেরই আজ্ঞাবাহী। রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার সোভিয়েতদেশের মত চীনদেশেও অনুপস্থিত। সোভিয়েত অথবা চীনদেশে যদি গণতন্ত্র ভবিষ্যতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে-গণতন্ত্রের রূপ পশ্চিমী গণতন্ত্রেরই অনুরূপ হ'তে হবে, এ-কথা আমরা বলছি না। গণতন্ত্রের অন্যতর রূপ সম্বন্ধে দুয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ে। কিন্তু চীন অথবা সোভিয়েতদেশে আজ যে-ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে সরকারী মতের প্রকাশ্য, মৌল সমালোচনা শান্তিপূর্ণ উপায়েও সম্ভব নয় ব'লেই একে গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

৫

বিশ্বব্যাপী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে আজ এ-কথা পরিষ্কার যে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় বিপ্লবের পথে নূতন কোন দেশে ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টায় একদিকে বিপ্লবের অসাফল্য, অন্যদিকে বিশ্বশান্তির ব্যাঘাত এবং ফ্যাসিজমের উদ্ভবের সম্ভাবনাই প্রবল। শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তগত করতে হ'লে দেশের অধিকাংশের সমর্থন প্রয়োজন। অথচ সোভিয়েত শিবিরের বাইরে কম্যুনিষ্টদল কোন দেশেই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। অর্থাৎ, অন্যান্যদলের সঙ্গে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে 'যুক্ত-ফ্রন্টের' পথেই শুধু কম্যুনিষ্টদলের পক্ষে আজ ক্ষমতালাভ করা সম্ভব। ক্ষমতা করায়ত্ত হ'লে 'যুক্তফ্রন্টের' অন্যান্যদলের স্বাধীন অস্তিত্ব অবশ্য অচিরেই লোপ পাবে।

বিপ্লবের পথে ক্ষমতা হস্তগত করা যাবে না, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই কম্যুনিষ্টদল আজ এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কম্যুনিষ্টদল কি ভবিষ্যতে এ-সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পারবেন যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসস্থাপন না ক'রে অন্যান্য গণতান্ত্রিক-দলের সহযোগিতা লাভ করা যাবে না? কম্যুনিষ্টদল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এমন একটা ঘোষণা অবশ্য আর্জকাল বারবারই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টদলের নূতন প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা নির্ভর করছে দু'টি প্রশ্নের স্ব্যর্থবিহীন উত্তরের উপর।

প্রথম প্রশ্ন, সোভিয়েতদেশের একদলীয় শাসনের সুস্পষ্ট সমালোচনা উচ্চারণ করতে কি কম্যুনিষ্টদল রাজী আছেন? এ-দেশের কম্যুনিষ্টদল যতদিন সোভিয়েত একদলীয় শাসনের সমালোচনায় পরাঙ্মুখ ততদিন এ-সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে, ক্ষমতা হস্তগত হ'লে এঁরাও এদেশে নির্বিরোধ শাসনের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবেন। এমন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন যে-কারণে সোভিয়েতদেশে বিরোধীদলের স্বাধীনতা বিপজ্জনক বিবেচিত

হ'য়েও কম্যুনিষ্টশাসিত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপজ্জনক বিবেচিত হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, লেনিনবাদ ত্যাগ করতে কি কম্যুনিষ্টরা রাজী আছেন?

সোভিয়েতদেশে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং লেনিন। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েতদেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের ভিতর ধনিকশ্রেণী নির্লোপ হয়েছে; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতদেশ আজ আর দুর্বল, একক রাষ্ট্র নয়। ধনতান্ত্রিক অবরোধের কথা আজ অবাস্তব। কম্যুনিষ্ট কাগজেও একথা স্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ কম্যুনিষ্টদের মুখপত্র "মার্ক্সিস্ট কোয়ারটার্লি" কাগজে বর্তমান বৎসরের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে উর্দ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

"The destruction of fascism . . . . cleared the way for the fundamental shift in the balance of world forces which took place during the first decade after the war. Governments under Communist leadership were established in Eastern Europe and China . . . . The capitalist encirclement of an isolated Soviet Union was ended."

প্রায় একই মর্মে বিবৃতি সোভিয়েত নেতাদের ভাষণ থেকেও উর্দ্ধৃত করা সম্ভব। অর্থাৎ, চীনদেশে ও পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন অনস্বীকার্য। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক এই বিরাট পরিবর্তনের পর লেনিনবাদ ও লেনিন-প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্র কায়েম রাখবার স্বপক্ষে সুযুক্তি অবশিষ্ট নেই।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স-লেনিনের মৌল শিক্ষাও আজ বহু পরিমাণে অচল। রাষ্ট্র শ্রেণী-সংগ্রামে হাতিয়ারমাত্র, অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মজুরশ্রেণীর বিপক্ষে ধনিকশ্রেণীর হাতিয়ার, এ-কথা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের উপর মজুর অথবা জনসাধারণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ধনিকশ্রেণী কখনই হতে দেবে না, বরং হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে, লেনিনবাদের এটাই অন্যতম মূল শিক্ষা। শ্রমিকশ্রেণী যতই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও দলবদ্ধ হোক-না কেন, রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক-শ্রেণীর করায়ত্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ধনিকশ্রেণী, অথবা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসক-গোষ্ঠি, সেই সংকটের মুহূর্তে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে নগ্ন, হিংসাত্মক দমননীতি অবলম্বন করবে, এই তত্ত্বই লেনিনের উত্তরাধিকারসূত্রে কম্যুনিষ্টরা এতকাল প্রচার ও বিশ্বাস ক'রে এসেছেন, এবং বিরোধী মতবাদকে অবাস্তব ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত "সংস্কার-বাদ" আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এই লেনিনীতত্ত্বের সঙ্গে এ-যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বৈসাদৃশ্য বারবারই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর কম্যুনিষ্টরা নিজেদের মতের সমর্থনে পর্যায়ক্রমে দুটি পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েছেন : কখনও বলেছেন যে, ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা প্রবঞ্চক, কারণ আপোষের পথে যে-আজাদী পাওয়া গেছে তা যথার্থ হ'তে পারে না; আবার কখনও বলেছেন যে, আমরা যা-পেয়েছি সেটা স্বাধীনতাই বটে, তবে আপোষের পথে এটা পাওয়া গেছে এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ভ্রান্ত অথবা মিথ্যাবাদী। অথচ স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ক্ষমতার যথার্থ হস্তান্তরই হয়েছে, এবং অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়েই এটা হয়েছে। বৃটেন ও অন্যান্য কয়েকটি

পাশ্চাত্যদেশের বর্তমানকালীন, আভ্যন্তরীন ইতিহাস এ-দিক থেকে আরও শিক্ষাপ্রদ। এ-সবদেশে রাষ্ট্রের উপর ক্রমশই শ্রমিকশ্রেণীর সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—অথচ গণতান্ত্রিক পথেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান যেমন সত্য, বৃটেন-সুইডেন-আমেরিকায় শ্রমিক সংগঠনের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির ও সমাজব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তনও তেমনই সত্য; অভিজ্ঞতা হিসাবে কোনটিরই মূল্য কম নয়। এ-কথা ঠিক যে, লাঞ্ছিত মানুষের মানবিক অধিকার অর্জন কখনই শাসকগোষ্ঠির কৃপার দ্বারা সম্ভব নয়; সেজন্য সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন সন্দেহাতীত—ভারতবর্ষেও, পাশ্চাত্যদেশেও। কিন্তু এই সাংগঠনিক শক্তি প্রবল হ'লে এবং রাষ্ট্রের চরিত্রগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিলেই শাসকশ্রেণী গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে নগ্ন দমননীতির পথ গ্রহণ করবে, এ-সিদ্ধান্ত সূত্র হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না—সম্ভাবনার অন্যতম প্রান্ত হিসাবেই শুধু স্বীকার করা চলে। এ-বিষয়ে লেনিনীমত গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে মূলে অস্বীকার ক'রে পরিণামে বিপন্ন করেছে এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বৈরতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবিতার ভ্রমাত্মক কল্পনা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে স্বৈরাচারের শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করেছে।

লেনিনের দেশে ও তৎকালে তাঁর মত প্রযোজ্য ছিল কিনা, সেটা আজ প্রশ্ন নয়। লেনিনী মতবাদ আজকের যুগে প্রযোজ্য কিনা, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিহিসাবে লেনিনবাদকে গ্রহণ করা চলে কিনা, সেটাই বিচার্য। লেনিনের মতবাদ তৎকালীন পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত; এবং পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানা মতবাদের মত লেনিনী মতবাদও আজ অগ্রাহ্য। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নূতন সম্ভাবনার আবির্ভাবের পরও যাঁরা স্বৈরতন্ত্রী জারীয়যুগের প্রভাবাক্রান্ত লেনিনী মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অটল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের হয়নি এখনও, এ-কথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৬

মানুষের মুক্তির আদর্শ নিয়ে যে-আন্দোলনের প্রথম পাদক্ষেপ, স্বৈরাচারে সে-আন্দোলনের ক্রমপরিণতিলাভ আদর্শগতভাবে আন্দোলনের শোচনীয় পরাজয়েরই জ্ঞাপনা। তবু এ-আশা হয়তো অলীক কল্পনা নয়, যে, কোন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এই সোভিয়েত-দেশে গণতন্ত্রের একটি নূতন রূপ বিবর্তিত হবে। কোন সমাজব্যবস্থাই অক্ষয় নয়; সোভিয়েত বর্তমান সমাজব্যবস্থাও চিরস্থায়ী হবে না। সে-দেশেও মানুষের ধ্যানধারণা অচিন্তিত পথে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের উদ্যত তর্জনীকে অমান্য ক'রে অগ্রসর হবে; কালের স্রোত তট পরিবর্তন ক'রে নূতন জনপদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে।

সেই নূতন যুগের কোন অস্পষ্ট আভাসও কি আজ এ-তট থেকে পাওয়া যাবে? বহু সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের একটি সম্ভাবনাই শুধু এখানে নির্দেশ করব। মার্ক্সীয় চিন্তায় রাষ্ট্রবিহীন সমাজের একটি ইঙ্গিতময় কল্পনা আছে। মার্ক্সের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ যেদিন যুগচিহ্নিত ব'লে পরিত্যক্ত হবে, তাঁর আদর্শ হয়তো সেদিনও সোভিয়েত সমাজের বিবর্তনকে প্রভাবান্বিত করবে। নৈরাষ্ট্রবাদী কল্পনার বাস্তবে রূপায়ণ অনিশ্চিত হ'লেও তার পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে শাসকদলের বিলোপ এবং শাসনব্যবস্থায় সমাজের কর্তৃত্ব-

স্থাপনের দাবি একদিন সোভিয়েতদেশে গণদাবিতে পরিণত হতে পারে। কম্যুনিস্টদলের ক্রমবিলোপের পথে দলোত্তর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হয়তো সোভিয়েত রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের পরবর্তী উচ্চতর ধাপ। দলীয় শাসনমুক্ত সেই সোভিয়েত সমাজে সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্বাধীনতা অবাধ হবে; মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ রাষ্ট্ররক্ষিত গোঁড়ামির মর্যাদাচ্যুত হবে; এবং গণপরিষদে রোজা লুক্সেমবুর্গ-কল্পিত অবাধ মতবিরোধের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে। এটা অবশ্য সম্ভাব্য ভবিষ্যতের একটি আদর্শীকৃত চিত্র মাত্র। এই বাঞ্ছিত পরিণামের পথে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব আজকের সোভিয়েত একতান্ত্রিক শাসনের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে নয়, বরং ব্যক্তিগত বৈরিভাবমুক্ত শুভেচ্ছা-প্রণোদিত শান্তিপূর্ণ অথচ অনমনীয় বিরোধিতার ভিতর দিয়েই।

নটি

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

জুঁই চামেলীর গন্ধ-বিভোর উত্তাল বাতাসের তরঙ্গে মধুর আজকের রাত। হোলির পক্ষকালব্যাপী উৎসবের আজ শেষদিন। শুক্লপক্ষ থেকে কৃষ্ণপক্ষে এসেছে রজনী চাঁদ। রজনী এসেছে মধ্যযামে। নগরীর কলকোলাহল স্তিমিত, আলোতে ছায়াতে রহস্যময় নির্জন পথ।

কেল্লার পূর্বপ্রান্তে ময়দানে আসর বাঁধছে কয়জন। কাঠের ধুনী জ্বালিয়ে আরাম করে বসেছেন ঘোসসাহেব। সহরে মজুরা নিয়ে এসেছিল নটুয়াদল। তাদের বায়না করে নিয়ে এসেছেন রঘুনাথ সিং রিসালাদার। ফৌজী ছাউনীতে রাম-চরিতের গান হবে।

সিপাহীরা বসেছে ভীড় করে। সামিয়ানার নীচে বড় বড় মশাল মাটিতে গুঁজে রোশনাই হয়েছে জোর। ধুলো উড়িয়ে মস্ত সতরঞ্চি বিছিয়ে দিচ্ছে দুজন সিপাহী।

আসল জটলাটা বসেছে ঘোসের আশেপাশে। সিন্ধির সরবতের তত্ত্বাবধানে আছেন স্বয়ং ঘোসসাহেব। আজ সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুমতি আনতে গিয়েছিলেন তিনি। বন্দোবস্ত করে ফরমায়েসী মালাই আর গোলাপজল আনবার দায়িত্বও তাঁরই ওপর ছিল। বাবাসাহেব সমঝদার লোক। ঘোসকে নাকি তিনিই বৃদ্ধি দিয়েছেন এলাচের আরক খানিকটা মিশিয়ে দিতে।

ফলটা কিরকম দাঁড়ায় দেখবার জন্যে সকলের মুখের দিকে চাইলেন খাঁ-সাহেব। কিন্তু পেয়ালা মুখে তোলবার আগে সকলেই চুপ-চাপ। ঘোস বললেন,—ব্যাপার কি? আপনাদের কি চুমুক দেবার মেজাজ আসছে না? কিছু গলতি হয়ে গেছে?

তখন ঝুঁকে পড়ে রঘুনাথ সিং বললেন,—গোস্তাকি মাফ করবেন খাঁসাহেব, কেমন যেন ভরসা হচ্ছে না। আপনি পথ দেখান। সেই দশেরার ব্যাপারটা আর কি ভুলতে পারছে না এরা। বলেই হেসে ফেললেন তিনি। হেসে ফেললেন ঘোসও, আর প্রাণখোলা একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল আসর দিয়ে।

ঘোস দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ভাইসব,—একবার পাঁচবছর আগে দশেরার পর নিজেরা খানাপিনা করতে গিয়ে নতুন কায়দায় রান্না বাৎলেছিলাম আমি, তাতে নিমকের কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

—আর দুধের ব্যাপারটা? খেই ধরে দিলেন রঘুনাথ সিং। হাসির হররা ফেটে পড়ল।

ঘোস বললেন, দুধের ব্যাপারে কামাল করেছিল বাহ্‌রাম, একচোখো শয়তান, কিন্তু সেই বদনাম যদি এখনো নাছোড়বান্দ হয়ে আমার পেছু পেছু ঘুরতে থাকে, তো তাকে আমি আজ এই রাতে সিন্ধির সরবতের ভেতর দিয়ে খতম করলাম। মরতে হয় তো—

বলে ফিরে দাঁড়িয়ে টেনে তুললেন বাহ্‌রামকে। বললেন—মরতে হয় তো এই মরুক।

চুমুক দিয়ে খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাহ্‌রাম—আরে বাস্‌বাস্‌ ওস্তাদজী কামাল করেছেন ভাই। একবার দেখ।

আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে ফিরতে লাগল সিন্ধির পেয়ালা। খুদাবক্স সাগরসিং-কে

কানে কানে বল্‌ল, বাহ্‌রামের ব্যাপারটা কি?

সাগর সিং বল্‌ল—বাহরামের কানের কাছে বলো না, হঠাৎ চটে যাবে। সেবার এমনি ধারাই হঠাৎ বাজী ফেল্‌ল বাহ্‌রাম, ক্ষেতে গরু চরছে, তাকে ধরে দুধ দুয়ে আনবে। বৈশাখ মাসের গরম। বিল্‌চারী থেকে ফিরছি আমরা পঁচিশজন। যেমন গরম চারপাশ তেমনি গরম ওস্তাদের মেজাজ। বিকেল নাগাদ রান্নাবান্নার দিশে করা গেল, ভাগ্যগুণে একটা হরিণ মারলেন কুমার রঘুনাথ সিং, সকলে আরাম করে বসলাম। বাহ্‌রাম ত' যেমনি গোঁয়ার তেমনি একরোখা, অথচ মনটা ওর ভারী সাচ্চা। হঠাৎ ক্ষেপে গেল ওস্তাদের তক্‌লিফ হয়েছে, ও দুধ খাওয়াবে তাঁকে। আমাদের সঙ্গে বাজী ফেলে সে চল্‌ল বালতি নিয়ে। তারপর ফিরে এল শুধু শুধু।

খুদাবক্সের কানটা টেনে এনে সাগর বল্‌ল, ভাই, তার একটাও গাই ছিল না, সব বলদ। আহীরদের গাড়ীতে জুত্‌বার বয়াল সব।

হাসতে গিয়ে বিষম খেয়ে চেপে গেল খুদাবক্স, বাহ্‌রাম খাঁ তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে দেখে। ঘোষ তার দিকে সিন্ধির মেজাজে আরম্ভিম সস্নেহ চোখে তাকালেন। বললেন, গান সুরু হবে। মেজাজ ঠিক আছে ত?

সম্মতি জানাল খুদাবক্স স্মিত হেসে। মনমেজাজ তার খুব ভাল আছে। সেই হোলির পর থেকে মনটা তার অন্যরকম হয়েছে। দুনিয়ার রঙই সুন্দর হয়ে গেছে তার চোখে। আসরভরা মানুষ, কথায়-বার্তায় ব্যস্ত। এতজনের মধ্যে ব'সে খুদাবক্সের মনে হ'ল, এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করতে শিখেছে তার মন। মনের কোন গহনে ছিল সেই আনন্দের মণিকক্ষ। কার সুপ্রসন্ন নয়নের আলোতে যেন তার দরজা এতটুকু খুলেছে। এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

পেটঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজল। আসরে ঢুকল নায়ক। সাদা কুর্তা, ধুতি ও উত্তরীয়। গলায় রুপোর মালার সঙ্গে গাঁথা রুদ্রাক্ষ, কানে কুণ্ডল। ঢুকে করজোড়ে সকলকে অভিবাদন ক'রে সে সুউচ্চ কণ্ঠে প্রস্তাবনাগীত সুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ হ'ল জমায়েৎ।

সুললিত কণ্ঠ গায়কের। সেই পুরানো রামসীতার গানই সে গাইতে লাগল ভক্তি-ভরে। সূর্য-চন্দ্র, শিব, কৃষ্ণ, চতুর্দিক, দশকোণ এবং শ্রোতাদের উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করল সে। তারপর ক্ষমা চাইল, পাপমুখে সে পৃথিবীতে নররূপী ভগবান রামচন্দ্রের নামগান করছে বলে। সুরু হ'ল তুলসীদাসী পদ। রাম বিবাহ ক'রে অযোধ্যায় প্রবেশ করছেন। কাঠের ঘোড়ার পিঠে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এলেন লক্ষণ। রাম আর সীতা ঢুকলেন মস্ত জরির ছাতার নীচে। ছাতা ধরে ঢুকল প্রহরী। তখন নায়ক উচ্চকণ্ঠে বললেন—

'জনকপুরী সে রামচন্দ্রজী সীতা লে কর আয়ে'
ধুমধাম কর্ শোর মচাওকে সরসে রামগুণ গায়ে'

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল আনন্দিত পুরবাসীর নৃত্য। বাবড়ী চুল কপালে ঝুলিয়ে দ্রুত সারেঙ্গী বাজাতে লাগল সারেঙ্গীবাদক। আসর জুড়ে আহা আহা উঠল। ঘোড়াটাকে দুল্‌কি চালে নাচিয়ে লক্ষণও নাচে যোগ দিলেন। রাম সীতা অটল গাম্ভীর্যে চেয়ে থাকলেন। উৎসাহে নায়ক লাফিয়ে উঠতে লাগল।

সামান্য সরবৎ খেয়েছে খুদাবক্স। কিন্তু মগজ পর্যন্ত নেশা পৌঁছেছে ব'লে বোধ

হ'ল। ভীড়ের সুযোগ নিয়ে সে একটু একটু করে পিছু হঠতে লাগল। কিছুদূর এসে দড়ির ঘেরটা পেরিয়ে বাইরে চলে এল। তার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করবে বলে মনে হ'ল না। ঘোষ একমনে দেখছেন, তাকিয়া কোলে নিয়ে। সাগর সিং একমনে সিন্ধির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আসর পেছনে ফেলে চলে এল খুদাবক্স।

পাথর বাঁধানো পথে পথে বাড়ীগুলোর ছায়া পড়ে থেমে আছে। উৎসবক্লান্ত নগরী ঘুমিয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে। রাজ-উদ্যান থেকে এক ঝলক ফুলের গন্ধ ভেসে এল।

মায়াময়ী নিশিথিনী। অভিসারিকার মত তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। কোন আকর্ষণে সে খুদাবক্সকে পথে পথে নিয়ে চল্‌ল। এ পথ, সে পথ, বাজারের চত্বর। ভিখারী ঘুমোচ্ছে মন্দিরের সামনে। চার-পাঁচটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, মালিকরা পাশেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পঞ্চকুয়ার পাশের নিমগাছটা অজস্র মুকুল ও মঞ্জরীতে সহসা সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার টুকরো ঝলমল করছে। সেখানে ক্ষণিক দাঁড়াল খুদাবক্স। অনেক দূরে কার ক্লান্তকণ্ঠে গানের কলি শোনা যাচ্ছে। এত রাতে-ও জেগে আছে কেউ? গানের কথা বোঝা যায় না, তবে সুরটা বাতাসের তরঙ্গে ভেঙে ভেঙে এই চন্দ্রালোকিত নগরীর বুকে টুকরো টুকরো হয়ে জোনাকির মত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন রাতে তাহ'লে আরো কেউ জাগে? নিশ্চয় তাকেও খুদাবক্সের মত নিশিতে পেয়েছে।

লছমী দরোজার সামনে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রহরী। সেই রাস্তা ধরল খুদাবক্স। পথের দুই পাশে মুকুলভারে আনমিত কিশোর আমগাছ। মন্দির উদ্যান থেকে জুই-চামেলী চাঁপা ও বেলফুলের গন্ধ নিয়ে এসে সেই অপরূপ আলপনা আঁকা পথের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। হ্রদের তীরে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স।

আকাশের ছায়া বুকে ধরে স্থির হয়ে আছে জল। তীরে দুটি তিনটি কিস্তি বাঁধা। উঠে বসে দাঁড় খুলে দিয়ে বৈঠা তুলে নিল খুদাবক্স। রোজকার হিসেব চোখ থেকে হারিয়ে গেছে তার। এমনি রাত রোজ আসে না। আজ তাই বে-হিসেবী হয়ে গেছে খুদাবক্স।

জলে কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে বিরামমঞ্জিল। সুরক্ষিত এই উদ্যানবেষ্টিত জল-মহল। একটা মস্ত বটগাছের ঝুরি নেমেছে জলে। সেখানে কিস্তি বেঁধে বটগাছের রেখায় রেখায় তরঙ্গায়িত গুঁড়িতে পা রেখে উঠল খুদাবক্স।

একটু বাগান, কিছু সিঁড়ি, একটি চত্বর, আবার একটু বাগান। তারপরে তৃণাকীর্ণ জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে জলের দিকে। সেখানে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স, আর চকিতে বিদ্যুৎ-ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াল কে কালো পাথরের সিঁড়ির ওপাশ থেকে। সেই সন্তস্ত মুখের দিকে চেয়ে সহসা সমস্ত আকাশ-বাতাস দুনিয়া দুলে উঠে স্থির হয়ে গেল খুদাবক্সের চোখে। অবগুণ্ঠন টানতেও ভুলে গেল মোতি। ললিত পঞ্চমের সুরে বাঁধা সেই কম্প্র-মুহূর্ত। সময় যেন সময় রইল না। পল ও অনুপল, এই মাত্রাগুলি পাথর পদ্মের মত ফুটে উঠে সুরভিতে ভারাক্রান্ত করল সময়। তখন হতসম্বিৎ ফিরে পেল মোতি। ওড়নী টেনে দিল মাথায়। নিজেকে তিরস্কার করল খুদাবক্স। মাথা নীচু করল সম্মান জানিয়ে। বলল, দুইবার অজান্‌তে গোস্তাকি করেছি। বড় লজ্জায় আরজি পেশ করছি, মাপ করুন।

কথা কইতে গিয়েও খুঁজে পেল না মোতি। তারপর বলল,—কেন?

সেই সন্ধ্যায় বে-আন্দাজ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। জবান্ আমার বশে ছিল না। অনেক লজ্জা জয় করে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল মোতি। বলল,—আমার স্মরণে নেই।

—আপনার মেহেরবানি।

স্বল্প হাসল মোতি। তার নীরবচিন্তা যাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুঞ্জরণ করছিল সেই তার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু দুনিয়ার লজ্জা তাকে ঘিরে ধরেছে। কথা কইতে বাধছে। দুরু-দুরু করছে বুক। অজানিত এই চকিত সাক্ষাৎ যেমন মধুর, তেমনি বিপজ্জনক।

তার চিন্তাকে ধ'রে খুদাবক্স বল্‌ল,—কৌতূহল মাপ করবেন, কিন্তু আপনি একা এসেছেন?

—এই বাগান সুরক্ষিত। এখানে আমি কখনো কখনো এসে থাকি, প্রহরী তা জানে। তাই কোন ভয় নেই। কিন্তু আপনি?

আমি খুদাবক্স। গুলাম ঘোসের তোপখানার হাবিলদার। সহরে আমি নতুন এসেছি।

আলাপ পরিচয়ের বিনিময়ে সহজ হ'ল পরিবেশ। ঘাটের সোপানে বসল মোতি। দূরে বসল খুদাবক্স। অবাধ্য কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে দেখল তার স্বপ্নচারিণীকে। এই মুখ তাকে উন্মনা করেছে, এই চোখে তার হৃদয় পড়েছে বাঁধা, এই কণ্ঠের সংগীতে তার হৃদয়ের তারে তারে টান লেগেছে। তাই এখন, এমনি সময়, অপরাধ হলেও বারবার চেয়ে না দেখে তার উপায় নেই।

আজ সন্ধ্যায় কেন-প্রসাধন করেছিল মোতি এমন ক'রে, কে বলবে। বড় যত্নে বেণী রচনা করেছিল রূপোর ফুল গেঁথে, সাদা রেশমের গাঢ়ারা পরেছিল। যত্ন ক'রে বেছে নিয়েছিল আকাশনীল রঙের জরির ফুল বসানো ওড়নী। চোখে সুর্মা টেনে দিয়ে সযত্নে সিঁথিতে পরেছিল মুক্তার কাশ্মীরি গহনা, পায়ে পরেছিল নাগরা।

প্রসাধন তার সার্থক হ'ল আজ। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সময়ের হিসেব হারাল।

শৈশব থেকে গুরুর পায়ের কাছে বসে সুরসাধনার শিক্ষা নিয়েছে মোতি, মন প্রাণ দিয়ে আরাধনা করেছে সংগীতের। এই মুহূর্তকে সার্থক করে চকিতে তার মনে ঝঙ্কৃত হ'ল—

যব প্রীতম ঘরে আয়ে—

কত ধ্যানে, সাধনায়, আরাধনায় আর আলাপনে যেন পূর্ণতা পায়নি মোতি, যেন কোন আকুলতা মিটত না। আজ তারই চরিতার্থতা অনুভব করছে সে। কোমল চরণ জলে ডুবিয়ে বসল মোতি।

চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিম গগনে।

কিছুক্ষণ বাদে মোতি বলে, এবার কিন্তু ফিরতে হবে আমার।

—সহরে কি কখনো সাক্ষাৎ করা যায় না?

—না। সন্ত্রস্ত মোতি বলে, আপনি ত' জানেন না, কত নিষেধ, কত শাসনে কয়েদ আমি।

তখন একটু দুঃসাহসী হয় খুদাবক্স। বলে, কয়েদ ত' আমরা সকলেই। সকলেই ত' কয়েদ হ'তে চায়, যদি মালিকের হৃদয় কোমল হয়। আর ছুটিই কি সব সময় মেলে?

মখ্‌তবে ইশ্‌ক-কা দেখা য়ে নিরালা দস্তুর
ছুট্টি উনকে নহিঁ মিলা, ন লুৎফ-কা কসর হ্যয়া—

—তার মানে?

মোতির চোখে চোখ রেখে খুদাবক্স বলে যায়, প্রেমের মখ্‌তবের আশ্চর্য নিয়ম এই যে,

না ছুটি মেলে, না আনন্দের অভাব হয়।

খুদাবক্সের এই স্পর্ধাকে তিরস্কার করবে ভাবে মোতি, কিন্তু তার কৌতুক-ভরা চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে সকৌতুকে, খুদাবক্সও হাসে।

হঠাৎ কোলাহল আসে সহরের দিক থেকে। মনে হয় মশাল নিয়ে লোকজন এদিকেই আসছে। চকিত হয়ে ওঠে মোতি। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, কি হবে?

স্বীয় আচরণের দুঃসাহসিকতা তখন খুদাবক্সকেও সচেতন করেছে। মোতির হাত টেনে ধরে সে কিস্তিতে তোলে। তারপর জোর জোর বৈঠা টানতে থাকে। বলিষ্ঠ হাতের চালনায় নৌকো চলে আসে বেশী জলে। বিপদের সম্ভাবনায় বুক কাঁপছে, তবু মোতি একটু হাসে। খুদাবক্স বলে, কোন ভয় নেই।

ঘাটে পৌঁছেই নেমে পড়ে মোতি। বাঁধানো শিরীষগাছের গোড়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তার বৃদ্ধ সঙ্গী, মুন্নু সারেংগীয়া। তাকে ডেকে তোলে মোতি। তারপর চকিতে চলে যায়। কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

খুদাবক্স চল্‌তে থাকে কেল্লার দিকে। আসর থাকতে থাকতে তাকে পৌঁছতেই হবে। আসর ছেড়ে সে যে উঠে এসেছিল তা কেউ বুঝেছে কিনা কে জানে। মোতি নিশ্চয় নিরাপদে বাড়ী পৌঁচেছে। আসরের আলো দূর থেকে দেখা যায়। গান-ও শোনা যায় বেশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুদাবক্স।

পদ্মরামচরিত গান সমাপন হয়েছে। দশমুণ্ডধারী লঙ্কাপতি রাবণকে হত্যা ক'রে রাম সীতাকে নিয়ে ফিরেছেন অযোধ্যাপুরী। নায়ক করজোড়ে গীতসমাপনে সমবেত জনতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন।

যে কিশোর বালক তিনজন রাম সীতা ও লক্ষণ সেজেছিল, তারা হাসিমুখে পিতলের একখানা তাম্বুলদান নিয়ে এল। দর্শকদের সামনে ধরল পেতে। ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে দর্শনী পড়তে লাগল। খাজাঁপ জন্নালানাথের ইঙ্গিতে একখানা নতুন থালায় ধুতি চাদর ও টাকা বয়ে আনল একজন। নজরানা তুলতে তুলতে খুদাবক্সের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটি। হেসে বাড়িয়ে দিল হাত। আসরের সবাই সকৌতুকে খুদাবক্সের দিকে চাইল।

দীর্ঘছন্দ সুঠামদেহ, ধপ্‌ধপে সাদা যোধপুরী ও পেশোয়ারী কুর্তা পরণে, তার ওপর টুকটুকে লাল জামিয়ারের বাণ্ডি, মাথায় মুরেঠা, পায়ে নাগরা। দেখে তারিফ মনে এল সকলেরই। আপনার আনন্দে আপনি মস্ত এক মূর্ত যৌবন। সকলের দৃষ্টি নিজের ওপর অনুভব করে একটু লাজুক হাসল খুদাবক্স আর কুর্তার পকেট উজাড় করে, মুঠো ভরে যা উঠল ঢেলে দিল থালায়। একটা মোহর আর চারপাঁচটা টাকা। তার পুরোমাসের সম্বল। নটুয়াদলের মালিক, নায়ক মহানন্দে সম্মতি জানাল, রাম সীতা ও লক্ষণ হেসে উঠল পরস্পরের দিকে চেয়ে। সিন্ধির নেশা আর গানের মেজাজে মস্‌গুল আসর মাথা ঝুঁকিয়ে মুরেঠা নাচিয়ে তারিফ করে উঠল—হন্দ্‌ কিয়া ভাই খুদাবক্স, কামাল কামাল! দিল্‌ এত খুলে গেল কেন রে—বলে বেয়াড়া আনন্দে চীৎকার করল কে যেন! রঘুনাথ সিং বলে উঠলেন, কি খাঁ সাহেব, আমি আপনি দুই শের থাকতে এই বাচ্চা এসে কামাল ক'রে যাবে? বলে দুইমোহর বের করলেন রুমাল খুলে।

ঘোস বেশ চেখ বুঁজে বসেছিলেন। রঘুনাথের কথার পর কি করতে হবে ভেবে নেবার আগেই হাসতে হাসতে রঘুনাথ তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোহর উঠিয়ে এনেছেন। রঘুনাথ টেক্কা দিচ্ছেন দেখে তিনি বলে উঠলেন, ঠিক আছে ভাই, আজ পুরো নটুয়াদলকে

কুমার রঘুনাথ সিংজী পরোয়ার পুরী মিঠাই খাইয়ে নতুন কাপড় বখ্‌শীষ করবেন। বাস্‌—যাও!

ব'লে হাত নেড়ে আসর ভেঙে দেবার হুকুম দিয়ে সহসা ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে উঠলেন। গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন, কি কুমারসাহেব, কামাল করল কে? তারপর পরোয়ার আর পাঠান শরীর কাঁপিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন। দেখা গেল টক্কর নিতে গিয়ে একটু ঠকে গেছেন কুমারসাহেব, কিন্তু তাতেই তাঁর আনন্দ বেশী।

আসর ভাঙছে হৈ হৈ করে, সতরঞ্চি গুটিয়ে আনছে কয়জন, নেভা মশালগুলো তুলছে বরদাররা, এরই মধ্যে হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল সাগর সিং। কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে সিন্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে সে বসেছিল। এখন দাঁড়িয়ে পকেট উল্‌টে ফেলে সে কেঁদে উঠল বিশ্রীভাবে—আমি অনেক কিছু দিতে চাই, কিন্তু আমার একপয়সাও নেই। ও হো হো, তবে আমি দিল দিয়ে দেব, ভাই মালিক, তুমি কি আমার দিল নেবে না?

সকলেই হেসে উঠল, কিন্তু কার কথা কে শোনে। সাগর সিং বারবার বলতে লাগল—আমি খাস বঘেলখণ্ডের রাজপুত, আমার দিল কি কমদামী? আমার দিল নিয়ে নাও, চলে যেও না—

হাসতে হাসতে রঘুনাথ সিং বললেন, ওর গলা থেকে পা পর্যন্ত সিন্ধিতে বোঝাই। ওর মাথায় জল ঢেলে দাও।

জল দেবার কথা শুনেই চেঁচামিচি করে আপত্তি জানাল সাগর সিং, কিন্তু কে তার কথা শোনে। চারজন ধরাধরি করে তাকে নিয়ে চলল ছাউনীতে।

খুদাবক্সও হাসছিল। ঘোস শক্ত ক'রে তার কাঁধের কাছে চেপে ধরলেন। বললেন, এবার বাড়ী।

ভোর হয়ে এসেছে। পুব আকাশের রঙ ফিকে, আর চাঁদ ক্রমেই নিভে আসছে। ভোরের তারা দপ্‌দপ্‌ করছে। ঠাণ্ডা বাতাস ক্লান্তি মুছে নিতে লাগল সস্নেহে খুদাবক্সের কপাল থেকে। কেল্লার নহবৎখানায় শানাই বেজে উঠল প্রভাতী সুরে। শানাই-এর পঁচার নিদ্রিত নগরবাসীর তন্দ্রামগ্ন চেতনার দরজায় সুরের মূর্ছনায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল।

শুদ্ধ সুরের আশীর্বাদ পথচারী দুজনকে স্পর্শ করল। রাজপথে সামান্য প্রাণের সাড়া দেখা যায়। এখনই উঠবে ভাণ্ডী পুরুষ ও রমণী। জল দিয়ে ধুয়ে দেবে রাজপথ। জলসিঞ্চনে ভিজিয়ে দেবে দুইপাশের ধুলো।

ভৈরব রাগের উত্তরেই যেন পূর্বপ্রান্তে মহালক্ষ্মীমন্দিরের নহবৎখানা থেকে শানাই বেজে উঠল। রাজপ্রাসাদের অন্ধকার দরজা খুলে গেল। বিনায়ক রাও শাস্ত্রী মৃদুমৃদু ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে চলেছেন, পেছনে প্রদীপ ও অন্যান্য পূজোপচার নিয়ে চলেছে ব্রাহ্মণ সেবক কয়জন। সামনে একটি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ বালক পিতলের ঝারি থেকে জলসিঞ্চন করতে করতে চলেছে। রাজপরিবারের পূজো যাচ্ছে মহালক্ষ্মীমন্দিরে, তাই পথ শুদ্ধ করছে সে।

আসন্ন প্রভাতের এই শুদ্ধশুচি প্রস্তাবনা বড় ভাল লাগল খুদাবক্সের। মনে পড়ল তার গ্রামেও ভোরবেলা কেমন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। মদনমোহনের পূজারী পরমেশ্বর মিশ্র কেমন সুস্বরে মন্ত্রপাঠ করে। মনটা তার এমনিতেই সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই সমস্ত পরিবেশ ও সুখস্মৃতি তাকে যেন আরো ভরে দিল।

—সাঁতার জানতে?

ঘোসের এই অদ্ভুত প্রশ্নে তার চমক ভাঙল। অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইল। ঘোসের মুখ কিন্তু একেবারেই ব্যঞ্জনাবিহীন। তিনি তার দিকে চাইলেন না। আবার বললেন—

—সাঁতার শিখেছ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল খুদাবক্স। চট্‌ ক'রে সে সতর্ক হয়ে গিয়েছে। কেন এই প্রশ্ন, তা যেন ঠিক ধরতে ছুঁতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের পেশার সাগ্‌রেদী করতে করতে সতর্ক হ'তে শিখেছে সে। মনে হ'ল যেন অতর্কিতে আক্রমণ একটা হ'লেও হ'তে পারে। একটু অপেক্ষা করল সে। তখন ঘোস বললেন,—নৌকো চড়ছিলে কিনা, তাই জানতে চাইলাম, মুস্কিল হ'লে কি করতে!

ধরা পড়ে গিয়েছে সে। অবাধ্য হৃৎপিণ্ডকে শাসন করে খুদাবক্স জবাব দিল,—কোন-মতে সামলে নিতাম।

—বেশ বেশ। ব'লে চলতে লাগলেন ঘোস। একেবারেই ভাবলেশহীন মুখ ঘোসের। তবু খুদাবক্সের মনে হ'ল চোখের কোণে যেন কৌতুকের একটি স্মিত আভাস চিক্‌মিক করছে।

আট

মোতির শয়নকক্ষের সামনে একটি ঝুলা বারান্দা। প্রভাতে তার একান্তে দাসী একটি বেদী ধুয়ে দিয়ে গেছে। এখন সকাল। সেই বেদীতে একটি নরম সবুজ রেশমের সাজপোশ্‌ ঢাকা তানপুরা অপেক্ষামান। একপাশে রুপোর রেকাবীতে বেলফুলের গোড়ে মালা। ওপাশে জাফরিকাজের ধূপদানী থেকে চন্দনধূপের গন্ধ উঠছে।

একপাশে বসেছেন বৃদ্ধ চন্দ্রভাণ। রাজপুত রাজবংশীয় এই সঙ্গীতাচার্য তরুণ-জীবনে মুসলমান ওস্তাদের কাছে সোনার রাখী বেঁধে সাগ্‌রেদী গ্রহণ করেছিলেন। স্বীয়-সাধনায় অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর নামের সঙ্গে পান্নার রাজ-কুমারীর নাম জড়িয়ে অনেক গল্প একদা দরবারে দরবারে ফিরত। খ্যাতি ও যৌবনের চরম শিখরে দাঁড়িয়ে সহসা তাঁর জীবনের মোড় কেন ঘুরে গেল, কেন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে নগরে নগরে ভ্রাম্যমানের জীবন গ্রহণ করলেন, তা নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। অনেকদিন থেকে এখানে বসবাস করছেন তিনি, সঙ্গীতশিক্ষা দিচ্ছেন মোতিকে।

সৌম্য সুন্দর গৌরদেহ চন্দ্রভাণ, সাদা আচকান, যোধপুরী, মুরেঠা ও নাগরায় সুঠাম দেহখানির বাঁধন বার্ধক্যেও শিথিল হয়নি। ঋজু হয়ে ব'সে তিনি কথা বলছেন আর একটু দূরে করজোড়ে ব'সে সশ্রদ্ধ হয়ে শুনছে মোতি নত হয়ে। প্রভাতে স্নানান্তে পীত বস্ত্র পরিধান ক'রে, শুদ্ধশুচি মনে গুরুর কাছে এসেছে মোতি। চন্দ্রভাণের সংযত কণ্ঠের কথা-গুলির একটি-ও যেন হারিয়ে না যায়, তাই একাগ্র চিত্তে মোতি শুনছে।

চন্দ্রভাণ সস্নেহ কণ্ঠে বলছিলেন, —সব সাধনার মতই সঙ্গীত সাধনা বড় দুরূহ ব্যাপার। ঈশ্বর আরাধনা ক'রে ভক্তের জীবন কেটে যায়, সঙ্গীত-ও চিরজীবনের জিনিষ। অনেক সাধকজনের খবর আমি জানি বেটি, তাঁরা সিদ্ধসাধক, তবু সুরের কারণে জীবনে কোনো মহফিলে যোগ দেননি। পরিণামে দুঃখে কষ্টে দিন কেটে গেছে তাঁদের, তবু বিদ্যাকে

পুঁজি করে তাঁরা না কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছেন, না কোন আরাম পেয়েছেন। তোমাকে কি আমি কখনো ছোটে খাঁ'র কথা বলেছি?

—না তো!

ছোটে খাঁকে আমি দেখেছিলাম কাশীতে। সে চল্লিশ বছরের কথা হবে। তাঁর নাম আমার গুরুজীর কাছে শুনেছিলাম। গুরুজী বলেছিলেন, ভাগ্যের বরপুত্র ছোটে খাঁ সাহেব, তিনি ছিলেন সুরের একান্ত রগীব্ লোক। মালকোশে সিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। গান গাইবার সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন মুশিকের সৈয়দ, সঙ্গীতের আত্মা। কিন্তু শেষ অবধি কি হ'ল? মাথা তাঁর গোলমাল হয়ে গেল। গোয়ালিয়রে তাঁরই মহাফিলের শেষে সব ফেলে রেখে কোথায় চলে গেলেন।...যাক্, আমি তখন নতুন জোয়ান, গুরুজী'র সন্ধানে নানাভাবে ফিকির করতে ব্যস্ত। শেষরাতে খেয়াল হয়েছে গঙ্গাজী-কে দর্শন করব। চলে গেছি শিবালা ঘাটে। সেখানে সহসা শুন্‌লাম মালকোশ রাগের একটি পদ, সুরের মূহ্‌র্রা কায়েম করে, একটি সপাট তানের অন্তে এমন করে চলে গেল পূর্ণস্থায়ী পদগুলোতে, যেন মনে হ'ল সেই শেষরাতের আকাশ, বাতাস আর গঙ্গার জল, সবই সুরের ঝাপটায় তোলপাড় হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুন্‌ছি। সময়ের খেয়াল নেই, হিসেব নেই, সুর যে এমন ধারা জীবন্ত হ'তে পারে, তা' আমি তখন পর্যন্ত জানতাম না। মনে পড়ে গান শেষ হ'ল যখন, তখন রাতের রঙ ফিকে। দেখলাম সমাধিস্থ ভাবে বসে আছেন চোখ বুঁজে স্বর-সাধক।

শিবালা ঘাটের এক পুজক ঠাকুর নেমে আসছিল। সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। সস্নেহে হাত ধ'রে তুলল তাঁকে, তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে পার করে দিল চবুতরা, খিলান আর সিঁড়ির বিপজ্জনক অংশগুলো।

পূজকজীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেছিলেন, উনি হচ্ছেন ছোটে খাঁ সাহেব। বড় খামখেয়ালী আর বে-ঠিকানা মানুষ। চোখ তাঁর ক্ষীণ হয়ে গেছে। কখনো এখানে আসেন, কখনো চলে যান, বেশী কিছু জানি না, তবে যখন আসেন, তখন একটু মদত খিদমৎ করবার চেষ্টা করি, ওঁর পিছু পিছু যাবেন না কখনো, উনি একেবারেই মানুষের সঙ্গ পছন্দ করেন না।

মোতি অভিভূত হ'য়ে শোনে। চোখের ঘনকৃষ্ণ আঁখি-পল্লব বেদনাতুর হয়ে ভিজে ওঠে। চন্দ্রভাণ বলতে থাকেন,—আমি আজ বুঝি, গানের সাচ্চা আশ্‌ক তিনি বুঝেছিলেন, তাই নিজের বলতে যা কিছু সব মিলিয়ে দিয়ে অমনি ধারা জীবন বেছে নিয়েছিলেন। সেই ভাবে সঙ্গীতকেই চরম জেনে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিতে বলি না আমি, তবু জেন সাধনা দরকার হয়। এমন সাধনা চাই যে জীবনভর ঐ একই জিনিষের মধ্যে রোশ্‌নি দেখবে, আর কোথাও খুঁজে ফিরবে না।

করজোড়ে মোতি বলে,—আপনার মত শরীফ মুরশিদ পেয়েছি, আমার ত' পরম সৌভাগ্য। আমার অত সুকৃতি নেই, তবু চেষ্টা করি।

চন্দ্রভাণ বোঝেন মোতির মর্মব্যথা কোথায়। বলেন, তওয়ায়েফ্ তুমি, তাতে কোন অপমান নেই, তোমাকে ত' বলেছি, তওয়ায়েফ্‌দের মধ্যে থেকেই কতজন সুরের সাচ্চা মাসুক জন্ম নিয়েছেন। কমল যেখানেই ফুটে উঠুক, সে কমলই থাকবে, আর তার সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হবে। শুধু খেয়াল রাখবে কখনো গানকে ছোট ব'লে মানবে না। যত রাগরাগিণীর পট তুমি দেখবে, জানবে তাঁরা সাধকের ধেয়ানে ধরা দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের রূপবর্ণনা সম্ভব হয়েছে। সাধনা সবচেয়ে বড় কথা বেটি—

চন্দ্রভাণ উঠে দাঁড়ান। স্পর্শ বাঁচিয়ে মেঝের ওপর নত মস্তকে প্রণতি জানায় মোতি। সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ করেন তাকে চন্দ্রভাণ। মোতি যে তওয়ায়েফ্ মাত্র, সে কথা তিনি কখনো মনে করেন না। কোন গোপন বেদনার পূজারী চন্দ্রভাণ। সব মানুষকেই গ্রহণ করবার ক্ষমতা পেয়েছেন একটি গভীর বেদনাবোধ থেকে।

নেমে গিয়ে চন্দ্রভাণ অপেক্ষমান শিবিকায় আরোহণ করেন। পথের দিকে চেয়ে আনমনা হয়ে যায় মোতি। ভাবে, চন্দ্রভাণের কথা। মনে হয় কোন্ বিচ্যুতি ঘটল নাকি। তারপর মনে হয় তার নিজের জীবনে দু'টো প্রেমই সত্যি। সঙ্গীত সে ভালবাসে নিশ্চয়ই, কিন্তু খুদাবক্সকেও কম ভালোবাসে না। দুই-ই সমান, মনে মনে বলে সে।

নীচ থেকে জুহীর কলকণ্ঠ শোনা যায়,—বেগমসাহেবার শিঙার কতদূর? এদিকে এত্তেলা নিয়ে তাজ্জাম এসে গেছে। খেয়াল আছে কি না আছে যে, আজ হচ্ছে সেই দিন।

কথা বলে আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠে জুহী। মোতি আয়নাতে মুখ দেখে, কানে গহনা পরে আর মুখ টিপে হাসে। বলে,—বাস্ বাস্, চুপ কর্। আমার সব খেয়াল আছে।

—এ কিন্তু মাঝরাতে চুপিচুপি—সে সব খেয়াল নয়, এ হচ্ছে ভোরবেলা, কাজের খেয়াল।

—হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়ে শাসন করে জুহীকে মোতি। বলে,—সব খেয়াল আছে।

চঞ্চল চরণে জুহী ঘুরে বেড়ায়। একখানা ছবি সোজা ক'রে বসায়। আয়নার ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় চন্দনের গুঁড়ো। সুর্মা পরে টেনে টেনে। ভুরু কুঁচকে নিজের মুখখানা দেখে। মোতি বলে,—ওতেই চলবে জুহী, এখন চল্।

জুহী বলে,—না, মন খারাপ ক'রে লাভ নেই।

—মন খারাপ হ'ল কেন?

—মন ত' ভালোই থাকে, শুধু তোমার সামনে এলেই—

মোতি মৃদু তাড়না করে। বলে,—চল্ চল্ তবু যদি না সুন্দরদাসের ছেলের কথা জানতাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জুহী হাসিতে হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে,—ছেলেটার একেবারে বুদ্ধি নেই। কালও খত্ পাঠিয়েছে, জানো?

নেমে এসে মোতি তাজ্জামে ওঠে। তাজ্জাম চলে নাট্যশালার দিকে। পথে চলতে চলতে বাহকরা হাঁকে—তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে মোতি। ছাগলছানা কোলে নিয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে হেসে হেসে দৌড়োয় তার ভাই-এর হাত ছাড়িয়ে এঁকে বেঁকে শাক-ওয়ালীদের ঝুড়ির ভেতর দিয়ে। প্রসন্ন কৌতুকে স্মিতানন হাসে মোতি। প্রত্যহের পরিচয় এই পথের সঙ্গে, তবু কেন যে মধুর মনে হয়, কেন যে ভালো লাগে! এই কেনগুলোর উত্তর খোঁজে না মোতি, শুধু এককলি গান গুঞ্জরণ করে—মুরলী ধুন শুনা শাঁবলিয়া।

নাট্যশালাতে সারেঙ্গীয়া, মৃদঙ্গকার ও অন্যান্য সঙ্গতীয়ারা অপেক্ষা করছেন। মাঝখানে শ্যামাকান্তি ঈষৎ স্থূলকায় বাবাসাহেব গঙ্গাধর রাও, শিল্পী সুখলাল কাছ্‌বাহাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সুখলাল নিবিষ্ট হয়ে শুনছেন, আর রাজার চাহিদাগুলো মনে মনে টুকে রাখছেন স্মৃতির পাতায়, ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। নাট্যশালার অধিকারী বিশাল সুখ করণ বসে আছেন পদ্মাসনে। ঋজু হয়ে বসে থাকলে মেরুদণ্ড দিয়ে নাকি শক্তি সঞ্চারিত হয় মাথায়, এই তাঁর বক্তব্য।

ঘরের মাঝখান দিয়ে দরজা পর্যন্ত চলে গেছে কার্পেট। তার বাইরে নাগরা খুলে রেখে নতমস্তকে কুর্ণিশ করতে করতে ঢোকে মোতি। রাজার সামনে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়। তারপর সকলের সামনে মাথা নীচু করে কুর্ণিশের ভঙ্গীতে পেছু হটে গিয়ে স্ব-স্থানে বসে। তার অনুরূপ আচরণের পর জুহী-ও বসে তার পাশে। ক্ষণকাল সকলে অপেক্ষা করে, তারপর রাজার চোখের ইসারা বুঝে নিয়ে বিশাল সুখকরণ সুরু করেন মহড়া। মৃদঙ্গী ঘাড় ঝুঁকিয়ে বাব্‌রী চুল নাচিয়ে বোল বাজিয়ে ওঠে, খোলে ঘা পড়ে। নিমেষে ঘুঙুর বাঁধে মোতি। সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে বিশাল সুখকরণ আসরে এসে দাঁড়ান। গণেশ, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীর বন্দনাগানের পর রাজার প্রশস্তি গীত করেন তারপর দ্রুত সংস্কৃত শ্লোকে, অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনা গেয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান। তখন আলবালে জল সেচন করতে করতে নেপথ্যপরা মোতি প্রবেশ করে। স্বল্প নৃত্যছন্দ, শুধু জলসেচনের ভঙ্গিমা। জুহী ও হীরা, তার অন্য সখীরা-ও আসে।

চিবুকে হাত রেখে জরির তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে দেখেন গণ্ডাধর রাও। প্রশস্ত ললাটে প্রভাতী পূজার আশীর্বাদ-তিলক। কোনো দুশ্চিন্তা যেন কপালের রেখাবলীতে বন্দী হয়ে আছে ব'লে বোধ হয়। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন ক'রে তিনি দেখেন।

সোনা দুষ্মন্ত বেশে প্রবেশ করে আসরে। দেখে গণ্ডাধর রাও সামনের ঘণ্টাতে আঘাত করেন। অভিনয় থেমে যায় চকিতে। কার কি ত্রুটি হয়ে গেছে ভেবে সকলেই দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে। রাজা বলেন,—"মোতি, তোমার চাহনী আর নাচ এরকম তরল হয়েছে কেন? এ কি তওয়ায়েফের আসর? হুঁশ নেই তোমার?"

ভীত মোতি নতমস্তকে শোনে ভর্ৎসনা। তারপর আবার সুরু করে প্রথম থেকে।

ঘড়িতে দশটা বাজতেই উঠে পড়েন রাজা। পাশে করজোড়ে দাঁড়ায় মোতি। রাজা সস্নেহকণ্ঠে বলেন,—বড় পরেশান্ হয়ে গিয়েছ মোতি?

—নেহি জী সরকার।

রাজা বলেন,—আমি ত' চলে যাচ্ছি তিন মাসের মতো। তার আগে একদিন পুরো জলসা দেব।

দরজার দিকে চলতে চলতে বলেন,—রানীমহালে একদিন নাচ দেখাতে হবে। তারপর সকৌতুকে বলেন,—খুব ভাল ক'রে। বাঈসাহেবকে খুশী করতে পারো তো—

নতমুখে মৃদু মৃদু হাসে মোতি। রাজা উঠে বসেন মেণায়। বাহক-রা তুলে নেয় শিবিকা।

প্রাসাদ অভিমুখে চলতে চলতে রাজা কত কথাই যে ভাবেন। কোলে একটি আর অপর একটি ছেলের হাত ধরে মা চলেছে ছেঁড়া কাপড়ের ঘাঘরা দুলিয়ে বিষ্ণুমন্দিরের অন্নসত্র অভিমুখে। তারই প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র। দূরে দব্‌ডী বাজাচ্ছে নকীব—ঘোষণা করছে আজ অপরাহ্নে চৌকে শ্রীমন্ত সরকারের হুকুমে বস্ত্র বিতরণ হবে। সবাই যেন হাজির হয়ে যায়—! অন্নদান, বস্ত্রদান, মন্দিরে মন্দিরে পূজা, লগ্নে লগ্নে হোম যজ্ঞ, সবাই একটি ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে। একটি পুত্র হোক মহারাজের। সিংহাসনের উত্তরাধিকার হোক সুনিশ্চিত। কিশোরী পত্নীর পুত্রেষ্টি-ব্রতের উপবাসে ক্লিষ্ট মুখের একখানা ছবি সেই নিঃসঙ্গ রাজহৃদয়কে ব্যথা দেয়। গত রাত্রে সান্ধ্যপূজার পর যখন বস্ত্র পরিবর্তন করতে চলেছিলেন তিনি, সহসা চোখে পড়েছিল, অলিন্দে মাথা হেলান দিয়ে বসে আছেন রানী। উপবাসে ঈষৎ শীর্ণ বোধ হ'ল চেহারা। সমবেদনা আর স্নেহের ভাব এল রাজার মনে।

দূরে বহু দূরে ক্যান্টনমেণ্টের দিক থেকে ব্রিটিশ বিউগ্‌লে উর্দি বাজছে শোনা গেল। ভ্রূকুঞ্চন করলেন রাজা। বাহকদের বললেন,—জোরে চালাও।

রানীমহালের অঙ্গনে লাল শালু বিছিয়ে দিয়েছে আসরে। ঝুলবারান্দায় বসেছেন পুরনারীরা। তাদেরই মধ্যে বসেছেন রাণী। আসরে মোতি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকায়। অভিবাদন ক'রে বলে,—ফরমাইয়ে সরকার।

রানী তার চেয়ে কিছু ছোটই হবেন। মোতির ঈষৎ উন্নীত মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি অঙ্গুলি হেলনে কাশীকে ডাকেন। কাশী ডেকে বলে, এক নাচ প্রথমে, তার পরে ব্রজধামের গান শুনবেন বাঈসাহেবা।

নীচু হয়ে তস্‌লিম জানায় মোতি। তারপর একবার শান্ত দৃষ্টিতে দেখে তার পরিবেশ। রাজপ্রাসাদের ভেতরের প্রশস্ত অঙ্গন জলে ধোওয়া সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। শ্বিতল প্রাসাদ এই অঙ্গনের চারিপাশ ঘিরে। অপরাহ্ন। তবু সূর্যের আলো এসে পড়েনি এই কালো পাথরের অঙ্গনে, চারপাশের ঘরগুলোতে আড়াল করেছে। প্রাসাদের গায়ে গায়ে জোড়ায় জোড়ায়, মাছ, হাঁস, ময়ূর ও হরিণের মূর্তি উৎকীর্ণ। ও পাশে ঝুলবারান্দায় পাখীর কলরব। চিড়িয়াঘরলে পিঞ্জরা টাঙানো সারি সারি, তাতে শুক, শারী, হীরামন ও কাকাতুয়া। খোপে পায়রা উড়ে এসে বসছে শত শত। বাঁদিকে বোধ হয় আশ্রিত পুরনারীদের বাস। মারাঠা রমণীরা কাছা দিয়ে পরেছেন রঙীন কাপড়। সারি সারি বসে আছেন জোড়াসন হ'য়ে। শিশু, বালক বালিকারও অভাব নেই। বাঈসাহেবাকে এত কাছাকাছি দেখেনি কখনো মোতি। দোতলার ঝুলবারান্দায় তিনি বসেছেন মাঝখানে, একটি হাতলবিহীন চৌকিতে। দুইপাশে বসেছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা। রানীকে মৃদু-মৃদু বাতাস দিচ্ছে কাশী। সকলেই অপেক্ষমান। এদের চোখে কোনো এক বার্তা পড়ে মোতি। এদের কাছে সে শুধু নটি, বাঈসাহেবার বেতনভোগী নর্তকী মাত্র। সহসা রানীর চোখে চোখ পড়ে। যেন তার বিভ্রান্তি বুঝে রানী ভরসা দিয়ে একটু হাসেন। বলেন,—কোন অসুবিধে হচ্ছে?

মোতিও হাসে। বলে, না। তারপর সঙ্গতীয়াদের নির্দেশ দেয়।

রঙ্গিলা তানের হাল্‌কা গানের সঙ্গে লঘু পদক্ষেপে নামে মোতি। পুরো হাতা গলাবন্ধ জামা সবুজ রেশমের, পাঁলা ঘাঘরা, পাঁলা ওড়্‌নী। নাচের তালের সঙ্গে সঙ্গে বাজনা কখনো দ্রুত হয় কখনো আস্তে। মানিনী হয়ে মান ক'রে বসে মোতি, আবার হেসে হেসে প্রসন্ন হয়। পায়ের কাছে লাল শালু কুঁচকে পদ্মফুলের মত হয়ে যায়। তারিফ্ করে মেয়েরা, সবিস্ময়ে দেখে। মোতি তালে তালে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল-শালুতে অনেকগুলি পদ্মরচনা করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

নাচ থামতেই সকলেই প্রশংসা ক'রে ওঠে। তাড়াতাড়ি চাদর টেনে সমান ক'রে দেয় জুহী। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এবার মশালদানে বাড়ি নিয়ে আসে দাসীরা। মহলকারনীরা বাতি জ্বালায় ঘরে ঘরে, ঝাড় লণ্ঠনে, অলিন্দে। এই আবছায়া পরিবেশে, প্রাচীন প্রাসাদের ছায়াচ্ছন্ন অঙ্গনে, মোতি একটু স্বস্তি পায়। মধুর কণ্ঠে চন্দ্রভাণজীর কাছে শেখা গান ধরে—কুঞ্জবন ছোড়ি রে শ্যাম, কাঁহা গাউঁ গুণনাম—

ললিত কণ্ঠে কোনো প্রেমিকার হৃদয়বেদনা বেজে ওঠে। সমস্ত হৃদয় দিয়ে, মীরার গানে মোতি নতুন আকুতি আরোপ করে। নতুন আরতির আলোয় উদ্ভাসিত করে গানের অন্তর্লীন সৌন্দর্য। ভজন গাইতে বসে কেমন যে আবেগ আসে মোতির মনে, তার পরেই

সে চলে যায় বালক কৃষ্ণের প্রতি যশোদার স্নেহোক্তিতে—নন্দলালা মোরে প্যারা আও গিরিধারী বনমালা পহ্‌নাউঁ ইত্‌বারী—। ধীরে অতি সন্তর্পণে সন্ধ্যা নামে গগন ছেড়ে অঙ্গনে। শ্রোতাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। গানের সুরে সুরে যেন, রজধামের ধূলিধূসর সন্ধ্যা, গৃহগামী গাভীদলের গলার ঘণ্টার টুং টাং শব্দ, দুরন্ত বালককে কোলে নিয়ে যশোদার মান-অভিমান, এই সব ছবিগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। গান থামতেও তাই আবেশ কাটে না।

—বড় সুন্দর লাগল, পিয়াস পূরিয়ে দিলে তুমি—রানীর সপ্রশংস উক্তি শুনে মোতি মাথা নীচু করে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও আনন্দে। শুধু ভালো লেগেছে শুনেই মোতি চলে যাবে, রানী তাঁর পার্শ্বচারিণীকে কাছে ডাকেন।

তারা তাড়াতাড়ি ক'রে ছুটে আসে। দাঁড়িয়ে পড়ে মোতি। দাসী বলে, বাঈসাহেবার আশীর্বাদ। লাল রেশমের রুমাল মেলে ধরে। এক জোড়া মুক্তোর বালা। কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায় মোতি। তারপর তুলে নিয়ে রানীর উদ্দেশ্যে পুনর্বার তস্‌লিম পেশ করে। মোহরের থলিটা দেয় জুহাঁর হাতে। একটা মোহর বের ক'রে দেয় দাসীর হাতে।

রাতে যখন গল্পাধর বিশ্রাম করতে এলেন, রানী অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। বললেন, মোতির গান আমার খুব ভালো লাগল। কি সুন্দর ভক্তির সুরে গাইল। বড় গুণী মেয়ে, বড় কলাবিদ্‌।

—ভালো লেগেছে তোমার?

—হ্যাঁ।

তারপর একটু ইতস্তত ক'রে, হেসে বল্‌লেন, আমার মোতির কঙ্কণ আমি ওকে দিয়েছি। ভালো করিনি? একটু যেন অপরাধের সুর আল্‌তো হ'য়ে ছুঁয়ে আছে প্রশ্নটায়।

রাজা বললেন, বেশ করেছ। মোতিকে মোতির বালা দিয়েছ, ঠিক করেছ। কি বিঠুরওয়ালী, খুব কাব্যবোধ হয়েছে ত? বড় খুশী হ'লাম। হাসছ?

—আমি বিঠুর ছাড়লাম, তবু নাম আমাকে ছাড়ল না।

—না আগের চেয়ে অনেক মানুষ হয়েছ। মানতেই হবে—

এবার দু'জনেই হেসে ফেললেন। অনেক দুশ্চিন্তার মাঝখানে একটু হাসিতে যেন মনের ভারও খানিকটা নেমে গেল।

লছমীমন্দির ছাড়িয়ে পূবদিকে চলতে চলতে টিলার গায়ে একটি মিনার ও ঘর। লোকালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে এখানে পলাশ, কেঁদ, তেঁতুল ও শিরীষ গাছের বন। শেষ-বসন্তের অন্তিম বাসনা মূর্ত ক'রে ফুটে উঠেছে পলাশ। বনজুঁই-এর গাছেও গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে। তার স্নিগ্ধ গন্ধে মদির হয়েছে পরিবেশ। শুক্লপক্ষ সমাপনে চাঁদের দিন ফুরিয়েছে। দিনমানেও এখানে কেউ আসে না।

প্রতি রজনীতে ছায়া ও সুরভিসমাকুল এই বিসর্পিল বনপথ ধরে অভিসারিকা রাধিকার মত গোপনে আসে মোতি। কত শাসন, কত বাধা, রাজার নজরে পড়বার আশঙ্কা, সব অগ্রাহ্য ক'রে আসতে হয়। খুদাবক্সের সঙ্গে কিস্তি বেয়ে চলে এসে, জলের ওপরে আনমিত একটি জামগাছের ডালের আড়ালে কিস্তি বাঁধে তারা। তারপর চলে আসে তাদের এই ছোট্ট ঘরখানায়। পাথরের ঘর। একপাশে একটা মোটা মোমবাতি জ্বলে। তাতে একটা সুন্দর আভা হয়।

সেই স্বরূপ আলোতে বাঈসাহেবের ইনাম, বালাজোড়া হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়

মোতি। খুদাবক্স ছলনা করে। বলে, দেখতে পাচ্ছি না ত? মোতি বলে, কেন, আলোতে ভাল ক'রে দেখ। খুদাবক্স বলে,—না, তোমাকে দেখে দেখেই সব আলো আমার ফুরিয়ে গেছে। এখন আর অন্য আলো কোথায় মিলবে বল?

মধুর হাসে মোতি। কোমল হাত তার মুখের ওপর রাখে। মোতির পোষাক দেখে হাসে খুদাবক্স, বলে, কিষাণের সঙ্গে মিশে কিষাণী হয়ে গেছ মোতি। কালো মোটা কাপড়ের ঘাগরা আর ওড়নীতে মোতিকে সত্যিই গাঁয়ের মেয়ের মত দেখায়। খুদাবক্স বলে, এক গান গাও মোতি?

—বল কোন গান।

—যে গান গাইতে চায় তোমার মন।

ভীরু সরমে মধুর কণ্ঠে সেই পুরানো গান গায় মোতি। গজলের কথায় আর সুরে ললিত রাগ তার আবেদন জানায়। মিনতি ক'রে বলে, হে বুলবুল, তুমি অশ্রুবর্ষণ কোরো না, এখানে অশ্রুবর্ষণে মানা আছে—

মৎ রো ই'হা বুল্‌বুল্‌—
আঁসু বহানা হ্যায় মনা॥

ফুলের মত ওষ্ঠাধর মৃদু গুঞ্জন করে কথাগুলি। অনভ্যস্ত কোন্ বেদনার অনুভূতি জাগে খুদাবক্সের মনে। নীলাভ তীক্ষ্ণচোখে নামে কোমল মমতা। অনুভূতির কোন্ জটিল অরণ্যে পথ হারায় খুদাবক্সের তরুণ মন। গানের সুর সেই অরণ্যের দিশারী। সুরে সুরে যেন ফুল ফুটে ওঠে, জোনাকি জ্বলে, মাধুরী ও প্রেম সুরভিত করে সেই ছায়াপথ। শেষ স্তবকের সময়ে পুনর্বার ফিরে আসে কোনো দুখিয়ারী মনের সকরুণ মিনতি—

মেরে প্রীতম্ নিদ্ হুয়ে হ্যায়
সোর মচানা হ্যায় মনা॥

মিলনের প্রথম বাসর। মন জানাজানি হয়েছে সবে। যন্ত্রগুলি বাঁধা হয়েছে, ঝাড়ে বাতি জ্বলছে, অপেক্ষমান এক আসর। সেখানে সঙ্গীত এখনো সুরু হতে বাকি, সবে যেন সায়াহ্ন। এখনি কেন এই বিরহের গান গাইলো মোতি? এই সময়কে করল ব্যাথাতুর? খুদাবক্স ভেবে পায় না। মোতিকে দেখে দেখে অবাক মানে বারবার। বিস্ময় তার আর ফুরোয় না। কি অপরূপ সুন্দরী মোতি, কি রহস্য থেমে আছে তার অধরে নয়নে অলকে। অথচ বড় গভীর আর শান্ত।

মোতি হাসে একটু। নীরবতার মুহূর্তগুলি আবেগ ও বাসনায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠতে চায়, তাতে ভয় পায় মোতি। খুদাবক্সের হাতে হাত রেখে বলে, কিছু বল খুদাবক্স।

—কি বলব মোতি।

—তোমার কথা বল।

—আমার কথা ত' বলেছি মোতি, সবই ত' তুমি জান। আমার জীবনটাই বা কতটুকু বল, আর কি জানাবার আছে। তবে বলবার অনেক ইচ্ছে ছিল মোতি। তোমার আগে কে শুনতে চেয়েছে বল।

উন্মীলিত কমলদলের মত শিশিরের ফোঁটাগুলি গ্রহণ করে মোতি। বলে, আমার কথাও ত' তুমি সব জান খুদাবক্স। সেই কোন ছোটবেলা মা মরে গেল, মানুষ করল

মল্লু সারেঙ্গীয়া। দিল্লীতে বিশ্বেশ্বর মিশ্র খেয়ালীয়ার বাড়ীতে ছিলাম তাঁর স্ত্রীর আশ্রয়ে। আট বছর বয়সে সেখান থেকে আমাকে এনেছেন চন্দ্রভাণজী। বড় বিধিনিষেধ আর কড়া পাহারায় থেকেছি খুদাবক্স। শাসন আর নজর মানতে শিখেছি।...রাজার নাটে আমরা নাচ্‌নেওয়ালী, কি জীবন বল, কি বা জানতাম।

—কবে জানলে মোতি, কিছু কি জেনেছ?

—হ্যাঁ খুদাবক্স, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পরে জেনেছি যে আমার জীবনেরও মূল্য আছে।

—নিশ্চয় আছে মোতি। আমার কাছে আছে।

—বড় বে-বফা দুনিয়া খুদাবক্স। মনে ভাবি, ভুল করলাম না ঠিক করলাম, তোমাকে কোন দুঃখের মধ্যে আনলাম কি না কে জানে! আমার কথা বলে কয়ে বিশ্বেশ্বরজী চন্দ্রভাণজীকে অনেক অনুরোধ করলেন। চন্দ্রভাণজী আমাকে ঝাঁসী আনলেন। বাবা-সাহেবের বড় ভাই রঘুনাথ রাও তখন গদীতে ছিলেন। বাবাসাহেবের নাট্যশালার সখ জানো ত? সেই থেকে আমি নাচ গান শিখেছি, খানিকটা পর্দানশীন্ হয়ে বড় হয়েছি। বাইরের দুনিয়ার কাকেই বা চিনি বল? বিধিনিষেধ, কত বাধা, সে তুমি বুঝবে না খুদাবক্স তারপরে জানোই-ত' আমার মা ছিল নাচওয়ালী, এ আমার জন্মগত পেশা, এক সময় মনে হয়, তোমার জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে তোমাকেই হয়তো কষ্ট দেব—কি করলাম, ভালো কি মন্দ—তা জানেন উপরওয়ালা।

—আমি জানি। ব'লে খুদাবক্স তাকে কাছে টেনে নেয়। মাথাটা হেলিয়ে দেয় কাঁধে। মোতি পরমনির্ভরে মাথা হেলান দেয়। সুরভিত চুলের গন্ধ আসে। চূর্ণ কুন্তলগুলি সযত্নে কপাল থেকে সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। অনেক দূরে কোনো রাতচরা পাখী ডেকে ওঠে। জোনাকি মুঠো মুঠো আলো ছড়িয়ে দেয় গাছের তলায়।

পাশাপাশি দু'খানা বুক উত্তাল হয়ে ওঠে। পরস্পরের হৃৎস্পন্দন শোনে দু'জনে। মোতির হাতখানা তুলে ধরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে খুদাবক্স। এত কোমল, এত পেলব। নিজের হাতের ওপর রেখে দেখে। মোতি বলে,—কি দেখ্‌ছ?

—মানায় না।

—কি?

—দেখ কি বে-মানান্।

মোতি বলে, খুব মানায়। কিচ্ছু জান না তুমি।

দু'জনের ভালবাসা এক সঙ্গে স্পন্দিত হয়। তারাগুলোও যেন তাদের মনের আনন্দ ধরে নিয়ে থরথর কাঁপে। মোতির মুখ তুলে নিয়ে এমন ক'রে দেখে খুদাবক্স যে মোতি লজ্জা পায়। বলে, কি দেখছ? কি এমন জিনিষ?

—বড় আশ্চর্য জিনিষ মোতি, তুমি যদি আরশী নিয়ে দেখো তবু এর নিশানা পাবে না। আমার চোখে দেখতে হবে।

—আমি দেখতে চাই না। তুমিই দেখ।

একটু হাসল খুদাবক্স। তারপর তার চোখের দৃষ্টি গভীর হয়ে নেমে এল। সেই চোখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জগৎসংসার ভুলে গেল মোতি। গভীরতর কোন দুর্বার আকর্ষণ খুদাবক্সের চোখে। মোতির চিবুকটা তুলে ধরল সে। ঈষৎ আনমিত করল তার নিজের মুখ।

কয়েকটি মুহূর্তের হিসেব হারিয়ে গেল। তারপর খুদাবক্স গভীর গলায় আবৃত্তি করল—অগর ফিরদৌসে বার, রু-মে-জমিন্ অস্ত্—

মনে মনে মোতি বলল—হামীন্ অস্ত্! সে ত' আমারও কথা।

রজনী অতিক্রান্তা হয়ে অবতীর্ণ হলেন তৃতীয় যামে। মোতি বলল, চল রাত আর অল্প বাকি।

—চল।

জলের ধারে কিস্তির কাছে এসে খুদাবক্স বলল, মোতি, থএর যদি হ'য়ে থাকে ত' মাপ কোর—। অন্যায় করিনি ত?

গভীর সপ্রেম চাহনিতে তাকে আশ্বস্ত করল মোতি। বলল—আমার কাছে তোমার কিছু অপরাধ নেই।

কিস্তি ছেড়ে দিল খুদাবক্স।

কামানগুলো যে জ্যান্ত কিছু নয় তা ঘোঁসের কথা থেকে বুঝতে পারা কঠিন। ভবানীশঙ্কর ঘনগর্জ, কড়ক-বিজুলী, নলদার—কামান নয়, যেন পঞ্চপুত্রের কথা বলছেন ঘোঁস, এমনই মনে হয় খুদাবক্সের।

—কি চেহারা, কি তেজ, কি লড়াই করবার হিম্মৎ, পেশোয়া-র আমলে কি রকম খেলা দেখিয়েছে কি বলি! কি সব দিন চলে গেল বল ত? বিশাল স্পবিরদেহ কামানটার দিকে চেয়ে ঘোঁস এমনভাবে আফ্‌শোষ করেন যে অবাক হয় খুদাবক্স। ঘোঁস ঘনগর্জকে একটু হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, চুপ ক'রে ঘুমো ব্যাটা, হিম্মৎ বঢ়াতে রহো।

—দরকার হবে না কি?

—না না, কি বলছ তুমি। সে-সব দিন একেবারে খতম। এখন শুনি লড়াই হয় কাগজে কলমে। অংরেজ সরকারের সঙ্গে খরীতা, চলে দরবারে দরবারে। দিন-কালের গন্ধটাই বদ্‌লে যাচ্ছে না কি বল! ছিল বটে সে সব দিন।

কেল্লার দক্ষিণবুরুজে দাঁড়িয়ে ও-পাশে ইংরেজ ছাউনী চোখে পড়ে। ঝক্‌ঝক্ করছে বেয়নেট। মার্চ ক'রে ফৌজ ফিরছে ছাউনীতে। গোঁফে মোচড় দিয়ে অনুকম্পার সুরে ঘোঁস বললেন, লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট রাইট ট্রেনশান! চালাতে থাক্। ওদের আদবকায়দা কিন্তু ভারী চমৎকার! তবে পরেড্ আর পরেড্! আমার পছন্দ হয় না। সকাল, বিকেল, রাত যেন ঘড়ির মতো চলছে।

বুরুজের কিনারে পাথরের প্রাকারে বসেন ঘোঁস। খুদাবক্সকেও বসতে ইঙ্গিত করেন। বলেন, অংরেজদের বন্দুক, কামান ভারী চমৎকার। আমার কবে থেকে শৌখ্ ছিল দুটো অংরেজী কামান কিনব। ওজনে হাল্কা, ব্যবহারে সুবিধে অথচ ভারী পাল্লাদার। গোয়ালিয়রে আছে কয়েকটা, সেখানেই দেখেছি।

টহল দিয়ে ঘুরিয়ে আনছে দুটো হাতীকে রাস্তা দিয়ে। বাঁকে ক'রে জিলিপী আসছে দেখা গেল। বড় হাতীটার রোজকার বরাদ্দ। অনেকটা উঁচু থেকে সহরটা দেখতেও চমৎকার লাগে। দূরে পাহাড়গুলো দেখা যায়। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন ভালো-লাগার আনন্দটা খুব উপভোগ্য মনে হয় খুদাবক্সের। এক মুঠো বাদাম আখ্‌রোট তুলে দেন তার হাতে ঘোঁস। নিজেও ভাঙেন দুটো একটা। তারপর বলেন, বেটা, কথা আছে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

উত্তর নিষ্প্রয়োজন। ঘোস বলেন, তোমার মনে পড়ে সাতবছর আগেকার কথা? যখন তোমার আমার প্রথম মুলাকাৎ হয়েছিল? আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার মধ্যে সাচ্চা ইম্পাত আছে বলে আমি মনে করি। আর এ-ও আমি আমার জিন্দ্‌গী ভরে দেখলাম, একটু ভালবাসা, একটু দেখ্‌-ভালাইএর অভাবে, সেই ইম্পাতে তৈরী হয় কসাই-এর ছুরি। কিছু আমার বল্‌বার নেই, কেন না, তুমি আমার সব চাহিদা ভরে দিয়েছ। ঘোড়া চালাতে, তরোয়াল খেলতে, বন্দুক লড়তে, কামানের তদারক করতে খুব তৈরী হয়ে গিয়েছ তুমি। এখন কয়দিন থেকে কিছু কিছু কথা শুনতে পাচ্ছি। কি, বাবাসাহেবের তওয়ায়েফ্‌ মোতির সঙ্গে তোমার কিছু বুঝ্‌ হয়েছে?

ঘোসের দিকে চেয়ে খুদাবক্স বলে,—আপনি যে নিশানা করেছেন ওস্তাদ্‌, ও একেবারে ঠিক। কিন্তু এতে কোন ইজ্জত ছোট হবার কথা নেই—কারণ আমি তাকে ভালবাসি। এতে কি আমার কোন গুণাহ্‌ হয়েছে? কোন অপরাধ করেছি কি?

ঘোস ব্যথিত নয়নে ঘাড় নাড়েন। বলেন, সচ্চা আস্‌ক্‌, খাঁটি সোনা। তা কারোর ইজ্জৎ ছোট করে না—বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তুমি ত' সব জান না বেটা। জান না কি, মোতি নিজের মালিক নয়। হাঁ বাঁদী নয় বটে, কিন্তু বাবাসাহেব ওকে ছোট থেকে বড় করেছেন, সব শিখিয়েছেন, দরবারে দরবারে যে মামুলী তওয়ায়েফ্‌ থাকে, তাদের চেয়ে মোতিকে অনেক ভালোভাবে রেখেছেন। মোতিকে তুমি কি করবে, সাদী ত' করতে পারবে না!

—কেন নয়? আমি সাদী নিশ্চয় করব। আপনি একথা কখনো ভাববেন না—

—আরে হামারা বাত্‌ ছোড়ো—ব'লে ধমক দেন ঘোস। বলেন—সাদী করবে! তোমার মা কি বলবেন?

—মা মেনে নেবেন। তর্কে'র খাতিরে কথাটা বলে খুদাবক্স। ব'লেই মনে হয় অসম্ভব কি। উত্তেজনায় আরক্ত মুখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে।

হতাশার ভঙ্গীতে হাত উল্‌টোন ঘোস। বলেন,—বেশ! মা-ও নয় মেনেই নিলেন। কিন্তু হাওয়ার উপর ইমারত বানিও না বেটা, মোতিকে সাদী করতে দেবেন না বাবাসাহেব। বুঝছ না তুমি? আইন নেই, নিয়ম নেই, রাজা যা বলেন তাই হয়। মোতির ওপর তাঁর নিজের কোন মত্‌লব নেই সত্যি, তবু তুমি তাঁর হাবিলদার, আর দরবারের নটি মোতি—স্বাধীন ইচ্ছেয় নিজেদের মধ্যে মিলমিশ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

—আমি পরোয়া করি না। এই দর্পিত উক্তির সময় এমন দেখায় খুদাবক্সকে, যে ঘোস খুব বোঝেন, এই তেজ, এই বে-পরোয়া জিদ্‌, নিজের ভবিষ্যৎ বাতাসের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে হৃদয়ের দাবী মেনে নিয়ে দেওয়ানা হবার সাহস, একমাত্র যৌবনের পক্ষেই সম্ভব। খুদাবক্সের সতেজ সুন্দর চেহারা, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, দেখে দেখে তাঁর নিজেকে বড়ই বুড়ো মনে হয়। কিছু ঈর্ষাও হয়। তারপরই স্নেহ ও বাৎসল্যের সুরে বলেন, খুব হয়েছে। বোস। মস্ত মর্দান্‌ হয়েছ বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বোঝ, বে-পরোয়া কিছু কোর না। অনেক ক'রে নিজের জীবন একটুখানি গড়েছ, এক ঠোকরে ভেঙে দিও না বেটা। যদি এমনিভাবে চলে তো সম্মান, অর্থ আর নিরাপত্তা, সবই মিলবে তোমার। দেখ, জীবনে কত কিছু বুঝবার আছে, শিখবার আছে—দিন তোমার সামনে। আমি আসল দিনগুলোই পিছে ফেলে এসেছি—যখন ঠোক্কর খেয়ে ফিরেছি পথে পথে।

ঘোসের কণ্ঠের আন্তরিক বেদনা স্পর্শ করে খুদাবক্সকে। বলে,—ওস্তাদ!

ঘোস উঠে দাঁড়াল। বলেন, চল, যাওয়া যাক্‌, বেলা হয়ে যাচ্ছে! একটা খেয়াল রেখ—তোমাকে আমি ভানহাত করে নিয়েছি, রাজা-ও একটু স্নেহ করেন, শত্রু তোমার অনেক। তুমি কি কর না কর, খবর ঠিক রাখে সবাই, রাজার কানে-ও দুটো একটা কথা গিয়েছে। তাই এতগুলো কথা কইলাম।...জানো কি? যে তোমাকেও যেতে হচ্ছে?

—কোথায়? চকিত হয় খুদাবক্স।

—রাজার সঙ্গে সফরে। একটি ছেলে হ'ল না বলে রাজার বড় দুশ্চিন্তা হয়েছে। ভয় হয়ে গেছে গদীর জন্যে। রাজাদের নসীব জানো ত, একটা ছেলের জন্যে গদী ছুটে যেতে পারে। যাই হোক, রাজা যাবেন তীর্থে—তিন মাসের জন্যে। আমি ত' যাবই। ইচ্ছে ক'রেই তোমার নাম বলেছি। যাতে তোমার ওপর সন্দেহটা তাঁর কমে যায়। আমাকে দুটো একটা কথা বলেছেন, মনে হচ্ছে কিছু সন্দেহ করেন উনি। জানি না। একটু ক্রোধী মানুষ ত। সিঁড়ি ধ'রে নামতে নামতে বলেন, কিস্তি রোজ চালায় কে? তুমি, না ও?—ব'লেই বলেন, ঝগড়া করতে পাবে না। হেসে ফেলেন একটু। খুদাবক্স আশ্বস্ত হয়। নেমে এসে ঘোসকে সেলাম জানিয়ে প্রায় লাফিয়ে নেমে গিয়ে ঘোড়ায় ওঠে। মুরেঠা নাচিয়ে আবার সেলাম জানায়। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

তাকিয়ে থাকেন ঘোস। বুড়ো ঈশ্বরদাস হিসাব মিটিয়ে খাতা বগলে নিয়ে ছাতা খুলতে খুলতে বলে, আমার আপনার মতন বুড়ো চোখে ছোকরাকে দেখলে বড় খুশী আসে, না খাঁ সাহেব? কি দেমাক, আর কি ঠাট!

ঘোস সম্মতি জানান। কিন্তু মানতে পারেন না। এতদিন আরাম আর খুশীই হচ্ছিল, ইদানীং একটু দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। রাজার কথাবার্তা মনে পড়ে। খুদাবক্সের জন্যে দুশ্চিন্তা হয়। রাগ হয় মোতির ওপর। ঘোড়ায় চড়তে চড়তে, ঘোড়াকেই বলেন, যেখানেই মুস্কিল, সেখানেই কিছু ঘাঘ্‌রী ওড়নীর কারবার আছে। না কি রে বাহাদুর, বল্‌?

কানঝাড়া ক'রে একটু শোনে ঘোড়া। তারপর চালকের নির্দেশে চলতে থাকে দুল্‌কি চালে। ঘোস আথ্‌রোট খেতে খেতে পথ চলেন। ব্রিটিশ অফিসার খোদ এলিস সাহেব যে প্রাসাদের দিকে চলতে চলতে তাঁকে স্বীকারের নজিরে একটু মাথা নোয়ালেন—তা খেয়ালই হ'ল না তাঁর। একটু বিস্মিত হলেন এলিস। তারপর হতাশভঙ্গীতে তিনিও মাথা নাড়লেন। বড় মুস্কিল এদের আদব-কায়দা বোঝা।

নয়

শয়নকক্ষে সারি সারি রাজার পিতৃপুরুষের পুরানো চঙের তৈলচিত্র। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রাজার বক্তব্যটা যেন আরো জরুরী হয়ে ওঠে। সুদৃশ্য শ্বেতপাথরের শঙ্খ চাপা দেওয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা টেবিলে পড়ে আছে। রানী মাথা নীচু ক'রে স্বামীর কথাই শুধু শোনেন। রাজা বলেন,—একটি পুত্র আমাদের প্রয়োজন। কি দুশ্চিন্তা আমাকে অহর্নিশি অনুসরণ করছে, তোমাকে কি বলব। তীর্থে যাব স্থির করেছি, তার আগে তোমার ও আমার কোষ্ঠিপত্র পুনর্বার বিচার করিয়ে এনেছি কাশী থেকে। তোমার কোষ্ঠির বিচারে এক কথা বলে—তুমি নেবালকর বংশের যশের কারণ হবে। আমি ত' বিচারে ভুল করিনি। যে যা চায় আমি দু'হাত ভরে দিই, আর ভাবি নিশ্চয় প্রসন্ন হবেন

শঙ্কর। নইলে—। নইলে কি হবে ভাবতে গিয়ে দু'জনেরই চোখ পড়ে খোলা মানচিত্রখানার ওপর।

বাইরে পর্দা দুলে ওঠে। দাসী জানায় এলিসের আগমন বার্তা। রাজা বেরিয়ে যান। রানী জানালা দিয়ে তাকান বাইরে। অঙ্গনে তাঁরই বয়সী তাঁর দাসীরা হাসাহাসি ক'রে জল নিয়ে চলেছে পিতলের ঘড়া মাথায়। কেমন নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন। কত হাসবার অবসর। বারান্দা-ঘেরা ঘর। আলো বেশী আসে না। নরম গালিচায় পায়চারি ক'রে দেয়ালের দিকে ফিরে আসেন রানী। বিলম্বিত ছবিগুলোর বড় বড় চোখে স্থির দৃষ্টি। সকলের মধ্যে স্বামীর কথারই পুনরাবৃত্তি যেন ঝঙ্কৃত হয়—পুত্র চাই, বংশধর চাই, উত্তরাধিকারী চাই!

মনে মনে মহাদেবকে প্রণাম করেন রানী। এত ব্রত, পুজা, উপবাস, তার সুফল নিশ্চয় মিলবে। প্রসন্ন হবেন মহাদেব। নইলে তাঁর জীবনটার মানেই তো হারিয়ে যাবে।

আসন্ন যাত্রার প্রাক্কালে মহাসমারোহে জলসা বসেছে। নাট্যশালা দীপমালা সজ্জিত। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে লাল গালিচা। দুই পাশে অবিচল মুখে দাঁড়িয়ে আছে ভালাদার, রুপোর ভালা হাতে। তাঞ্জামে একে একে এসে নাম্‌ছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। রাজপুরুষ, ইংরেজ অফিসার, বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অরছা ও দতিয়ার রাজা। প্রত্যেকের সম্মান রক্ষা ক'রে ভেতরে নিয়ে আসছেন রাজার কর্মচারীবৃন্দ। গালিচা-ঢাকা ঘরে কুর্শী পড়েছে সারি সারি। হাজারখানা মোমবাতির ঝাড় দুলছে মাথার ওপর। পান, এলাচি ও আতর ফিরছে হাতে হাতে। দরজায় দরজায় পত্রপুষ্পের মালা।

রাজার অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদলের বাছাই-করা লোকরা দরজায় দরজায় সুসজ্জিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেরিয়ে যাবার দরজার মুখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুদাবক্স। মনটা তার ভাল নেই।

সে জানে দর্শকরা মোহর নিয়ে ব'সে আছেন। নাচ শেষ হ'তে মোহর ছুঁড়ে দেবেন তাঁরা। মোতির পেশার সে-ও একটা অঙ্গ। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ-সই নয়। তা ছাড়া তার বা মোতির, এই জমায়েতের কাছে বেতনভোগী নাচওয়ালী বা হাবিলদার ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই, সেই রূঢ় সত্যটা এই কায়দাদুরস্ত মজ্‌লিসে ব'সে যেমন মালুম হচ্ছে এমন আর কিছুতে হয় না। গঙ্গাধর রাও কলারসিক মানুষ। কিন্তু এই জলসা একান্ত ভাবেই তওয়ায়েফ্‌ কায়দায় হবে।

একটু গরম লাগছিল খুদাবক্সের। সন্ধ্যার দিকে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সিদ্ধিমালাই খেয়েছে। খেলে নেশা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই সাগর জিভ কেটে লম্বা লম্বা ফিরস্তি দিয়েছিল উর্দুতে। তবু বে-চায়ন্‌ বোধ হচ্ছে একটু, অস্বীকার করা যায় না। ঘোস বাধ্য হয়ে বসেছেন চতুর্থ সারিতে, কিন্তু খুদাবক্সের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাতে ভুলছেন না। বাহ্‌রাম খাঁ ঢুকে ঘোসের কানে কি বলে খুদাবক্সের পাশে এসে দাঁড়াল। বোধ হ'ল ঘোস নিশ্চিন্ত হলেন।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। সহসা একসঙ্গে সারেঙ্গী ও তবলা বেজে উঠল, আর জাফরান ঘাঘরায় তুফান তুলে প্রবেশ করল মোতি। দর্শকরা যেন একবার নিশ্বাস ভেতরে টানলেন। রঙ, রেশম, জরি, গহনা আর বেণীতে ঘূর্ণী হাওয়ার মত কয়েকটা পাক মেরে আসরের চারপাশে ঘুরে নতি জানিয়ে জরির একটা বৃত্ত রচনা করে ঘাঘ্‌রা ছড়িয়ে দিয়ে মাঝখানে বসল মোতি। মাথায় মুক্তার সিঁথিমোর, দীর্ঘ বেণীর প্রান্তে সোনার ঝিঁজর, চোলির নীচে গৌর দেহের একটু অনাবৃত অংশ। বুক থেকে গলা অবধি গহনায় ঢাকা, আঙুলে, মনিবন্ধে, সর্বত্র মোতি চুনী ও পান্নার ঝিলিক, ঘাঘরার ঘের শেষ হয়েছে গোড়ালির ওপরে, গোড়ালি অবধি চেপা ঘনসবুজ পেশোয়াজ, হাল্কা জরির ওড়না আজ আর আবরণ নয়, আভরণ। সেই সরল, শান্ত, লজ্জাবনতমুখী, একান্ত ভাবে খুদাবক্সের ওপর নির্ভরশীলা প্রেমিকাকে কোথাও খুঁজে পেল না খুদাবক্স। এই লীলাচপলার গতিতে বিভ্রম, চাহনি মদালস ও উদ্‌ভ্রান্ত, এ যেন মোতি নয়, যেন কাঁচের পানপাত্রে টলমল করছে তরল সুরা।

সুর্মাটানা চোখে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল মোতি। সকলেই যেন তাকে তারিফ করছে চোখে চোখে। মৃদু শিহরণে মুখ নামাল মোতি, তারপর ধরল ঠুম্‌রী—'কাঁহা শুনি ব্রজক বাঁশুরী—'।

এমন মিঠে ঝঙ্কার উঠল যে মনে হ'ল গলায় নয়, কোনো স্পর্শকাতর তারের বাজনায় ঝঙ্কার লেগেছে। মুখে মুখে তারিফ উঠল ঘর গম্‌গম্‌ করে।

গানের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁও বাতায় মোতি। মুখে ভাববিলাস না খেললে ভূমিকা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। কখনো চোখের পাতা মৃদুকম্পনে শরম টানে, কখনো ভ্রূ ধনুকের মতো টেনে হয় বিজয়িনী, আবার ওড়না একটু ঢেকে, একটু খুলে নায়িকাসুলভ লীলা দেখিয়ে মোতি গান শেষ করে।

রাজার অনুসরণে মোহর পড়ে লাল সালুর ওপর।

কুড়িয়ে এবার নিতেই হবে। এমন পরীক্ষায় কখনো পড়েনি মোতি। আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে অবমানিতা মোতি আশ্বাস খুঁজে ফেরে চোখে চোখে। এক পলকে অনুভব করে রাজার তীক্ষ্ন দৃষ্টি, তার দিকে শিকারীর মতো চেয়ে কি যেন খুঁজছে। নীচু হ'য়ে তুলে নেয় মোতি আর দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। বিভ্রান্তিতে ওড়না একটু নি-লাজ করে মোতিকে, হাতে মোহরগুলো কেমন যেন বেঁধে, ওদিকে সারেঙ্গীয়া তার নাচের সুর বাজিয়ে তুলেছে, এবার ধামারের লহরায় নাচ্‌বে মোতি। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘরের শেষপ্রান্তে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে খুদাবক্স। চোখ নামিয়ে নিল মোতি। সাবধান হয়ে থাকবার প্রয়োজন তাকে ভালো করেই সকালে বুঝিয়েছেন চন্দ্রভাণজী। এতটুকু সন্দেহ যাতে কারো মনে না আসে, তাই দ্রুত প্রণতি সেরে একেবারেই নাচতে সুরু করল মোতি। পায়ের তালে তালে, ঘাঘ্‌রা পেশোয়াজের দোলে, রঙিলা তানের ছোট ছোট ফুলঝুরিতে মনমাতানো পরিবেশ রচনা হ'য়ে গেল। অরছার বিজয়বাহাদুর বে-তালা তারিফ দিতে সুরু করলেন। ভ্রূভঙ্গে অসন্তোষ দমন করলেন গঙ্গাধর রাও। হাজার হলেও অতিথি। শুধু নাচগানের নাটক নয়, ভেতর ভেতর আর একটা নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি অনিবার্যভাবে স্থানকালের পরোয়া না ক'রে ঘনিয়ে আসছে, তা তিনি তখনো বোঝেননি। সিদ্ধির নেশা তখন মগজে উঠেছে খুদাবক্সের। আসরে যে নাচ্‌ছে তার পায়ের তাল, বোল, মনের তুফান সবটা শুধু সে-ই বুঝছে। বুঝছে বলেই কেমন যেন অসহ্য লাগছে।

নাচ শেষ হতেই আবার মোহর পড়ল আসরে। নাচের নেশায় মোতিও একটু মাতাল। রাজার ঠিক সোজা নজরের সামনে দাঁড়িয়ে কোন বে-চাল সে করতে পারে না। বিশেষত গুপ্তচরের মুখে খবর শুনে যখন রাজা চ'টে আছেন। আভূমি প্রণত হয়ে তস্‌লিম জানিয়ে

মোতি উঠে দাঁড়াল। পরিশ্রমে আরক্ত মুখ, চূর্ণ কুন্তল, কপালে ঘাম, তার দিকে চেয়ে কি মন্তব্য ক'রে উঠে দাঁড়ালেন ইংরেজ অফিসার, ছুড়ে দিলেন একটা মুখবাঁধা লাল থলি। হঠাৎ সমস্ত কথাবার্তার ভেতর দিয়ে তার কানে এসে বাজল—মোতি ছুঁ না মৎ! মোতি ছুঁয়োনা।

অবিশ্বাস্য এই ঔদ্ধত্য। একটি নিশ্চল মুহূর্ত, তারপরেই আবার শোনা গেল—কেন নিলে মোতি?

খুব নীচু গলা। তবু চারিপাশ নীরব বলেই শোনা গেল। দুইচোখ ভরে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে গেল মোতির। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কার ভরসা চাইল। তারপরই রাজসাহেবের ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু চীৎকার শোনা গেল—বন্ধ করো!

কোলাহল উঠল নানা গলায়। তারই মধ্যে ছুটে এলেন ঘোস। প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বাহ্‌রাম খাঁর সঙ্গে খুদাবক্সকে দরজা দিয়ে ঠেলে বের করে দিলেন। বল্‌লেন—স্বর্‌পদাস মেওয়াওয়ালা, মানিকচৌক! তারপরই চলে এলেন ভেতরে।

হতবুদ্ধি খুদাবক্সকে টেনে নিয়ে বাহ্‌রাম ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। গলির কিনারে একটা পানের দোকান। তার পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে বের করে আনলো একটা ফলের দোকানের সামনে। মুখে বসন্তের দাগ, কালোরঙ একজন আধাবুড়ো লোক বাহ্‌রামকে দেখেই নেমে এল। পাশের দরজা খুলে তাদের ঢুকিয়ে নিল। খুব দ্রুত কি যেন বল্‌ল তাকে বাহ্‌রাম খাঁ। লোকটা তাড়াতাড়ি মেঝেতে ময়লা মাদুরের ওপর সতরঞ্চের পাশা বিছিয়ে দিল। পাশে রাখ্‌ল দুটো গেলাস, একভাঁড় সিন্ধি। বাহ্‌রাম খুদাবক্সকে বল্‌ল—শোন ভাই, খাঁ সাহেবের হুকুম, আর তোমার জান বাঁচানোর জন্যেও বটে, এখানি হয়ত', খুদা না করেন, তোমার খোঁজে ফৌজ আসবে। তুমি আজ যা করেছ, তাতে গর্দান্ চলে যেতো যদি কোন কোন দরবারের মত এখানেও পোষা গুণ্ডার চল্ থাকতো। অরছা দতিয়ার রাজা, আর অংরেজ অফিসারদের সামনে তুমি বে-ইজ্জতী করেছ রাজাকে। খেয়াল হয়, রাজা ধরতে পারেননি, কিন্তু তোমার ওপর সন্দেহ তো তাঁর চট্ করেই আসবে। এ-ও খেয়াল হয় খবর নিতে এখনি লোক আসবে—

নেশার ঘোর আর চমক তখন অনেকটা কেটেছে। খুদাবক্সকে বাহ্‌রাম আবার বলল, —কোন কথার জবাব দেবে না তুমি, দেখাবে যে নেশায় একেবারে চুর হয়ে আছ। ভাই স্বর্‌পদাস—আজ সন্ধ্যে থেকে, এই খাঁ সাহেব, তুমি আর আমি এখানে দাবা খেলছিলাম—কোথাও যাইনি।

মোমবাতি-বসানো লণ্ঠনটা টুলে বসিয়ে কাছে টেনে আনল স্বর্‌পদাস। খুদাবক্সের পাগড়িটা খুলে পাশে ফেলে দিল। গলার বোতামগুলো খুলে দিল, নাগরা টেনে রাখল পাশে, তারপর হাতে ধরিয়ে দিল সিন্ধির গেলাস।

বাইরে পাথরের রাস্তায় খটাস্ খটাস্ করে চার পাঁচ জোড়া নাল বসানো জুতোর শব্দ হলো। পর্‌যকণ্ঠে কে দরজা খুলতে বলল।

দাবায় দান ফেলে জড়ানো গলায় বিশ্রী গালি দিয়ে উঠল বাহ্‌রাম। খুদাবক্স তার জামা চেপে ধরল। জড়িতকণ্ঠে বলল,—এই গালি দে না মৎ। কেয়া তুম বড়ে রাহীস্ আদ্‌মী হো?

দড়াম্ ক'রে দরজাটা খুলে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন রিসালদার রঘুনাথ সিং। জিজ্ঞাসা করলেন,—কতক্ষণ হল এসেছে খাঁ সাহেবরা?

—সন্ধ্যে থেকে বড় গোল লাগিয়েছে কুঁয়ার সাহেব, দু'ঘণ্টার ওপর হল্লা করছে,—বলছি হুজুর আমার একটা ছাড়া ঘর নেই।

হাতের একটা ঝাপ্‌টো-মারা ভঙ্গীতে তাকে নাকচ ক'রে দিয়ে রঘুনাথ বললেন, —বাহ্‌রাম, খুদাবক্স এখানে ছিল? ইস্‌মে কোঈ ফন্দাবাজী ঔর ফিকর নেই হ্যায়!

—কিছু না হুজুর—ছুটি মিলেছিল তাই একটু ফূর্তি করতে বসেছি। বিশ্বাস না করুন ত'—

রঘুনাথ সিং বললেন,—আমি বিশ্বাস করব কিনা সেটা বড় কথা নয়—আজ যা হয়ে গেছে, তেমন কখনো হয়েছে কিনা জানি না। খুদাবক্সের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। একটা তীব্র অস্বস্তির অনুভূতি—অনেককাল পরেও মনে পড়ত খুদাবক্সের—যেন তার মনের তলা পর্যন্ত খুলে খুলে দেখছেন কুমারসাহেব।

তাঁরা চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে খুদাবক্স, স্বর্‌পদাস ও বাহ্‌রাম! নিজের আচরণের গুরুদায়িত্বটা বোঝে কিনা খুদাবক্স কে বলবে। তুফান একটা উঠিয়েছে সে। ঝাপ্‌টোটা মোতির ওপর দিয়ে কতখানি যাবে সে-ই হয় তার ভাবনা। তারপর স্বর্‌পদাসের হাতটা চেপে ধরল। বলল,—বাঁচিয়ে দিয়েছ ভাই।

ঈষৎ গম্ভীর সুরে বাহ্‌রাম বল্‌ল,—আজকের রাত কেটে যাক্, তারপর তুমি ধন্যবাদ জানিও। এখনো সময় হয়নি।

পরে যখনই খুদাবক্স সেই রাতের কথা স্মরণ করেছে, তার মনে পড়েছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, ফৌজের হল্লা, মশালের আলো দপ্‌দপ্ ক'রে নাচিয়ে চারজন সিপাহীর ক্রমাগত টহল। সেই রাতে, অসহায় ক্রীড়নকের মতো তার নিজস্ব অনুভূতি আর আবেগ শুধু চরকিবাজী খেয়েছিল। কেননা ঘটনা তাকে আর মোতিকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তার প্রমত্ত উক্তিতে ইজ্জতে ঘা লেগেছিল সামন্ততন্ত্রের। ক্ষেপে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সিংহের প্রতিভূ। মনে পড়েছে সেই রাতে বাহ্‌রাম ও স্বর্‌পদাসের মুখে লণ্ঠনের লাল আলোয় চরম বিশ্বস্ততার দৃঢ় মনোভাব ফুটে উঠেছে। আরো মনে পড়েছে, রাত যখন দু'টো বাজল, তখন ক্লান্ত চরণে রাজপ্রাসাদ থেকে সেই ঘরে এলেন ঘোস। তাঁকে দেখে মনে হল, অনেক সংগ্রামের ক্লান্তি তিনি বয়ে এনেছেন। তাকে ডাকলেন ঘোস, বললেন, তোমার জন্যে আমি রাজার সঙ্গে তর্ক করলাম খুদাবক্স, কথা আদায় করলাম যে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আমার ইজ্জতের কথা আর ভাবলাম না, কেন না, তোমার ভবিষ্যত ব্যবহারের ওপরে আমার ইজ্জতের ভার রইল। কিন্তু এ কি করলে তুমি, আমার একটা মানা-ও শুনলে না?

মনে পড়েছে খুদাবক্সের, মাথার মুরেঠা খুলে নিয়ে খোলা মাথায় ঘোস বসেছিলেন চরম ক্লান্তির ভঙ্গীতে। নিজেকে সেদিন ক্ষমা করতে পারেনি সে।

সেই রাতে যখন খুদাবক্স ঘুমিয়ে পড়ল, ঘোসের চোখে ঘুম এল না। মনে হ'ল রাজকে তিনি বলেছেন, আজ তুমি মস্ত রাজা হয়েছ, কিন্তু ভুলে যেও না একদিন আমি তোমার সঙ্গী হয়ে বড় ভাই হয়ে, তোমাকে দেখ্‌-ভালাই করেছি। আমি স্বীকার করছি, খুদাবক্সকে আমি স্নেহ করি। তাই বলছি, সে বালক, তাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার ইচ্ছে আমি জানালাম মাত্র। যা তোমার বিচার তাই করো তুমি—

রাজা মেনেছেন তাঁর অনুরোধ।

কিন্তু কি ক'রে তিনি খুদাবক্সের হয়ে কথা দিয়ে এলেন? সে কি তার কথা মানবে? জোয়ানীর ধর্ম'ই নয় কি বিশ্বাসঘাতকতা করা? তাঁর কথা ত' সে মানবে না।

আঘাত লেগেছে তাঁর-ও। তিনি-ও হৃদয়ঙ্গম করেছেন, এই পাঠানযুবককে তিনি কতখানি ভালবেসেছেন। বুঝে মনে হচ্ছে এই ভালবাসা তাঁকে নীতিচ্যুত করবে। আরো মনে হচ্ছে সেই নাচওয়ালীর কথা। তার প্রেম শুধু সর্বনাশ আনবে, তবু খুদাবক্স তাকে পরিহার করবে না, সেই সামান্য রমণীর নয়নের ইঙ্গিত মাত্রে তাঁর সমস্ত শুভেচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি পদদলিত করে চলে যাবে।

নাচওয়ালী মোতি। ভালবাসার ফাঁদ পরিয়ে সে বন্দী করতে পারে প্রেমিককে, তার প্রেম শুধু দুঃখ আনবে জেনেও সে মুঠো আলগা করতে হয় তো জানে না। জানে না যে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়। জানে না যে সেই হল প্রকৃত প্রেম।

জানে না যখন, তিনিই জানাবেন। প্রয়োজন হলে যেমন গুলী ক'রে মেরে ফেলা হয় আহত ঘোড়াকে, নির্মম অস্ত্রোপচার চলে সৈনিকের ক্ষত-বিক্ষত দেহে, তেমনই প্রয়োজন অনুভব করছেন ঘোস। একটা ঘা তাঁকে দিতে হবে। যোদ্ধার মতো সুকৌশলে, অথচ আঘাত হবে মর্মান্তিক। নইলে খুদাবক্সকে বাঁচানো যাবে না। তার বাপদাদার মতো সেও কিস্‌মতের হাতের পুতুলার মতো, খড়কুটো হয়ে নাকচ হয়ে যাবে। জীবনটার দিশা থাকবে না।

প্রৌঢ় যোদ্ধা ঘোস, রণনীতিতে সুনিপুণ তিনি। কিন্তু এক বাঁধন কাটবার জন্যে যে কৌশল করছেন, তার উৎসস্থলে কোন্ অনুভূতি কাজ করছে তা কি তিনি বুঝেছিলেন? বুঝেছিলেন কি, একজনের হাত থেকে নিয়ে আসতে চায় খুদাবক্সকে তাঁর যে সত্তা, সেও সমান লোভী, অধিকারলোলুপ এবং অন্ধ? নিজের অনুভূতির স্বরূপ অবচেতনে রইল, এই বোধ হয় ভাল। সেই ঘোসকে দেখবার দূরদৃষ্টি তাঁর সে রাতে ছিল না, থাকলে তিনি শিউরে উঠতেন।

অন্ধ প্রেম যদি মৃত্যুবাহী হয়, অন্ধ বাৎসল্যও সমান মর্মান্তিক।

দশ

অগ্নি, নৈঋত ও ঈশান কোণে মেঘ সঞ্চারিত হয়েছে বলে বোধ হয়েছিল মোতির। কিন্তু সেই মেঘে যে প্রলয় উঠবে সে ধারণা তার ছিল না। তার ধারণা ছিল না যে দুনিয়ার চোখে তার কোন দাম নেই। রাজার রূঢ় পরুষ ভাষণে অনেক সত্যই উদ্‌ভাসিত হয়েছে মোতির মনে। জেনেছে রাজ্যের পরিধি যাই হোক, সামন্ততন্ত্রের প্রাপ্য সম্মানের উচ্চমান গগনচুম্বী। বিদেশী অফিসারের সামনে অপমানিত হয়েছেন রাজা। তওয়ায়েফের এতখানি স্পর্ধা সহ্য করা সম্ভব নয়। অপরাধীর নাম রাজা জানেন, এবার তাদের ক্ষমা করা হল, কিন্তু ভবিষ্যতে বুঝে চলতে হবে।

ভবিষ্যৎটাই যে হারিয়ে গেল মোতির চোখে। রাতভোর ভেবেছে, সকাল হয়েছে কতক্ষণ, খাটে বসে ভাবছে আর ভাবছে মোতি, ভাবনার কালীদহে কূল পাচ্ছে না তার মন রশি ফেলে ফেলে। এও বুঝছে সে, রাজার নিষেধ মানবার চেয়ে মৃত্যু বরণীয়। কেন না খুদাবক্স ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

মমু সারেঙ্গীয়া, বার্ধক্যের রেখাবলীয়ত জরাজীর্ণ হাত মাথায় বুলিয়ে তাকে যথা-

সম্ভব সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে তার মায়ের কথা। বলেছে, মন্থনে গরল উঠবে জেনে-শুনেও গভীর প্রেমভরে প্রেমাস্পদের মুখ চেয়ে ভবিষ্যতের আঁধার দরিয়ায় ঝাঁপ দেবার যে চারিত্রিক আদল, তা নাকি এসেছে রোশানের কাছ থেকে।

সে কথা যাচাই করবার মন মোতির নেই। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বর্তমান, তাও একজনের মুখে। দুনিয়াতে তারও আর কেউ নেই, বিত্ত নেই, পিতা নেই, বন্ধু নেই, শুধু নিজের জোরে এই দুনিয়াতে মাথা তুলে চলবার ফিরবার মতো একখানা আকাশে নিজের মালিকানা কায়েম করবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

সেইখানেই চরম আশ্রয় মোতির। নর্তকী হয়ে নয়, বহুজনের ঈর্ষা ও কামনার লক্ষ্য হয়ে নয়, একজনের একান্ত হয়ে, তার সঙ্গে জীবন বেঁধে, তার পাশে থেকে, তবে তার সার্থকতা মিলবে।

ভেবে ভেবে মনে আগুন জ্বলে যাচ্ছে, আর তাতে পুড়ে পুড়ে মোতির রূপ আরো উজ্জ্বল হয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতির ছায়া দেখে কিরকম লাগল মোতির। আরেকজনের জীবনে সর্বনাশ এনেছে, এতখানি বিপদ মাথার ওপর টেনে নামিয়েছে, তবু রূপ ম্লান হয়নি। চুনী, পান্না, হীরে, মোতি, সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে নিষ্ঠুর দ্যুতিতে। কাল ফেরৎ পাঠাতেও ভুল হয়ে গেছে নাট্যশালার তোষাখানার মালিক মালহরির কাছে।

সহসা চমক ভাঙল। দাসী খবর দিল ঘোস এসেছেন। নীচে তিনি অপেক্ষা করছেন।

ঘোস! খুদাবক্সের কোন খবর এনেছেন তবে! ত্বরিতগতিতে নেমে এল মোতি। পর্দা সরিয়ে ঢুকল ঘরে। ঘোস তাকালেন তার দিকে। তাঁর চোখে অবিশ্বাস, অনুকম্পা আর কঠিন কর্তব্যের সংকল্প। চঞ্চল চরণ থেমে গেল। ভয়ে ভয়ে একপাশে বসল মোতি, ঘোসকে কুরশী দেখাল।

কর্তব্য নিয়ে এসেছিলেন ঘোস, তাই বিলম্ব না ক'রে বলে গেলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেল মোতি।

ঘোসের কথাগুলো অমোঘ হয়ে ঘা দিয়ে পড়তে লাগল তার চেতনার ওপর। ছেড়ে দিতে হবে। তার মা আছে ঘরে, সে গরীব ঘরের ছেলে, তার ভবিষ্যৎ আছে, এই তার জীবনের সুরু, যদি ছেড়ে না দাও তুমি, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, সর্বনাশ হবে, বন্যার মুখে ঘরের মতো, ভিত্তিটাও উপড়ে ভাসিয়ে নেবে দুর্দৈব। আহত আত্মসম্মানে উঠে দাঁড়াল মোতি। কথা তারও আছে। —আপনার মুখে আমি তার কথা শুনব না খাঁ সাহেব, সে আমাকে সব বলেছে।

—কি তোমাকে বলেছে সে? বলেছে কি, যে দশদিন জখম হয়ে পড়েছিল, তাকে মলমত্যাগিদ করে বাঁচিয়েছি আমি? তুমি তাকে দেখেছ নওজোয়ান, জীবনে একটা দাঁড়া এসে গেছে। তুমি বলছ মোতি—শিশুর মতো সেবা করে বাঁচিয়েছি ওকে, যখন রাতের পর রাত মৌত্ এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতো! কাজ দিয়েছি, ইজ্জৎ দিয়েছি, কাজ শিখিয়েছি, আজ তার বাপ নেই, ভাই নেই, ভালোমন্দের কথা আমি ভাবব না? বে-করার হয়ে যাব ইন্‌সাফের কাছে?

—সে আমাকে ভালোবাসে।

—তুমিও ত' তাকে ভালবাস?

জরুর, ব'লে রানীর মতো দর্পে ঘাড় ঈষৎ বাঁকাল মোতি,—তাই তার ভালোমন্দ, সব দেখব আমি। আমি তার জন্যে সব করব।

—তুমি কি করবে মোতি? কি করতে পারো? কতটুকু তোমার ক্ষমতা?

—ভালবাসতে পারি।

—এ ভালোবাসা দিয়ে তুমি কি করবে? এখান থেকে ওখানে ফিরবে কিছুদিন, তিসরাদিন ও-ই তোমাকে ধিক্কার দেবে। বলবে আমি পুরুষ। শুধু এখানে ওখানে বে-ইজ্জতী জীবন নিয়ে টক্কর খেয়ে ফিরলে আমার চলবে না। শুধু মুহব্বতে কি হবে মোতি, পুরুষ চায় সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা।

ব'সে পড়ল মোতি বিবশা হয়ে। ঘোস অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, তার মা কষ্ট ক'রে দিন চালাচ্ছে, ছেলে একদিন উপযুক্ত হবে তার জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট ধুয়েমুছে দেবে। আজ তুমি ভাবছ একরকম। তিনদিন পরে সে-ই তোমাকে দোষ দেবে। তুমি ত' মেয়ে মোতি, সেদিন কেমন ক'রে সইবে? তাই বলছি সব ভেবে দেখ, তুমি তাকে ছেড়ে দাও।

গত রজনীর দুঃসহ গ্লানির যন্ত্রণা এতক্ষণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু হয়ে ঝরতে লাগল। মোতি বলল,—আপনায় এত্তিয়ার আছে তার জীবনের ওপর, আপনি তাকে নিয়ে যান। আমি কে? কতটুকু আমার ক্ষমতা? আমি ত' তাকে ধরে রাখিনি।

বড় অন্যায় করছেন জেনেও বিচলিত হলেন না ঘোস। বললেন,—তোমার জয় পুরা হয়ে গেছে মোতি। আমার একটা কথাও সে মানবে না। তোমাকেই বলতে হবে।

—আমাকেই বলতে হবে? রুদ্ধ অশ্রুর বাঁধ ভেঙে বন্যা নামল। মোতি ফুলে ফুলে উঠল কান্নার আবেগে। বলল,—তওয়ায়েফ্, নাচি, গান গাই, যা খুশী আসে তা-ই বল, তোমরা বিচার কর, আমরা শুনি। কিন্তু আমি ত' মানুষ, আমি তাকে ভালবাসি, তাকে আমি মুখ ফুটে বলব, চলে যাও আমাকে ছেড়ে? এ তুমি কি বলছ খাঁ সাহেব। এ কি কখন হয়েছে? কোন নজীর আছে?

—ভালবাসলেই ছাড়তে হয় বেটি। তোমার প্রেম যদি সত্যি হয়, তবে তার ভালাই-এর জন্যে সদ্‌কা করো তোমার আশ্‌ক। বিলিয়ে দাও তামাম দুনিয়ার দরবারে। সবাই দেখুক আর মানুক, যে হাঁ মোতির প্রেম সাঁচ্চা ছিল বটে।

—না, না, না! ঈষৎ রক্তাভ শুভ্র আঙুলগুলির ফাঁক দিয়ে অমূল্য মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু উৎসারিত হয়। মাথা নাড়ে মোতি। কিছুতেই পারবে না সে!

—আজই তার কাজে মন নেই, হুঁস হারিয়ে কত কি করছে, বল তুমি, যাকে ভালবাস, তার ত' ভালই দেখতে চাইবে। না কি দেখতে দেখতে চাইবে দিন থেকে দিন তার খারাপ হচ্ছে, সে নেমে যাচ্ছে। প্রেম ত' শিকলি নয় যে কয়েদ করবে, বেঁধে রাখবে, নীচে টেনে রাখবে—, ছেড়ে দাও, উঠতে দাও, মানুষের মতো হয়ে দাঁড়াতে দাও।

—ওকে চোট্ দেবো কি ক'রে?

—কলিজার চোট মরদকে ঘায়েল করে না, মরদ ভেঙে যায় যদি ইজ্জৎ চোট্ খায়।

মোতি চোখ মুছে ঘোসের দিকে তাকাল। একটু নিরীহ ক'রে বলল,—খাঁ সাহেব, আপনারও কোন মতলব আছে না কি আমি জানি না। জানি না কি নদীর গহীরে আরো কোন চোরা নদী বইছে নাকি অন্য ঠিকানায়। আপনি আমাকে জানেন না খাঁ সাহেব। আমি যদি ভালো বুঝি, ত' ঠিক, আমার ধর্মমতো আমি কাজ করব, চাই তো কলিজা টুকরো হয়ে যাক! কিন্তু জানবেন, তখন যদি দেখি, আপনি আমার সঙ্গে দুইমুখে কথা বলেছেন,

অন্য কোন মতলব আপনার ছিল, তাহলে কিন্তু ক্ষমা করব না। আপনাকে আমি ছাড়ব না। জবাব আদায় করব। এ কথাও খেয়াল রাখবেন। আপনি এখন চলে যান।

একটু আত্মস্থ হয়ে অভিবাদন জানিয়ে ঘোস বেরিয়ে গেলেন। এসেছিলেন এক-ভাবে, যাবার সময়ে সম্ভ্রম বয়ে নিয়ে গেলেন।

উপরের ঘরে এসে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদল মোতি। কাঁদল এই জন্যে, যে ঘোসের কথায় কিছু সত্য ছিল। কাঁদল এই জন্য, যে খুদাবক্সের জন্য নিজে সমস্ত দাবী ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত। তবু কাঁদল, কারণ এই ত্যাগ করতে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে! মাত্র উনিশ বছর বয়স তার। এই পরিপূর্ণ যৌবনে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ-সাধ অনাস্বাদিত রেখেই তাকে মরতে হবে তাই ভেবে। খুদাবক্স বেঁচে থাকতে সে মরতে পারবে না। কিন্তু এ-ও ত' মরণেরই দোসর।

দুনিয়ার নাটে কখনো কখনো আশ্চর্য খেলা ঘটে। বহুজনের স্বপ্নপ্রেয়সী যে অপরূপা, ভাগ্যের বিধানে তারই স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে এ-ও এক আশ্চর্য খেলা। চিক্, কণ্ঠি, মৌলী, কর্ণিকা ও কঙ্কণ খুলে ফেলল মোতি। নিরাভরণ বক্ষ মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে কাঁদল সে। প্রাচীর থেকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রামকেলি, মল্লার, তোড়ি, কৌশিক ও মালকৌশ।

চিত্রকারের ধ্যানে ও সাধকের স্তবে রাগরাগিণীরা কখনো অশ্রুবর্ষণ করেন সত্য, কিন্তু সে সবই মর্তবাসীর চিত্তে আনন্দবিধায় নিমিত্ত। দেহী মানুষের পার্থিব কারণে ক্রন্দন তাঁদের বোধাতীত। দুঃখের কারণে দুঃখ একান্তভাবেই পার্থিব অনুভূতি। তার স্বাদ রাগরাগিণীগণীগণ জানেন না।

গভীর রজনী। শহর ছাড়িয়ে পশ্চিমদিকের প্রান্তরে এক নির্জন উদ্যান। মোতির নিজের এই বাগান। একদা সখ ক'রে আমগাছের সঙ্গে জুইয়ের লতার বিয়ে দিয়েছিল মোতি, বাজনা বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে, ধুমধাম ক'রে। ছলনা ক'রে জুইয়ের লতা, পাশের একটি বকুল গাছকে আশ্রয় করে জড়িয়ে উঠল ফুল ফোটাবার সময়ে। তার আচরণকে সকৌতুকে তিরস্কার ক'রে মোতি আমগাছের তলায় বেদী বাঁধিয়ে দিয়েছিল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমের মঞ্জরীর মৌশুমে, এখানে বসে জুহী, শোহ্‌নী ও হীরাকে নিয়ে কত আনন্দ করেছে, ঝুলনা টাঙিয়ে দোলা খেয়েছে, কখনো বনভোজন করেছে অগ্রহায়ণ মাসে। লোধী ছেলেমেয়েরা কাঠ কুড়িয়ে, পাতা কুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের কাছ থেকে শাকসব্‌জী কিনেছে, দুধ কিনেছে, দাম দেবার সময় হিসেব মানেনি।

অনেক সুখস্মৃতিজড়িত এই বাগানেই আজ দেখা করবে খুদাবক্স। বিকেলে খুদাবক্সকে খত পাঠিয়েছে সে-ই, জুহীকে দিয়ে সুকৌশলে। তারই নির্দেশে আসছে খুদাবক্স।

অনেক দিন আগে, যখন খুদাবক্সকে জানত না মোতি, তখন এই বাগানেই সখীদের অনুরোধে সে গান গেয়েছিল—'বাঁতে দুখকে দিন আওরে বসাওয়ানত'—পদটির বক্তব্য ছিল, দুখের দিন বিগত হয়েছে হে সখী, প্রিয়তম আসছেন, তাই বসন্ত উদিত হচ্ছে কাননে। সেদিন বোধ হয় অনাগত ভবিষ্যতের ডালির আনন্দসম্ভার কল্পনা ক'রেই সেই গান এসেছিল তার মনে। আজ এই আখেরী মিলনের দিনে, সেই গানের কথা স্মরণ হচ্ছে আর মনে

হচ্ছে বসন্তকে বিদায় দিতেই সে এসেছে। মাঝখানের দিনগুলোর কি প্রয়োজন ছিল? ন জানে, ন পহ্‌চানে, ন দিল্ লগাতা, ন প্যার হোতা—পরিচয় না হ'লে ত' চিত্ত বিবশা হ'ত না, ভালবাসত না সে।

শুকনো পাতায় দ্রুত অধীর পদক্ষেপ শোনা গেল। এগিয়ে এল খুদাবক্স—সেই পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে শোনা গেল—মোতি!

যদি কোথাও থাকো দীনদুনিয়ার দরদী মালিক, তবে এই সময় পাশে থেকো, আমাকে সাহস দাও, মনে মনে প্রার্থনা করল মোতি।

—মোতি! একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স।

তার ব্যগ্র বাহু থেকে সজল চোখে একটু হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মোতি। বলল,—বোস, কথা আছে।

—বসব, আগে তোমাকে ভালো ক'রে দেখি। ওঃ, কি দিনটাই গেছে মোতি, তোমার খুবে কষ্ট হয়েছে, না? তোমাকে কি বলেছেন কিছু?

—তোমার কষ্ট হয়নি?

হাত নেড়ে খুদাবক্স তার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিল। বলল,—কষ্ট আবার কি, আর, এখানে ত আমি থাকব না—চলে যাচ্ছি—

—চলে যাচ্ছ?

—তুমিও যাচ্ছ, আমি একা যাচ্ছি না কি? আমরা পালাচ্ছি অনেক দূরে। আগে যাব আমার মা-র কাছে।

সম্মোহিত হয়ে চেয়ে থাকে মোতি। বলে,—তারপর?

—তারপর কি করব, তা ভাবব কেন? যা হয় করব। কেন ভরসা হচ্ছে না? পাঞ্জাখানা দেখ, হাতখানা দেখ—আরে দরকার হ'লে সব কিছু করব—

নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে নিজেই মনের খুশীতে হাসে খুদাবক্স। অসীম আত্মবিশ্বাস তার। হাতে জোর আছে, দুনিয়া পড়ে আছে, যা হয় একটা কিছু করবে সে। পরওয়া ক'রে কি হবে?—কাল কোন্ দেখা হ্যায়? কালকের চেহারা ভাবছ কেন মোতি? আজকের কথা ভাবো—এই মুহূর্তের কথা ভাবো—এইটেই সত্যি।

বিশুদ্ধ প্রেমের সঙ্কল্প জ্বলজ্বল্ করে খুদাবক্সের মুখে। সেই মুখের দিকে চেয়ে মোতির ভয় হয় বুঝি বা সব সংকল্প তার ভেসে যাবে। সময় আর নেই। তাই সে বলে,—তুমি ভুল করছ খুদাবক্স। আমি তো তোমার সঙ্গে যাব না।

—কি বললে?

—আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

—তবে কি করবে? পরে আসবে কার সঙ্গে, কেমন করেই বা আসবে।

মাথা নাড়ে মোতি। খুদাবক্স ব'সে তার হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে, মোতি হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে,—ভুল বুঝ না খুদাবক্স, না আজ, না কোনদিন, তোমার সঙ্গে আমি যাব না।

চরম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে খুদাবক্স। মোতি বলে,—সেই কথা বলতেই তোমাকে খত্ পাঠিয়েছিলাম আমি।

সবিস্ময়ে শোনে খুদাবক্স।

—যা হয়ে গেছে, তার কথা ছেড়ে দাও খুদাবক্স। ও ত' তীরের মতো ছুটে গেছে,

এখন ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

—কি বলছ মোতি?

—বলছি গত ছ' মাসের কথা ভুলে যাও। ভুলে যাও যে আমাকে চিনতে তুমি, জানতে। কেন না, ভুল করেছি আমি, সেই ভুল আর টানব না। আমার সঙ্গে তোমার—

আর কোন সম্বন্ধ নেই এই কথাটা বলতেও যেমন পারে না মোতি, শুনবারও ধৈর্য্য থাকে না খুদাবক্সের। রক্ত ক্ষেপতে থাকে তার। চরম বেইমানী উত্তির উত্তরে সে গম্ভীর রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—জবান্ সামলে কথা বলো মোতি। এ নাট নয়, আমিও নাটের কদরবান্ আমীর নই।

—কিন্তু আমি ত' সেই নাটেরই তওয়ায়েফ্! আমিও আমাকে ভুলতে পারি না। তোমার সঙ্গে আর দেখাশুনা হবার কোন মানে হয় না—আমার কথা তুমি ভুলে যাও।

—ভুলে যাব! তবে এই দিনের পর দিন কথা, গান, হাসি, এত রকমের জবানবন্দী সব মিথ্যে? তুমি মিথ্যা? তুমি বেইমান?

অমৃতে গরল মিশিয়ে দিয়ে তার জ্বালা আর ফেনা মোতিকে জ্বালিয়ে দেয়—নিজের সর্বনাশ ঘটাবার সঙ্কল্প হয় দৃঢ়তর। মোতি রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—আমি বেইমান নই—আমি নাচ্‌নেওয়ালী। এ রকম কারবার হাল্‌ফিল্ করি আমি—আমার ইমান্ সেটাই। তোমার সঙ্গে আমি কোথায় যাব? সেই কুঁড়ে ঘরে? গরীবখানায়? সেখানে আমার কোন্ সুখ? কিসের আশা? চারজন দাসী আমার মদৎ করে, আর আমি যাব তোমার ভাঙা ঘরে ব'সে রুটি বানাতে?

—খবরদার! আমার ঘরের কথা তোমার মুখে এনো না! খুদাবক্স ঠেলে সরিয়ে দেয় তাকে।—মিথ্যা কথা বলেছ, বেইমানী করেছ, আমার সমস্ত দুনিয়াকে জ্বালিয়ে দিয়েছ, এই পর্যন্ত, আর এগিও না!

—এই কথা থাকল তবে! আমি চলে যাই?

—আমি চলে যাচ্ছি, ব'লে খুদাবক্স এগিয়ে এল কাছে। অন্তর্দাহনের জ্বালা গলায় নিয়ে বলল—নাচনেওয়ালী! তওয়ায়েফ্! যাদুগরনী! আমার ভুল হয়েছিল। সোনার শিকলীতে বাঁধা থাক বুলবুল, গোলামী করতে থাকো। এর বদ্‌লা আমি এখনই নিতাম, কিন্তু তোমাকে ত' আমি ছোঁব না।

—খুদাবক্স—

যন্ত্রণার ঝড় উঠেছে আর তারই মুখে ছিটকে পড়ছে কথাগুলো : কেন তবে আগে বললে না মোতি, কেন জানতে দিলে না যে আমি চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম? তোমাকে ত' আমি কোন কথা লুকোইনি। চাষী কিষাণের ছেলে, তামাম দুনিয়ায় কেউ নেই, একটু ভালবাসার ভিখারী ছিলাম সব কথাই ত' বলেছিলাম—তবে কেন এমনি করে আঘাত দিলে?

—আমি চলে যাব—

—তুমি যাও না যাও, আমার চোখ থেকে তুমি হারিয়ে গেছ। এখন আমি কি করব। উপড়ে ত' ফেলে দিতে পারব না, নয় ফেলে দিতাম—

—খুদাবক্স! মোতির অনুনয়-জড়ানো হাত ঠেলে দিল খুদাবক্স। বলল,—ভুল করেছি। মাপ করো।

চলে যেতে যেতে ফিরে এসে আবার বলল—যাব যখন ঠিক করেছি তখন যাবই, একই

সূর্যের তলায় এক জায়গায় তোমার সঙ্গে থাকব না...তাতে তোমার কি ক্ষতি আছে, অন্য কোন সমঝদার জুটে যাবে—আমার মত গাঁওয়ার নয়, গরীব নয়—সেই তোমার ভালো... বাস্ কি বল নাচওয়ালী!

—অনেক বলেছ খুদাবক্স আর বোল না—

—ও, সময় বুঝে গলায় হামদরদীর সুরও আসে! দেরী হয়ে গেছে মোতি, আর নিজেকে ভুলে যাব না— চলে যাব আর তামাম দুনিয়াকে শুনিয়ে যাব—মোতি বেইমান! মোতি মিথ্যাবাদী—জবান্ ইজ্জত আর দিল্ তিনটেই তার জ্বলে থাক্ ছাই হয়ে গেছে!

বনপথে চলে যেতে যেতে শেষ কথা বলে গেল খুদাবক্স—হারামী করেছ তুমি! নটি!... অপেক্ষমান ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে। চাবুক কসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘোড়া।

সান্ত্বনা এই, যে মোতি সেই দৃশ্য দেখল না। তার আগেই তার চেতনা হারিয়ে গেল।

দুই পাশ আঁধার, আঁধার আরো আসুক, আর ঢেকে দিক খুদাবক্সকে, তাতে বোধ হয় সান্ত্বনা আছে।

নিজের ঘরে না ফিরে, অপেক্ষমান বাহ্‌রামের হাতে খত্ পাঠিয়ে দিয়েছিল খুদাবক্স ঘোসের কাছে। বাহ্‌রাম তার কোন মানা শোনেনি। টাকা আর আস্‌রফি-ভরা একটা থলি তুলে দিয়েছিল তার হাতে। বলেছিল, তোমার প্রাপ্য টাকা থেকে আমি মিটিয়ে নেব।

বিদায়বেলায় এই চরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর হাত চেপে ধরে খুদাবক্স কোন কথা বলতে পারেনি। বলেছিল, মনে রেখ। বাহ্‌রাম অনুনয় করে বলেছিল,—একবার ঘরে চল, ওস্তাদের সঙ্গে দেখা কর। খুদাবক্স মানতে পারেনি। তার দিল ছুটে গেছে এই জায়গা থেকে, এখানে তার ঘর নয়।—ভেব, কোন মুসাফির এসেছিল কিছু হামদরদী প্রাণের সন্ধানে। দুদিন বাদে সে-ই চলে যাচ্ছে। তাতে কারো কোন দুঃখ নেই। একটা চোখ অন্ধ, তবু এক চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিতেই অনেক দূর দেখেছিল বাহ্‌রাম। সান্ত্বনার কথা বলে বন্ধুকে অপমান করেনি। মাঝরাতে ফটক খুলিয়ে দিয়েছিল ঘুষ দিয়ে। খুদাবক্স বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। নির্জন রাস্তায় একা ফিরতে ফিরতে এমন আজব মনে হয়েছিল দুনিয়াদারীটা, কোথাও কোন মিল খুঁজে পায়নি বাহ্‌রাম।

রাশি রাশি আঁধার কেটে উড়ে চলেছিল খুদাবক্স। শহর ফেলে, সীমানা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের সীমান্তে বেতোয়ার ধারে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়াকে জল খাইয়ে নিয়েছিল, আবার চলেছিল পশ্চিমের পথ ধ'রে।

বন্ধ্যা প্রকৃতি, কঠিন পথ। ঘোড়ার খুরে খুরে বিজুলীর টুকরো খেলছে, নিশাচর শ্বাপদ সভয়ে পথ ছেড়ে দিল। দূরে দূরে গ্রামে, যে যার ঘরে সুযুপ্ত সুখনিদ্রায়। সকলের জন্যেই ঘর আছে শান্তি আছে, ঠিকানা আছে। শুধু তারই কোন দিশা নেই। অন্তরে বহ্নিশিখায় জ্বলে জ্বলে ভাস্বর হয়ে উঠল নিখাদ প্রেম, মনে হল সমস্ত নৈশ-প্রকৃতি তাকে অনুনয় ক'রে বলছে যেয়ো না, যেয়ো না। সমস্ত প্রান্তরের বুক থেকে হা হা ক'রে উঠল তারই অন্তরের হাহাকার।

খত্‌খানা নিয়ে পাথর হয়ে বসে রইলেন ঘোস—'ওস্তাদ্, চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে আখ্‌রী মুলাকাত হ'ল না, এই গলতি মাপ করবেন, কেন না আপনি মহানুভব।

এই বুঝে নেবেন, যে দেখা করা সম্ভব ছিল না। আঁধারে আঁধারে চলে যাচ্ছি, কারণ সকালের আলোতে এই মুখ দেখাতে পারব না। আপনাকে অনেক মুস্কিলে ফেলেছি, তার থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। আফ্‌তাব হয়ে আসমানে শোভা পাবার ভাগ্য আমার হ'ল না যদিও আপনার মত মুরশিদ মিলেছিল, আমি খুশনসীব নই। মুঝে এ্যায়সে ইয়াদ রাখিয়ে জৈসে হম্ হ্যায়' য়ো বদ্‌বখ্‌ত তারে' কা টুক্‌ড়া জিস্‌কো আস্‌মান ভি কয়েদ্ রাখ্ সেক্‌তা নহী"—এই শ্যের একদিন আপনিই শুনিয়েছিলেন, আজ তাতেই মনের কথা জানিয়ে গেলাম। আপনি হয়ত' দুঃখিত হবেন, কিন্তু নসীব যাকে ঘর লিখে দেয়নি, তাকে আপনি বাঁধবেন কি দিয়ে? পথই আমার ভাল।

খুদা আপনার ভালো করবেন। বাহ্‌রামকে আমার টাকাগুলো দিয়ে দেবেন, যাবার সময়ে সে আমাকে অনেক সাহায্য করল। এই রকম সাঁচ্চা দোস্ত কমই মেলে, আমি নিশ্চয়ই যোগ্য ছিলাম না। তবু কৃতজ্ঞ থাকলাম।

আমার জিনিষ বলতে কিছু নেই। চান ত' কোন কাঙালীকে খয়রাত্ ক'রে দেবেন—। আমার ঘোড়া তুফানী বড় আদরে পালন করেছিলাম, ওকে আপনিই রাখবেন। আপনার বাহাদুরকে নিয়ে আমি যাচ্ছি, পথ থেকেই পাঠিয়ে দেব লোকের সঙ্গে—চিন্তা করবেন না।

—খুদাবক্স।

বাহ্‌রাম আর ঘোস দুজনই চুপ ক'রে রইলেন। ঘোস চিঠিখানা নিয়ে পকেটে রাখলেন। তাঁকে আর একজায়গায় পৌঁছতে হবে এই খত্। পরাজিত হয়েছেন নিশ্চয়, কিন্তু লাঞ্ছনা পুরো হয়নি। আর একজনের কাছে হার স্বীকার না করলে হবে না।

যোদ্ধা যদি আসল হয়, তো হার স্বীকার করবার সাহস থাকা চাই। এই সময় ঘোসের বড় সাহসের প্রয়োজন হল।

নতুন হাবিলদার খুদাবক্স খাঁ অজ্ঞাত কোন কারণে কাল রাতে শহর ছেড়ে চলে গেছেন, এই খবর বাতাসের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। মোতির ঘরেও সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল।

ঘোসের আগমন প্রতীক্ষাতেই অপেক্ষা করছিল মোতি। নিশাজাগরণ ও রোদনে চোখ মুখ লাল, চুল বিস্রস্ত, বসন ধূলিধূসরিত, পড়ে গিয়ে চোট লেগেছিল, কপালে একটু কাটা দাগ। দরজার দুই পাশে হাত রেখে মোতি দাঁড়িয়েছিল। মনের আগুনে চোখ তার জ্বলছিল। সেই চোখের দিকে তাকাতে পারলেন না ঘোস। চোখ নামিয়ে নিলেন। তখন মোতি বলল, খুদাবক্স কোথায়—

নীরবে খত্ তুলে দিলেন তার হাতে ঘোস। তর্জনী নির্দেশে ঘোসকে দেখিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল মোতি। কান্নার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও করুণ সেই হাসি। এক মুহূর্তেই চোখে নামলো জল। তীব্র কণ্ঠে সে বলল,—আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিলে, ধরে রাখবে বলে, ধরে রাখতে পারলে? নিজেও রাখতে পারলে না আমাকেও দিলে না এ তুমি কি করলে?

পর্দায় পর্দায় উঠতে লাগল তার কণ্ঠ,—আমি তার জন্যে সব ছাড়তাম, ঘর বাঁধতাম, তাকে বাঁধতাম, সে আমাকে নিতে চাইল, তোমার কথা মেনে আমি গেলাম না। সে বলল আমি নটি, তুমি বললে আমি নটি, আমার মন দেখলে না, প্রাণ দেখলে না, সব পরিচয় ভেসে গেল, আমি হলাম নটি—আর তোমরা হ'লে খাঁটি মানুষ! তাই যদি হয়, তবে কেন সে চলে গেল। নিজের জিদ আর নিজের অন্ধ মনকে ভেট দিলে ওস্তাদ্, দুজনের জান্ নষ্ট ক'রে দিলে? তাকে তাড়িয়ে দিলে?

বেরিয়ে গেলেন ঘোস। নিজের কাছ থেকেই নিজে তিনি পালাতে চাইলেন। শোকাতুর তীব্র কণ্ঠ ভেঙে পড়তে লাগল তাঁর কানে—আমি নটি! আমি ভালবাসতে জানি না! আমি বেইমান!

এগারো

শ্রান্ত দেহ, ক্ষতবিক্ষত পা, পথ চলতে লাগল খুদাবক্স। দিনের পর দিন সে পথ চলে। শরতের প্রসন্ন রজনী। কখনো রাতেও পথ চলে। গ্রামে গ্রামে বিশ্রাম করে। কখনো আহার মেলে, কখনো মেলে না। পথচারী বা গ্রামবাসীর চোখে সহানুভূতি তার কাছে অসহ্য বোধ হয়। কোন কোমল হৃদয় রমণী কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে তাকে জল ঢেলে দেয় হাতে। আঁজলা ভ'রে জল খায় খুদাবক্স। প্রতিদানে ধন্যবাদের কথা কইতেও ভুল হয়ে যায়। কখনো বিশ্রাম করে গাছের ছায়ায়। জল আহরণ নিরত তরুণীর দল এই সুপুরুষ পাঠানকে দেখে চোখে চোখে ইসারা করে, সে ইঙ্গিত জ্বলে যায়, তার মাধুরী মিছে হয়ে যায় খুদাবক্সের অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে। চরণ কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মন কিন্তু থামতে চায় না। কোন সর্বনাশা বন্যার পথ মুক্ত করেছে মোতি, তার স্রোত তাকে তাগিদ দিচ্ছে নিরন্তর, ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

বৃদ্ধা পৃথিবী সুনিপুণা কিষাণীর মতো তার কাজ ক'রে চলে। নদীতে জল ভরে দেয়, ক্ষেতে ক্ষেতে আশ্বাসের রঙ লাগিয়ে দেয় গমের শীষে, পাখীগুলোকে লাগিয়ে দেয় ঘর বাঁধবার কাজে, অভিজ্ঞ চোখে সন্ধান ক'রে ঠিক করে জল বাতাস আর রোদ কোথায় কতটা দরকার। এই শরতে ফসল তোলবার সময়, তাই প্রয়োজন হয় তার দিবারাত্রি প্রহরার।

দূরে পাকা ফসলের তরঙ্গে মাথা তুলে ঘোড়ার পিঠে খবরদারী করে কিষাণ, মেয়েরা আল ধরে মাথায় খাবার নিয়ে পৌঁছতে চলে। এই দৃশ্যের সঙ্গে সে আশৈশব পরিচিত। দেখে দেখে তার মনে ঘরের জন্য তৃষ্ণা জাগে। অন্ধ একটা অনুভূতি, দুর্নিবার সেই আকর্ষণ। তার নদী, তার ক্ষেত, তার মাটি তাকে ডাক দিচ্ছে। তবে যে তাগিদ তাকে দিবারাত্র ক্ষেপিয়ে নিয়ে চলেছিল, সেটা তার মায়ের ডাক? দেশ, ঘর, গ্রাম, সেই কুয়োর জল টানবার চাকির ক্যাঁ কোঁ শব্দে করুণ দুপুর, কানা কুকুরটার কান্নায় ঘুম ভাঙা শরতের রাত, গমের গন্ধে মশ্‌গুল হেমন্ত বিকেল, এই সমস্ত পরিচিত স্মৃতিগুলো রূপ নেয় তার মা'র মধ্যে। এই হাজারখানা চেনা ছবির চিঠি রোজ স্বপ্নে পাঠাচ্ছে তাকে মা। মা ত' লিখতে জানে না। অজান্তে কখন চোখে জল নেমেছে খুদাবক্স খেয়াল করতে পারেনি।

সামনেই কুয়োতলা। আঁজলা পেতে ধরে খুদাবক্স আর জল দেয় একটি বালিকা। কালো রঙ, নাকে গহনা, সরল চাহনি। সন্ধ্যা নামে। দূর থেকে কার কণ্ঠে ডাক আসে—মোতি! মোতি-রে!

—আঈ আম্মা!

সাড়া দেয় মেয়েটি। খুদাবক্স কুয়োর গায়ে একটু হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। গভীর মমতায় বলে, তোমার নাম? —হাঁ জী, ব'লে হাসে মেয়েটি। মনে তরঙ্গ খেলিয়ে অনুভূতি উঠে আসে। রুদ্ধ কণ্ঠে খুদাবক্স গুঞ্জরণ করে—মোতি, মোতি, মোতিয়া।

চলতে সুরু করে মেয়েটি। সে রাতের মতো পথের ধারেই রয়ে যায় খুদাবক্স।

হাজারখানা তারার দীপালি জ্বালিয়ে বসে আছে আকাশ। একখানা চওড়া পাথরে

হেলান দিয়ে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে খুদাবক্স এক আকাশ তারার একটাও দেখতে পায় না। মনে হয়, সবগুলো তার মোতির হাতে জ্বালা। এতগুলো বাতি জ্বালিয়ে মোতি তাকে ডাকছে।

পিপাসিত বুকের ভেতর থেকে মোতির জন্যে তৃষ্ণা জাগে। দুরারোধ্য সেই প্রেম। বীজ যেন অঙ্কুর হতে চাইছে, মাটির বুক থেকে তাই সে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। মোতি যে তাকে ঘরছাড়া করেছে, মোতি যে তাকে ঘা দিয়েছে, সে কথা ভুলে যায় খুদাবক্স। এই তারাভরা নিশিথিনীর অঞ্চলতলে নিদ্রামগ্ন পৃথিবী জুড়ে মোতির কোমল ভালবাসা ছড়িয়ে আছে। এমন ক'রে ছড়িয়ে গেল কি ক'রে মোতি?

শীতল, বোবা পাথরে মাথা গুঁজে খুদাবক্স একটি নামই গুঞ্জরণ করে, কত গান, কত শ্যার শুনেছে আর শিখেছে সে—একটাও তার মনে আসে না। শুধু বুক থেকে হাহাকার ওঠে, একখানা সমুদ্রের মতো লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে তার প্রেম মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই নাম—মোতি, মোতি, মোতি।

কোন বিপদের অনুভূতিতে মাথা তোলে খুদাবক্স। কোমরের তরোয়ালে হাত দেয়। অনতিদূরে তার দিকে অসীম বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে চিতাবাঘ। তারার আলোয় তার বিচিত্রিত দেহ চোখে পড়ে, সবুজ জ্বলজ্বলে চোখে শুধু বিস্ময়।

ভয় হয় না খুদাবক্সের। শুধু মনে হয়, ও লাফ দেবার আগেই যেন সে সরে যেতে পারে। চিতাবাঘটা কিন্তু আক্রমণ করবার কোন নজীরই দেখায় না। কিছুক্ষণ কৌতূহলের সঙ্গে তাকে নিরীক্ষণ করে, এক লাফে রাস্তা পেরিয়ে নালার ধারে বসে। চক্‌চক্‌ ক'রে পরম তৃপ্তিতে জল খায়। তারপর অবহেলে, সহজে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মিলিয়ে যায় বনের মধ্যে।

আত্মরক্ষার জন্যে যে অস্ত্র ধরতে হল না, তাতে বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করে খুদাবক্স।

পথের হিসেব পথিক মনে রাখে না, পথ যদি লিখে রাখে ত' সে আল্যাদা কথা। পথে চলতে চলতে কোন কিষাণ বালকের গানের ছন্দে নিজের মনের কথা খুঁজে পায় সে। গানটা যেন তারই মনকে জবাব দিচ্ছে—

'প্যার প্যার কেয়া করতা রে তেরা প্যার না জানে কোঈ
তেরে দিলকে লাগি কোঈ কেয়া মাপে—
ঘায়েল কী দুখ ঘায়েল জানে ঔর জানে কোঈ।'

খুব ঠিক কথা। কদরবান মানুষের কথা। কোন ঘায়েল মনের কথা। তবে হে গীতকার, ঘা তুমিও খেয়েছ, তোমাকেও কেউ সহসা সব দাম কেড়ে নিয়ে একেবারে মূল্যহীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছে বাজারে। তোমার গানে সেই কথা লেখা আছে।

বিশদিন পথ চলে চলে সন্ধ্যে নাগাদ চৈন নদীর তীরে এসে পৌঁছয় খুদাবক্স। বাঁকে ক'রে ছেলে বসিয়ে অন্যদিকে জামাকাপড়ের পোঁটলা রেখে চলেছে মেয়ে ও পুরুষ। উটের পিঠে পার হচ্ছে যাত্রী। রাজস্থানের ভবঘুরে লোহার ও লাম্বাডিরা মস্ত ধুনী জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছে। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে, বয়স্ক ছেলে বুড়ী মা-কে পিঠে ক'রে নদী থেকে হাত মুখ ধুইয়ে বয়ে আনছে, এইসব ঘরোয়া ছবি দেখে চোখ দুটো জুড়িয়ে যায় খুদাবক্সের। মানুষের সঙ্গ প্রার্থনায় কতদিন যে চোখ তার পিয়াসী হয়ে ছিল! প্রশ্ন করে জানতে পারল, কালকে সাম্বৎসরিক মেলা। বান্দার নবাব-সাহেব অনেক পয়সা খরচ করে মেলার বন্দোবস্ত কায়েম করেছেন।

লাম্বাডি পরিবারের সঙ্গে বসে আরাম করবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে খুদাবক্স। ওপারে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে।

মেলার জন্যে তাঁবু পড়েছে কম করেও হাজার দুয়েক। পিতল তামার বাসন, রাজস্থানের ছাপা কাপড়, কম্বল, ইস্পাতের ছোরা-ছুরি থেকে সুরু ক'রে ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গরু, পাল্কী, গরুর গাড়ীর চাকা, ঘোড়ার ডাকগাড়ী সবই কেনা-বেচা চলবে। তাছাড়া গান, রামলীলা, যাদুখেলা, ভানুমতী, সাপখেলা, ভালুকনাচ সব থাকবে। কোন কোন তাঁবুতে বিলাসিনীদের নূপুর নিক্কণ অবধি বাজছে। কোন বরনারীকে নিয়ে সঙ্গী পুরুষ কাঁধে বুলবুলি পাখী বসিয়ে দোকানে ঘুরছে। নবাবের লোকরা দব্‌ড়ী বাজিয়ে বলে বেড়াচ্ছে—ছেলেমেয়ে চুরি হ'তে পারে, চুরি ডাকাতি খুন হ'তে পারে, যে যার সে তার মতো সাবধান থাকবে। এরই মধ্যে কোথাও সাধু ধুনীর সামনে বসে জ্ঞান ও ওষুধ বিতরণ করছেন মহিমামুগ্ধ ভক্তজনকে। ভস্মের টিপ ধারণ ক'রে পুত্রহীনা পুত্র পাবে, শত্রু নিপাত হবে, আধিব্যাধি দূরে যাবে এই ত্রিবিধ প্রধান গুণে। গুণ কিন্তু নিরাসক্ত নয়, এইসব প্রধান গুণের সঙ্গে আরো অনেক গুণ আছে, যথা অর্থলাভ, ভূমিলাভ, বিপদআপদ দূরীভূত হওয়া, ইত্যাদি। কোথাও কোন বিগতযৌবন চপলা রমণী হেসে হেসে নানারকম ওষুধ বিষুধের ব্যবস্থা দিচ্ছে। প্রেমের ক্ষেত্রে এরা সিদ্ধ যাদুকর। এদের দেওয়া শিকড় ধারণ করলে পরে বাঞ্ছিত রমণী বা পুরুষ নিমেষেই করতলায়ত্ত হবে। সপত্নী মরে যাবে।

বহুক্ষেত্রেই আগুন জ্বালিয়ে যাত্রীরা রান্নাবান্না করছে। বাঁশবাজির বাঁশ পুতেছে খেলা দেখাবার আসল লোক, ছেলে দু'টো। ঐ বাঁশে তাদের উঠতে হবে, এই ভেবে তাদের চোখে প্রাণের আশঙ্কা ফুটেছে। কোথাও শাশুড়ী তিরস্কার করছে বৌ-কে, যে সে কেন নিলাজ হয়ে বাপের গাঁয়ের মানুষ দেখে ছুটে গিয়ে কথা কইল? বাপের বাড়ী বলতে কি অতই টান?

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে খুদাবক্স চলল। উদ্দেশ্যহীনভাবে যেতে ভালোই লাগছে তার। অনেক দিন পর চোখ আরাম পাচ্ছে, মনও হালকা লাগছে। যেতে যেতে কানে এল পুরোনোদিনের খবর বয়ে একটা পরিচিত স্বর—আরে ভাই, সেই-দিনের শোভা-খানা ভাব দেখি? আ-হা-হা-নবাব বসেছে, ঘিরে বসেছে নবাবের লোক, এদিকে আমাদের রাজার ত' চোখ অন্ধ, ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে—তীর-ধনুক হাতে। ভাই কেয়া নিশানা দিয়া ভাই?—চব্বিশ বাঁশ চল্লিশ গজ, আঙ্গুল আট প্রমাণ,...মারো মারো মোটা তাওয়া, মাৎ চুকো রে চৌহান! রাজা মেরে দিল তীর—কিন্তু নিশানাতে নয়, নবাবের বুকে—কলিজা ছিঁড়ে মরে গেল নবাব...ভাই, ও রাজা ছিল চৌহান। চৌহান দেখবে ত' সেই গল্প মনে রাখবে। চৌহান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর ভুল থাকে না। বিস্মৃতির জাল ছিঁড়ে ফেলে তাঁর সন্ধান ক'রে আনে পরিচয়টি। মহা আনন্দে খুদাবক্স এগিয়ে যায়—পরন্তপ, পরন্তপ জী!

—কে ডাকে রে? ব'লে সাড়া দিয়ে, জোড়া গোঁফ, আকর্ণবিস্তৃত লাল চোখওয়ালা শ্যামবর্ণ একটি লোক বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই—খাঁ সাহেব! ব'লে অভ্যর্থনা করে খুদাবক্সকে। জড়িয়ে ধরে, আদর করে, পিঠ চাপড়ায় আর বলে,—শেরে শেরে মুলাকাৎ হয়ে গেল ভাই, তোমরা সব ফূর্তি কর!

তার শ্রোতৃমণ্ডলী একান্তভাবেই নিরীহ গ্রামবাসী সব। সহসা ফূর্তি করবার যুক্তি তারা খুঁজে পায় না।

পরন্তপ তাকে টেনে নিয়ে যায়, তাঁবুতে নিয়ে একবার খাটিয়ার ওপর ফেলে দেয়। তারপর দাঁড় করিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখে। বলে গরম পানি দিয়ে বাদশাহী গোসল, গরম দুধ, আর আরাম—আরে জওহর!

মুখ ঢোকায় একজন ছোকরা। পরন্তপ বলে,—শেঠজীকে বলবে তাঁকে ছুটি দিয়ে দিলাম।

শেঠজীর-ই তাঁবু, অথচ ছুটি দিচ্ছে তাঁকেই পরন্তপ, এই উল্টো যুক্তি বুঝতে পারে না জওহর, চেয়ে থাকে। পরন্তপ বলে, আরে, তোমার মত ভাতিজা থাকতে শেঠজীর তাঁবুর অভাব? যাও যাও, দেখে-শুনে জোগাড় করো আর একটা!

খুদাবক্সকে বলে, তাজ্জব হবার কি আছে? শেঠজী একটা খুন করেছেন, আমি তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছি হৈ-হাঙ্গামার হাত থেকে, তারপর টিকমগড় ফিরবার পথে এক সঙ্গে মেলা দেখছি—খুব সোজা কথা। এরকম ত হালফিলই হচ্ছে।

পরন্তপের কথা কইবার ভঙ্গীতে মনে হয়, এর চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? সত্য বটে সাত বছর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল খুদাবক্সের, কিন্তু এই রকম মেলা হলেই যে শেরে শেরে মুলাকাৎ হবে, তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কি আছে? আর শেঠজীর ঘোড়া বে-কায়দায় নবাবসাহেবের বুড়ো ডাকবরদারকে মেরে ফেলবে এ-ও যদি ঘটতে পারে, ত' সেই শেঠকে দশটা হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে পরন্তপ, সে কি তাঁর তাঁবুটাও এক রাতের মতো ব্যবহার করতে পারবে না?

—ওসব কথা ছাড়। এখন বল দেখি ভাই তারপরে কি কি হল। ক্রমে সব শুনব, এখন একটু আরাম কর।

জওহর ঢোকে এক চ্যাঙারী খাবার নিয়ে। জল আসে, কুর্শী আসে।

রাত বারোটা বাজে। মেলার অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু জেগে থাকে নিশা-বিলাসিনীরা আর তাদের হিমায়েৎদার মানুষেরা। ওদিকে কোন কোন নতুন দোকানী দেরীতে এসে পৌঁচেছে, তাঁবু খাটায় তার কুলীরা, একটু কথাবার্তা কানে আসে।

তাঁবুর সামনে ধুনী জেবলে, তার সামনে কম্বল বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে খুদাবক্স ও পরন্তপ কথা বলে। সব শুনে পরন্তপ বলে,—সব বুঝলাম, কিন্তু তুমি হঠাৎ ক'রে ঘোসের কাজ ছাড়লে কেন?

খুদাবক্স জবাব দেয় না। বলে,—এখন তাই ঘরে চলেছি।

পরন্তপ বলে,—অর্জুনের সঙ্গে যে তুমি থাকতে পারবে না, তা আমি জানতাম। ওরা তিন পুরুষ ধ'রে লুঠেরা। চৌথা পুরুষে সে নতুন ক'রে বদলে যাবে, তা ত' আর হয় না!—যাই হোক এখন দেশে চলেছ?

খুদাবক্স সম্মতি জানায়। পরন্তপ বলে,—তোমার মনটা এখন নিশানা থেকে ছুটে এখানে ওখানে ঘুরছে ব'লে মনে হয় খাঁ সাহেব, এই জন্যে বলছি এখন নয়, কিন্তু কাজ যদি করতে চাও, শাঁপিগরের মধ্যে, তাহলে আমার কাছে চলে এসো। এলাহাবাদের আগে, আমার এক বন্ধুর মারফত একটা রিসালা-হল্‌ট্ পেয়েছি। ঘোড়ার একটা আস্তাবল। দশটা ঘোড়া নিয়ে কারবার সুরু করছি, পরে ভালো হবে। তুমি ঘোড়াকে শিখাতে পারবে ত?

খুদাবক্স না হেসে পারে না। বলে,—কি পারব, আর কি পারব না তা কি আমিই জানি?

পরন্তপ বলে,—এই তো বাস্—ঠিক হয়ে গেল। ঘোড়া আমার, শিক্ষা দেবে তুমি।

—কি দেবে?

—ট্রেনিং দেবে, অংরেজী কথা ফৌজের কথা এ-সব। বল ভাই কি জানে পরন্তপ চৌহান আর কি জানে না। ফৌজে ছিলাম দু-মাস, কিন্তু যা শিখেছি, তা শিখতে অন্য লোকের কমসে কম্ ছয় মাস লাগত। ট্রেনিং হচ্ছে শিখাই-পড়াই। ঘোড়াকেও মখ্‌তবে বসে পাঠ শিখতে হয় জানো ত? আমি আর তুমি, দু-জনে মিলে কারবার লাগাব। ঘোড়া বিক্রী করব, চড়াদামে, ফৌজের সাহেবদের কাছে, এখানে ওখানে। কোন গোলমাল নেই।

—ফৌজের কাছে কেন? ফৌজ ত' তোমার না-পসন্দ।

পরন্তপ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—এই কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম কবে? অংরেজী তেতাল্লিশ সালে ত? এখন চলছে অংরেজী তিপ্পান্ন সাল। ও জবান্ বুড়ো হয়ে গেছে, ওকে ফেলে দাও ভাই। এখনকার নতুন কথা হচ্ছে ফৌজের কাছেই থাকতে হবে, আর খুব ঘোড়া বেচতে হবে, আসতে হবে, যেতে হবে।—বলে আগুনের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবে পরন্তপ। বলে,—আমি ওখানেই থাকবো, তুমি যদি কাজ খোঁজ, ত' ওখানেই চলে আসবে। কারবারের জন্যে আগেই আমি আগাড়ি-পিছাড়ী দাঁড়, যা ঘোড়া বাঁধতে লাগবে, তার ফরমায়েস দিয়েছি।

খুদাবক্স বলে,—ঘোড়া দেখেছ?

—না-না-তবে যে আমাকে খবর দিয়েছে, সে মিথ্যা কথা বলবে না।

—আগেই ঘোড়া বাঁধবার দাঁড় কিনেছ যে? এমন অসম্ভব হাসাকর লাগে ব্যাপারটা, যে খুদাবক্স না হেসে পারে না। পরন্তপও খুব হাসে। বলে,—দাঁড় ঠিক আছে, আমি ঠিক আছি, একবার ধরব কি সুরু হয়ে যাবে কারবার।

—যার ঘোড়া সে কি দাঁড় রাখেনি? এতদিন কি করেছে তাহলে?

—আরে ভাই যা হয়ে গেছে, তার কথা ছোড়। এখন ভাব সামনের কথা যা হবে, যা আসছে।

হাতের ওপর মাথা রেখে, অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকে খুদাবক্স। হয়ত পরন্তপের কথাই ঠিক। হয়ত গত জীবনকে ভুলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তা বলেই কি তা' সম্ভব? ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে খুদাবক্স।

গ্রামে পৌঁছয় তারও দিন দশেক বাদে। যমুনা পেরিয়ে পাড় ভেঙে উঠে, ক্ষেতের পথ ধরে চলতে চলতে দেখে দুই পাশে পাকা গমের ভারে গাছগুলো মাথা নীচু ক'রে আছে। তিতির, বটের, টিয়া, নানান রকম পাখী গমের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

তাদের বাড়ীর দিক থেকেই তার গাঁ সুবাদের চাচা হাফিজ বেরিয়ে আসছে বোধ হল। খুদাবক্স প্রায় ছুটে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সম্ভাষণ ও আশীর্বাদের পর হাফিজ বলল,—এতদিন কোথায় ছিলে বেটা? কেন কোন চিঠিপত্র লেখনি? টাকা পাঠিয়েছ ঠিক ঠিক এসেছে সুজনের ছেলের হাতে। আমার খত্ তুমি পাওনি?

—কেন, কি হয়েছে?

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে হাফিজ। বলে,—নিজেই দেখগে বেটা, তোমার চাচী ওখানে রয়েছে, কোন ভাবনা নেই...ভাবীর বড় অসুখ, খুদাবক্স, আজ বাইশদিন হয়ে গেল বুখার ছাড়ছে না।

পরী শুয়েছিল আনোয়ারের খাটিয়াতে। পায়ের থেকে গলা অবধি পুরানো লাল রেজাই দিয়ে ঢাকা। জ্বরে মুখখানা লাল হয়ে আছে। হাফিজের বৌ, মুখ নীচু ক'রে আস্তে ডাকল—দেখ কে এসেছে, দেখ?

খুদাবক্স আস্তে ডাকল—মা—

চোখ খুল্‌ল পরী। অবিশ্বাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে চিন্‌ল ছেলেকে। শীর্ণ মুখে হাসি খেলে গেল। চোখে তার পরেই জলে ভরে এল। বলল,—তোর সংগে আমি ত' কথা বলব না!

পরে সব শুনল খুদাবক্স তার পড়শীদের কাছে। একে একে সবাই এল। বিষুন সিং, সুজন, বুড়ো লালা, হাফিজ, এমনকি পরমেশ্বর মিশ্রও দাঁড়িয়ে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। অনেক দিন বাদে চার পাঁচ খানা চারপাই পড়ল উঠোনে। সবাই তামাক খেতে খেতে মৌজ ক'রে কথাবার্তা কইতে লাগল। বয়স্কদের প্রাপ্য সম্মান দেখিয়ে খুদাবক্স দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেককে জানাল অভিবাদন। দেখেশুনে তারিফ ফিরতে লাগল চোখে চোখে। হাঁ, বেশ ছেলে হয়েছে। আজকালকার ছোকরাদের মত বে-আদব নয়। আর চেহারা—তা হবে না কেন? বাপ্‌কা বেটা ত?

প্রত্যেকের কাছেই পরম কৃতজ্ঞ বোধ করল খুদাবক্স। তার অনুপস্থিতিতে এরা তার মা-কে দেখাশোনা করেছে—চাষ দিয়েছে, ক্ষেতী দেখেছে, ফসল দিয়েছে। আগে ভাবেনি সে, এখন দেখল, এরাও তাকে ভালবাসে। তাকে আলাদা কোন মানুষ হিসেবে দেখে না। তাদের বন্ধু আনোয়ারের ছেলে, এই গাঁয়ের মানুষ। তাকে দেখাশুনা করা, ভালবাসা, এ'ত কর্তব্য কাজ মাত্র। প্রতিদানে তারা চায় এই গ্রামেই থাকো, বিয়ে করো, বসবাস করো। তোমার সন্তান যেন এই গ্রামেরই একজন হয়ে বড় হয়ে ওঠে। পরস্পর কাছে থাকবার, বেঁধে রাখবার জন্যে এই স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন। বুড়ো লালার রেখাঙ্কিত মুখ, হাফিজের গোলগাল ফর্সা মুখ, বসন্তের দাগ চিহ্নিত বিষুন সিংয়ের মুখ, সবগুলো মুখ যেন এক কথাই বলে, একই অনুনয় জানায়। এই জীবনের আদলখানা বদলে দেবার বিদ্রোহী হাওয়া কোন আশমানে ফুঁসে উঠেছে। এইসব কিষাণ ও জোতদার মানুষ যেন তার গন্ধ পাচ্ছে, তার একটা আশঙ্কাও চোখে চোখে লেখা আছে।

পরীর কথা বলে মাথা নাড়ল সকলেই। সকলেই তাকে ভালোবেসেছে, নিজে থেকেই করেছে তার জন্যে। কিন্তু পরী সেই দান এমনি এমনি নেয়নি। লালা বলল,—খলিফার রুটি মেরে দিয়েছে তোমার মা।

পরী নাকি জামা, পাজামা, মেয়েদের জামা, পুরুষদের মেরজাই, এইসব জিনিষ সেলাই ক'রে দিয়েছে, গম পিষে দিয়েছে ঘরে ঘরে। লালা আরও বলল,—তুমি যা টাকা দিয়েছ তার একটি পয়সাও খরচ করেনি। শুধু সংসার সাজিয়েছে, গুছিয়েছে, শীত মানেনি, বর্ষা মানেনি, পরিশ্রম করেছে, বলেছে,—এখন আমার ছেলে দাঁড়িয়ে গেছে, সংসার হবে, সে বিয়ে করবে—আমি তখন আরাম করব। সেদিনও, রাত হয়ে গেছে, দেখছি হাফিজের বোনকে মালিশ তাগিদ ক'রে কত রাতে একলা ঘরে ফিরছে। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম—বেটি, খুদাবক্সের বাবাকে আমি ছোটটি দেখেছি, আমার কাছে তুমি শরমাও কেন? একটু হেসে তখন চলে গেল। এই কাজ ক'রে ক'রেই অসুখটা বেড়ে গেল আর কি!

খুদাবক্স শোনে মন দিয়ে। বুকের হাড়ে জখম্ আছে, বুখার হয়, তার সংগে সেখানে

হয় ব্যথা, আর খুনও মাঝে মাঝে উঠে আসে গলায়। গাঁয়ের হেকিমের অনুরোধে, এলাহাবাদ ফেরবার পথে এক বড় হেকিমকে এনেছিল বিষ্ণু সিং—কোন আশাই দিতে পারলেন না। বললেন বড় পাজি ব্যামো—ভেতরটা খেয়ে গিয়েছে, ঝাঁজরা ক'রে দিয়েছে। এখন সেবা যত্ন খাওয়া-দাওয়ার ফলে যতটা ভাল হয়। কাছাকাছি কোন্ বটগাছের নীচে এক সিদ্ধ দরবেশ এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে তাবিজ্ এনেও দেওয়া হয়েছে। কিছু ফল পাওয়া যায়নি।

মায়ের সেবা করে খুদাবক্স প্রাণপন ঢেলে। মা যদি চলে যায়, তবে তার যে কিছুই থাকবে না। একটা বিরাট নিঃসঙ্গ শূন্যতা যেন তাকে গ্রাস করতে চাইছে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে।

খুদাবক্স কাজ ছেড়ে আসার কথা বলে না, বলে ছুটিতে এসেছে। পরী দেখে দেখে বলে,—এবার তোকে বিয়ে দেব। কত টাকা জমিয়েছি জানিস্? তোর বৌ-কে গয়না দেব।

মায়ের একটা স্বপ্নও ভাঙে না খুদাবক্স, হেসে হেসে বলে,—তার জন্যেও ত' তোমার ভালো হয়ে উঠতে হবে মা।

সন্ধ্যে হতে বাপের কবরে চেরাগ্ জ্বেলে দেয় খুদাবক্স। পরীর পাশে বসে কথা বলে। পরী বলে,—তোর মনের মতন বৌ আমি পাব কোথায়? অন্য গাঁয়ে খবর করতে হবে। কিরকম বৌ চাস্ বল্ দেখি?

—তোমার মতন।

—শুধু ঠাট্টা, বলে হাসে পরী। খুদাবক্স মমতাভরা গলায় বলে,—তোমার চেয়ে সুন্দর বৌ দিয়ে কি হবে?

পরী বলে,—কি যে বলিস্!...একটু চোখবুজে থেকে আবার বলে,—তোর বাবার জামা, কামিজগুলো পরিস্, পেটিতে তোলা আছে। আমার বৌ কালের পায়ের গহনা আছে, সোনার ফুল আছে একটা, সব তুলে রেখেছি। টাকাগুলো পাবি পিতলের ঘটিতে, পোঁতা আছে পেটির নীচে মেঝেতে। একখানা ই'টের তলায়।

সোনার ফুলটা বের ক'রে এনে মাকে দেয় খুদাবক্স, দেখে দেখে পরীর চোখে কোমল মমতা ফোটে, বলে,—তোর বাবার প্রথম উপহার। পাছে সামনে থাকলে অভাবের দিনে বেচে দিতে হয়, তাই আড়ালে রেখেছি। তোর বৌ এনে নিজে হাতে পরিয়ে দেব। কি বলিস্?—

খুদাবক্স জবাব দেয় না। একখানা মুখে এই ফুল পরিয়ে দেখে তার মন। তার পরেই সেই ছবিখানা বন্ধ করে সে! নিশ্বাস পড়ে একটা। এমন ছেলে, পরী ভাবে, কোন যাদুগরণী ত' বশ করেনি? তার পরেই ভাবে না, না, তাহ'লে আমি জানতাম।

ফসল কাটবার সময় হলে এবার সবাই ডাক দেয় খুদাবক্সকে। বছর বছর তারাই কেটেছে, এবার যখন ঘরে আছে, তখন সেও আসুক।

চাচীকে মা'র কাছে বসিয়ে ক্ষেতে যায় খুদাবক্স। হাতে পাশ্‌নি নিয়ে ক্ষেতে নামলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সকৌতুকে তার পড়শীরা দেখতে থাকে, খুদাবক্স কেমন ক'রে ফসল কাটে। প্রথমটা কষ্ট হয়, তারপর নিপুণ হাতে গম কেটে ভারা বাঁধে খুদাবক্স। হাফিজের গরুর গাড়ীতে তুলে দেয়। ঘর থেকে মেয়েরা দুপুর বেলা নাস্তা আনে। সকলেই আহ্বান করে খুদাবক্সকে। একটু হাসি গল্পও চলে। তারপর আবার সুরু হয় কাজ।

তার রক্তে রক্তে বুঝি এই পরিবেশে সাড়া জাগে। পাকা ফসলের গন্ধ বুক ভরে নেয় খুদাবক্স। এমনি সময় দেখে বুড়ো লালা ঘোড়া চড়ে দেখতে দেখতে আসছে। নেমে পড়ে পাশনি তুলে নেয় লালাও। রেখাঙ্কিত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক গোছা গম হাতে ধরে। খুদাবক্সকে বলে,—এমনি ধারা রঙের বৌ আন্‌বে বেটা, ভুলে যেও না।

পিঠ নীচু করে কাটতে কাটতে হাসে আর সকলে। লালা বলে,—বৌ আনবে এই রকম সুন্দর, চাঁদি দিয়ে আঁজলা ভরে দিয়ে মুখ দেখব তোমার বৌয়ের।

সকলেই আনন্দ অনুভব করে। গুনগুন করে গুঞ্জন করে। ওদিকে গানের সুর তোলে হাফিজ নিজে—একেবারে দেহাতী গান। সুরটা একঘেঁয়ে, কথায় বৈচিত্র্য নেই। তবু ফসল কাটার ঝোঁকে ঝোঁকে গানের মুখে তাল পড়ে, আর মুখে মুখে গানটা ছড়িয়ে পড়ে এদিক থেকে ওদিকে—সহেলী আঙিয়া রঙাবত আওরে—এস সখী আমরা আঙিয়া রঙে রঙাই—আনন্দের দিন এল।

বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত সোনালী গমের ভারে নীচু হয়ে আছে। সরু সড়কে বয়াল-গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এই ফসলের সমুদ্রে মাথা নীচু ক'রে ফসল কেটে চলেছে মেয়ে পুরুষ। একটা ঘোড়া নিস্পৃহভাবে চরে বেড়াচ্ছে, মুখে তার জালবাঁধা। সমস্ত চিত্রপটখানা সুখ, শান্তি এবং আশার রঙে মনোহারী। গানের গুঞ্জন ভেসে আসছে তারই মধ্যে। নীল আকাশ প্রসন্ন মিঠে রোদের আশীর্বাদ ঢেলে দিচ্ছে, বিচিত্র পেখম ঝুলিয়ে ময়ূর অপেক্ষা করছে কোন্ গাছের ডালে। এই দৃশ্য, খুদাবক্স সতৃষ্ণ নয়নে দেখে মনের পটে লিখে নিল। দীর্ঘদিন বাদে, যখন এই শান্ত সুন্দর দিনগুলো চিরতরে হারিয়ে গেছে, তখন মাঝে মাঝে খুদাবক্স এই ছবিখানা মনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখত, আবার রেখে দিত স্মৃতির ভাণ্ডারে, যেন এই ছবি এক মূল্যবান রত্ন, রেখে দেবে আর মাঝে মাঝে দেখবে, ব্যবহারে কখনো মলিন করবে না তাকে।

দিনে দিনে দিন চলে যায়। এত চেষ্টাতেও এতটুকু উন্নতি হয় না পরীর। অঝোরে কাঁদে পরী, ছেলের অজান্তে। এখনই বাঁচবার আকাঙ্খা তার, এখনই সে সংসার বাঁধবে। আর এখনই নিষ্ঠুর বিধানে তাকে চলে যেতে হবে। ছেলের কথা ভাবে সে। নিরাশ্রয়, অসহায়, নিঃসঙ্গ। কেউ নেই। যত কাঁদে, তত বুকের ভেতরে ব্যথায় যেন হাড়পাঁজরা ভাঙতে থাকে। নিশ্বাস নিতে বাতাস পায় না।

ছেলে ভাবে মা-র কথা। বাবার কথা মনে হয়, মনে হয়, মা চলে গেলে কেমন ক'রে থাকব। মনে হয়, এই জীবনের কি কোন প্রয়োজন ছিল না? অথবা কোন প্রয়োজন আছে বলেই একটার পর একটা বাঁধন ছিঁড়ে তাকে মুক্তি দিচ্ছে খোদা? এই মুক্তি সে চায়নি, এই পরিণতি তার কামনা ছিল না—কিন্তু সে আরজি ত' খোদা মানল না। দুনিয়াতে যে কটা দিন মাপা ছিল পরীর, শেষ হয় বড় শান্তির মধ্যে, শেষ সময় বাঁচবার আর সংসার বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল।

তবু চলে যেতে হল। তখন রাত্রি উত্তীর্ণ হবে প্রভাতের তীরে। পূব আকাশে আলোর রেখাগুলো ফুটছে। হেকিম উঠে এলেন শয্যার পাশ থেকে। মেয়েরা কেঁদে উঠল কেউ কেউ। খুদাবক্সের অনুভূতিতে সেই মুহূর্তটা কেমন জানি এলোমেলো হয়ে গেল। মায়ের প্রশান্ত মুখ মনে পড়ে, আঙিনাভরা অনেক লোক, তাও মনে পড়ে, আর যে কি হল, ঠিক মনে পড়ে না। দাঁড়িয়েই কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। সেই বিস্মৃতির ঘূর্ণীপাকে ফাতেহার গুঞ্জন কিন্তু প্রবীণ যন্ত্রীর হাতে সমের মতো তালে তালে পড়ছে—

হে আল্লা, দীনের প্রভু তুমি, এই মৃত্যুপথযাত্রিণীকে দয়া করো, যা সে জীবনে পায়নি তাই তুমি তাকে পূর্ণ করে দিও, যেন কোন অসদ্গতি না থাকে, বড় দুর্গম যাত্রা তার সামনে, হে আল্লা, তুমি তাকে সাহায্য কোর।

সব এলোমেলো হয়ে যায়।

পরী আর আনোয়ারের কবরের পাশে চাঁপা ও কামিনীর দুটো চারা লাগালো খুদাবক্স। বিলিব্যবস্থা করল ঘরদোরের। গাঁয়ের লোক কত করে বোঝাল তাকে, এক মা চলে গেছে তাতে কি অনাথ হয়েছে সে? এইখানে থাকুক খুদাবক্স, পিতামহের ভিটেখানাকে মর্যাদা করুক। ঘাড় নাড়ল খুদাবক্স। এই ঘর, এই মাটি থেকে তার মন ছুটে গেছে। ছেড়ে ত' সে যাচ্ছে না, হেফাজত দিয়ে যাচ্ছে মাত্র। হাফিজ তার চাচা, হাফিজের বৌ তার দুধ-মা। তাদের হাতেই ঘর দিয়ে গেল খুদাবক্স। তারা বাস করুক, ব্যবহার করুক, ভোগ করুক ক্ষেতের ফসল, সন্ধ্যায় চেরাগ জেবলে দিক উঠোনে, তাতেই খুদাবক্স শান্তি পাবে। যদি কোনদিন ফিরে আসে? তবে থাকবে এখানেই। তখন যা হয় ব্যবস্থা হবে। শুধু এখন যেতে চায় সে। এই শূন্যঘর তাকে তাড়না করছে। এই উঠোন তার পিতা ও মাতার স্মৃতি বিজড়িত। এই মাটিতে, ঐ আমগাছের তলায় তার কত সুখের দিন কেটেছে, যখন শিশু ছিল, মায়ের কোলে শুয়ে গান শুনত, বাপের কাঁধে চড়ে বেড়াতে যেত, দুপুরে ছোট্ট লাঠি হাতে গমের ওপর থেকে পায়রা তাড়াত, তার সেই শৈশব ও কৈশোর, সুখ ও শান্তির দিন, সবই এখানে বাঁধা পড়েছে। ঐ আমগাছটা জানে সেই মর্মান্তিক সকালের কথা, যখন সাহেবের গুলীতে আনোয়ারের কলিজা টুটে রক্ত বেরিয়েছিল, ঐ আমগাছটার তলার মাটিতেই মাটি নিয়েছে সেই বীর কিষাণ। খুদাবক্সের মক্কা মদিনা সবই ঐ আমগাছের তলায়। সেখানেই সব তীর্থের পুণ্য সমাহিত আছে। এই ঘর সে ছেড়ে যেতে পারে কি? সাময়িকভাবে চলেছে এইমাত্র।

খুদাবক্সের যুক্তি বুঝে কেউ তাকে বাধা দিল না। রাতে দেখা করতে এল বুড়ো লালা। বলল,—কি বেটা, কি কথা শুনছি? তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—কিছুদিনের জন্যে চাচাজী।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল লালা। বলল,—মিথ্যে কথা বোল না বেটা, তুমি আর ফিরবে না। ভগবানের কি আন্দাজ তা ত' জানি না, নইলে এমনই বা ঘটবে কেন? আন্দাজ করি, তোমাকে দিয়ে তাঁর অন্য কোন কাজ আছে।

খুদাবক্সের চোখে অবিশ্বাস লক্ষ্য করে সে বলল—অবিশ্বাস কোর না বেটা—দুনিয়াতে সকলেরই কিছু না কিছু কাজ আছে, ছোট পতঙ্গও ভগবানের কাজ ক'রে চলেছে। তোমাকে তিনি অন্য কাজের জন্যে তৈরী করেছেন হয়ত।

বৃদ্ধের গভীর বিশ্বাস দেখে নীরব হয় খুদাবক্স। লালা বলে চলে,—একই লোহা থেকে, হাল, ঢাল, তরোয়াল, সবই হয়। তবে এক এক মানুষ এক এক কাজে লাগবে না কেন?

তারপর বলে,—একটা কথা খেয়াল রাখবে বেটা, যখন মন করবে, ফিরে আসবে। এই তোমার ঘর, এখানে তোমার মাটি আছে। টাকা লাগবে কিছু? সঙ্কোচ করো না—

খুদাবক্স অভিভূত হয়ে ঘাড় নাড়ে। না তার মায়ের জমানো তিন বিশ টাকা আছে। তার পক্ষে অনেক। পঁচিশ টাকা সে রেখে যাচ্ছে। হাফিজ তার মা'র নামে দাওয়াৎ দেবে। তার বড় সখ ছিল শহর বাজারের মত মা আর বাবার কবর বাঁধিয়ে দেবে।

ভগবান জবুর দিন দেগা, লালা বলে। তারপর খুদাবক্সকে সস্নেহ আলিঙ্গন ক'রে বিদায় নেয়।

ভোররাতে নিজের জিনিষপত্রের ঝোলা কাঁধে ফেলে খুদাবক্স। প্রত্যূষের তারার চাহনী যেন তার মায়ের মতো মধুর, উজ্জ্বল। উঠোনের একটু মাটি নিয়ে কাপড়ে বেঁধে পকেটে রাখে। আমগাছের তলায় বাতিটা নিজের হাতেই জ্বালে। তারপর বিদায় নেয়। শূন্য ঘর, শূন্য আঙিনা, বিদায় জানায় সকলকে। বিদায় জানায় শৈশব ও কৈশোরকে। বিদায় জানায় মা ও বাবাকে। বোবা ভাষায় জানায় যে তার আর উপায় ছিল না, জানায় সে তাদের ভোলেনি, জানায় তার কলিজা ছিঁড়ে এখানেই রেখে যাচ্ছে, তবু যেতে হচ্ছে, এইসব কথা জানিয়ে সে তাদের দোয়াভিক্ষা করে। সে একলা, সে নিঃসম্বল, তবু তাকে চলতে হবে। চলতে হবে, যতদিন না তাদের মতো তারও সময় আসে। এখন সে সময় নয়। এই জীবন তাকে শুধু আঘাত দিচ্ছে, অমৃত পাবার আশা ক'রে তাই সে দোয়া ভিক্ষা করে।

প্রভাতের বাতাস তার তপ্ত ললাট চুম্বন ক'রে আশীর্বাদ জানায়, দুটো একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ে। ঘরটা বন্ধ ক'রে চলতে সুরু করে খুদাবক্স।

এলাহাবাদের পথে চলতে কোম্পানীর ডাকসওয়ারকে দেখে খুদাবক্স। একই সরাইখানায় তারা বিশ্রাম করে। খুদাবক্সের প্রশ্নের জবাবে সে জানায় হ্যাঁ ঝাঁসীতেও তাকে যেতে আসতে হয়েছে সম্প্রতি। 'ঝাঁসী' নামটা শুনেই কেমন যে লাগে খুদাবক্সের। তার হাজারটা সাগ্রহ প্রশ্নের জবাব ডাকসওয়ার দিতে পারে না। একটা শহর মাত্র, এমন কি দেখবার আছে, এত কি জানবার আছে? তা ছাড়া এখন ত' একটাই খবর, ঝাঁসীর রাজ্য থাকে কি যায়! রাজাসাহেব সম্প্রতি মারা গেছেন।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় খুদাবক্স। কি হয়েছিল?

—কি জানি! ভাই, মৌত যখন পরওয়ানা জারী করে, তখন কিছু কিছু বাহির নিশানা দেখায়—আসলে কি হয়েছিল জানো? মৌত ধরেছিল, আর কিছু নয়।

রাজার জন্য সহানুভূতি হয় খুদাবক্সের। মন ভরে ওঠে। সময় মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

বারো

বীণার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদে মৌতি। বলে,—সব সাধনা মিছে হয়ে গেল গুরুজী, আমি গান করতে পারি না, সাধনা করতে পারি না। গান করতে যখনই মন ঠিক করি, ধ্যান ঠিক করি, সেই ধ্যান আমার ভেঙেচুরে কোন্ ধ্যান হয়ে যায়, এ কি হল?

এত বিদ্যা চন্দ্রভাগের, এত মানবচরিত্র দেখেছেন তিনি, তবু এই হতভাগ্য নর্তকীর অনুশোচনার সামনে সব কথা তাঁর মিথ্যা হয়ে যায়। নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, মানুষের বেদনাই সবচেয়ে মহান সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের 'অরমাঁ' কণ্ঠে বেজে সার্থক হবে যে সঙ্গীতে, সেই সিদ্ধি তাঁর ত' নেই। যাঁরা সঙ্গীতের তীর্থে বাউরা যাত্রিক, তাঁদের কথা স্মরণ ক'রে এতদিনে মনে হয়, মানুষের হৃদয় শ্রেষ্ঠতম বীণা, আর মানুষের বেদনাই শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত।

সে কথা বোঝেন বলেই প্রিয় শিষ্যাকে সান্ত্বনা দিতে ভাষা খুঁজে পান না চন্দ্রভাণ। শুধু হাত বুলিয়ে দেন মাথায়। প্রত্যহ আসেন, আর বসে বসে চলে যান।

মোতির মধ্যে যেন কোন বিস্মৃত বেদনার স্মৃতি খুঁজে পান চন্দ্রভাণ। মোতির বিভ্রান্ত মুখ, দিশাহারা চাহনি দেখে চল্লিশ বছরের যবনিকা ভেদ ক'রে নিজের যৌবনের মদমত্ত দিনগুলির কথা স্মরণ করেন তিনি। মনে পড়ে পান্নার রাজবাড়ীতে দশহরার চন্দ্রালোকিত রজনীতে জল-মহলের একটি স্মৃতি। মনে পড়ে তিনি দ্রুত নেমে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে নৌকোর দিকে, আর কার মিনতি তাঁর পায়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে—যেও না! যেও না! শুনে যাও। মনে পড়ে ঘৃণাভরে তিনি বলেছিলেন,—আমার ভালবাসা পণ্য নয়—মিষ্টি হাসির দামে তাকে কেনা যায় না। আরো মনে পড়ে তাঁর রূঢ় কথার আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেল একখানি অপরূপ মুখ। আজও মনে পড়ে তার কপালে ছিল মুক্তার চন্দ্রটিকা। নিজেকে তিরষ্কার করেন চন্দ্রভাণ। মনে হয় আজ মোতির মধ্যে সেই অবহেলিতাকেই দেখছেন তিনি।

গানে যদি শ্রীরাধিকার কথা থাকে ত', সে গান বিস্মৃত হয়ে নিজের কথায় চলে যায় মোতি। কুকুভা ও খম্‌বাবতী, গুর্জরী ও ভূপালী, কণ্ঠে তাদের আহ্বান করতে বাধে তার। প্রিয়সঙ্গসুখনিমগ্না, মালতীপুষ্পশোভিতা হে কমলাননা রাগিণী, তুমি কি আমার দুঃখ বুঝবে, এই কথা মনে হয় তার।

বিরহিণী রাগিণীমালা পটমঞ্জরী, আসাবরী ও ললিতার ছবি দেখে মোতি। দিগন্ত রেখা থেকে পুঞ্জে পুঞ্জে যখন মেঘ উঠে আসে, তার মনে হয় এমনি দুর্যোগের মধ্যে তার দয়িত চলেছে একা, মনে হয় সেই পথ যদি সে হতে পারত, যদি তার প্রিয়তম পদক্ষেপে দলিত করেও যেত, তবু কিছু সান্ত্বনা মিলত তার। মনে হয় সুখ, অর্থ ও নিরাপত্তার সব সম্ভাবনা পদদলিত ক'রে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে গেছে। তখন মোতি নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। তার পরিবেশ, তার অর্থ, ঐশ্বর্য, কাঁটার মতো বেঁধে।

সান্ত্বনা দিতে ভয় পায় জুহী, মোতির কাছে কাছে সকরুণ চোখে চেয়ে ফেরে। পাখীর শখ ছিল মোতির, পিঁজরায় তারাও ঝিমিয়ে বসে থাকে, যত্ন পায় না। ঘরে ঘরে গালিচার ওপর ধুলো, ঝাড়লণ্ঠনে মাকড়সা জাল বোনে। দাসীদের কাজে শৈথিল্য দেখা দেয়।

কখন শয়নকক্ষে তার নাচবার পোষাকগুলো সাজিয়ে দেখে মোতি। বিরহে, মিলনে, হোলিতে, অভিসারে, রাধিকার এক এক রকম পোষাক। মনে হয় কোনোদিনও এগুলো কাজে লাগবে না তার। দিন উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু রাত্রি আর কাটে না। ধীরে নগরী ঘুমিয়ে পড়ে, তবু তার চোখে ঘুম নেই। কোন কোন নিদ্রাহীন রাতে তানপুরাতে মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে গান গায়, 'নিদ নহী আবত সৈয়াঁ—' গাইতে গাইতে গান আর গান থাকে না, সুর হয়ে যায় অশ্রু, তখন তানপুরো নামিয়ে রাখে মোতি, বলে,—কান্না এনে দিস্‌ কথায় কথায়, তুই কি আমার সৌতীন?

কখনো নির্জন ঘরে প্রসাধন করে মোতি, সযত্নে বেণী রচনা করে, কপালে টিপ পরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখ দেখে আয়না ধরে। বিছানায় বসে পায়ের ওপর দিয়ে ঘাঘ্‌রার প্রান্ত বিছিয়ে দেয়, ভাবে সেই দিনগুলোর কথা,—এমনি করে সেজেছিলাম, দেখে সে একদিন বলেছিল—রোজ রোজ এত প্রসাধনের কি প্রয়োজন? কোন্‌ হরিণকে ঘায়েল করতে চাও? আমার হৃদয় দেখ জর্জরিত, আরো আঘাত কি সহ্য হবে? মনে পড়ে গান গেয়ে কত রাত কেটে গেছে। তারপরেই মনে পড়ে সেই শেষ দিনের কথা। তার কথার চাবুকে

পাংশু হয়ে গেছে খুদাবক্সের মুখ, বিস্মিত ও আহত দৃষ্টি। মনে পড়ে আর মন জ্বলে যায় তার। দুঃখে পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে কাঁদে মোতি।

কখন মনে হয় সেই কি কম নিষ্ঠুর! আঘাত দিল মোতি আর সেটাই সত্যি মেনে চলে গেল? সেই আঘাত যে ফিরে মোতিকেই হানল, তা' ত' দেখল না খুদাবক্স? খুদাবক্সকে কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর মনে করলে তার খানিকটা শান্তি হয়। ভাবে জীবনটাই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল জেনেও এই ব্যর্থতা থেকে আমি মুক্তি পেলাম না। এ এক আশ্চর্য প্রেম, যাতে তার কোন অধিকারই স্বীকৃত হল না।

'ন গুল আপনা, ন খর আপনা
ন জালিমবাগবানে অপনা—
বনাইয়া হ্যায় কিস্‌ গুল্‌শন মেঁ
ম্যয়ঁ ঘ্যর আপনা?'

ফুল আমার নয়, কাঁটা আমার নয়, নিষ্ঠুর বাগানের মালী, সেও আমার নয়। তবে কোন গুলবাগিচায় আমি আমার ঘর বাঁধলাম।

প্রেম আমাকে শুধু বন্দী ক'রেই রেখে গেল, অথচ প্রতিবাদ করেও উপায় নেই—

ইয়ে কাফসোঁ কো কয়েদীয়োঁ কা
আঁসু বহানা হ্যায় মনা—

এই কারাগারের বন্দীদের অশ্রুমোচন করতে নেই।

একদিন স্নানান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে কার সুস্বরে গান শুনে তাঞ্জাম থামাল মোতি। চৌকে দাঁড়িয়ে একটি অন্ধ রমণী গাইছে—

তেরে কারণ ম্যয় প্রীতম যোগান বনি যাঁউ
যোগান্‌ বন্‌ যাঁউ॥
অঙ্গ ভূষণ ছোড়ি প্রীতম্‌
গৈর বসন পহ্‌নাউঁ—
একনাম গাবত প্রীতম তীরথ তীরথ ভরমাউঁ
যোগান্‌ বন্‌ যাঁউ॥

প্রেমিকের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এই নিবেদন শুনে মোতির হৃদয়ে বর্ষণান্তে পুষ্পিত কামিনী গাছের মতো দোলা লাগল—কিছু অশ্রু কিছু চ্যুতবৃন্ত ফুল ঝরে পড়ল নিমেষে। শিবিকা থেকে নেমে দাঁড়াল মোতি, ভিখারিণীর হাতে গলা থেকে সোনা ও মুক্তার বহুমূল্য হার খুলে দিল। রাজপথে প্রকাশ্যভাবে তখনো মোতিকে দেখতে অভ্যস্ত নয় মানুষ। তারা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। ভিখারিণী একটু হেসে বলল,—মাল্‌কিন, তুমি মেহেরবান, কিন্তু আমি সামান্য ভিখারিণী, এই অলঙ্কার আমার হাতে দেখলে লোকে কেড়ে নেবে, কয়েদ করবে—তা ছাড়া এ তো আমার কাজে লাগবে না। এ তুমি ফিরিয়ে নাও।

—তোমার ঘরে কেউ নেই?

—আমার পিতাজী আছেন।

তখন পিছন থেকে জলদগম্ভীর সুরে কে বললেন,—তুমি নির্ভয়ে ঘরে চলে যাও বেটি। কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না। সাগর একে ঘরে পেঁাছে দাও।

জনতা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। মোতি ও ঘোস পরস্পরের দিকে তাকালেন। ত্রস্তে শিবিকায় উঠে মোতি পর্দা টেনে দিল।

ফিরে চন্দ্রভাণকে ডেকে পাঠাল মোতি। বলল,—গুরুজী আপনি আমাকে ভজন শিক্ষা দিন। আমি ভজন শিখব।

চন্দ্রভাণ বোঝেন। বলেন,—ভজন তুমি গাইতে পারবে মোতি। সব গান সকলে গাইতে পারে না। ভজনের অরমা চরিত্রে সঞ্জাত হবার পূর্বে প্রয়োজন হয় কিছু চিত্ত-শুদ্ধির—তা' হয় কখনো দহনে, কখনো অশ্রুতে। মীরার কথা খেয়াল করো।

উত্তর না দিয়ে একটু হাসে মোতি। সে ভাবে, তবে আমার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে? আমি যোগ্য হয়েছি?

চন্দ্রভাণ ভাবেন, জীবনের পশ্চিমে চলে এলাম, তবু শিক্ষা শেষ হল না। আখরী পাঠ নিতে বাকি ছিল মোতির কাছে। সে শিক্ষা তাঁকে দিল এই নর্তকী, মানুষকে আরো ভালবাসতে শেখাল এই মেয়ে। তাঁর অহঙ্কারেরও মোচন হল। বলেন,—তম্বুরা বাঁধ বেটি, বল কোন ভজনে পাঠ সুরু করব।

মুখ নীচু ক'রে মোতি বলে,—সেই 'যোগান্ বন্ জাউঁ'—শেখান গুরুজী।

চন্দ্রভাণও গান সুরু করেন বিনা প্রতিবাদে।

যোগান্ বন্ জাউঁ, যোগিনী হয়ে যাব তোমার জন্যে—এই কথার মধ্যে শান্তি পায় মোতি। তার হৃদয়ের ধূপ জ্বলে জ্বলে এই সুরের আরতিকে মধুর ও পবিত্র করে।

ঘোঁস ও বাহ্‌রাম পাশাপাশি চলেন নীরবে। দু'জনেই এক কথা ভাবেন। সহসা বাহ্‌রাম বলে,—মাপ করবেন ওস্তাদ, ও কাজ আপনি ঠিক করেননি।

—সে কথা আমিও জানি বাহ্‌রাম।

—মোতি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

—মানুষ দুঃখ বহন করতে পারে বাহ্‌রাম, পাহাড় হলে দীর্ণ হয়ে যেত।

দু'জনেই দু'জনের মন বোঝেন। তাই বেশী কথা হয় না। আবার বাহ্‌রাম বলে, —আপনি যে টাকা আর খত্ পাঠালেন, তার কি হল?

—কিশোর এখনো আপস্ আসেনি, তবে খবর পাঠিয়েছে এলাহাবাদ থেকে। ওর মা মারা গেছেন, সে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।

তারপর বলেন,—বড় অন্যায় আমি করেছি বাহ্‌রাম, বড় অহঙ্কার বেড়ে গিয়েছিল। একটা জান দেবার ক্ষমতা নেই, দু'জন মানুষকে ঘা দিলাম!

—আপনিও ঘা খেলেন।

—দু'জনের কথাই ভাবি বাহ্‌রাম, তিস্‌রা জনের কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু এই পাপ আমি মোচন করে যাব।

—তাও জানি ওস্তাদ, আপনি চেষ্টা করবেন।

বাহ্‌রামের এই বিশ্বাসে কিছুটা বল পান ঘোঁস। একটু সান্ত্বনা মেলে।

তেরো

সরাইখানায় বসে কোম্পানীর ডাকসওয়ারের হাতে একখানা খত্ পাঠায় খুদাবক্স। ঘোঁসের কাছে খত্। লেখে : ওস্তাদ, আমার শেষ বন্ধন কেটে গেছে। মা আমাকে ছুটি

দিয়ে গেছেন। অনেকদিন হল আপনাকে ছেড়ে এসেছি। আপনার কুশল জানতে ইচ্ছে করে। একটা ছোট সরাইখানায় বসে আছি। কোম্পানীর ডাকসওয়ারের মুখে জানলাম রাজাসাহেব আর নেই। জেনে দুঃখিত হয়েছি। আমার বন্ধু পরন্তপ চৌহানের সঙ্গে এলাহাবাদের কাছে একটা রিসালা-হল্‌টে কারবার করবার কথা হয়েছে। আপনি আমার ভালোমন্দের কথা ভাবেন বলে জানি, তাই এত কথা লিখলাম। এ কাজে হয়ত ভালোই হবে। নতুন কোন নোকরী আর করবার ইচ্ছে নেই। আপনার কুশল কামনা করি। আপনার মত হিমায়েৎদার, বাহ্‌রামের মতো বন্ধু মিলেছে বলেই এই কারোয়াঁতে মিশে পড়েও আফশোষের কিছু নেই। খুদা হাফিজ।—খুদাবক্স।

থলি বের করে ডাকবরদারকে মাশুল গুণে দিল খুদাবক্স। লোকটা খুদাবক্সকে বলল,—তুমি নতুন পথে বেরিয়েছ। তাই সব নিয়ম জান না। এমনি করে টাকা বের করো না। বে-ঘোরে বদমায়েসের হাতে জান চলে যাবে।

পরদিন পথ চলতে চলতে দুপুর নাগাদ একজন বুড়ো সঙ্গী জুটে গেল। পথের পাশে বসে সে সযত্নে খুদাবক্সকে মিঠাই বের ক'রে দিল, এক রকম শরবতও বানাল। খেতে দিয়ে বলল—আমার টাকাকড়ি আর মালপত্র একটু দেখো। আমি স্নান ক'রে আসি।

কম্বলের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে খুদাবক্স ভাবল : এত ভাল লোক রয়েছে দুনিয়াতে, তবু সবাই শুধু সাবধান হতে বলে। তারপর তার ভারী ঘুম পেতে লাগল। চোখ বুজল খুদাবক্স।

সহযাত্রীকে আফিম বা ধুতুরা খাইয়ে জিনিষপত্র নিয়ে উধাও হবার নজীর তখন বিরল নয়। ভাগ্যক্রমে খুদাবক্সের অচৈতন্য দেহ কোম্পানীর রেজিমেণ্টের চোখে পড়েছিল—সড়ক ধরে কুচ চলেছিল নারায়ণপুরের দিকে। রিসালার সহিসদের চোখে পড়তে তারা খবর দেয়।

জ্ঞান হতে খুদাবক্স সব কথা বুঝল। বুঝল যে সে কোন ফৌজের হল্‌টের তাঁবুতে রয়েছে। উর্দিবাজনো অভ্যাস করাচ্ছেন উর্দিমেজর। ছয় জন বাজাচ্ছে, তাঁর সামনে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাঁবুর দরজা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো একজন শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক। সাদা আচকান ও পায়জামা পরনে। সুগঠিত, ঈষৎ স্থূল দেহ। তাকে বললেন,—হুঁশ এসেছে আপনার। কতক্ষণ জেগেছেন?

—এই ত! আমি কোথায়?

—নারায়ণপুর হল্‌ট-এ। কি হয়েছিল মনে করতে পারেন?

খুদাবক্স ভদ্রলোকের বারণ সত্ত্বেও উঠে বসে। বলে,—নারায়ণপুর হল্‌ট? এলাহাবাদ থেকে কতদূর?

—পঁয়ত্রিশ মাইল পুবে। কেন, এলাহাবাদে আপনার কাজ ছিল?

একটু অবাক হয়ে থাকে খুদাবক্স। বলে,—এখন চলে যাব। কিন্তু কি হয়েছিল আমার?

ভদ্রলোক তাকে একটু ওষুধ খেতে দেন। তারপর টুলে বসে বলে যান। আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথা বলবার অভ্যাস তাঁর। খুদাবক্স শোনে, তার সঙ্গী তাকে ধুতুরা খাইয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল। রামপুর ফোর্থ নেটিভ ইনফ্যাণ্ট্রীর রাইট উইং ও রিসালার দুটো ট্রুপ কুচ ক'রে চলেছিল। সহিসদের চোখে পড়েছিল, তারাই তুলে এনেছে খুদাবক্সকে। তিনি বাঙালী ডাক্তার, তাঁর নাম শিবচন্দ্র গাঙ্গুলী।

—আপনিই আমার জান বাঁচিয়েছেন?

—আপনি স্বীয় ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছেন। আমি সাহায্য করেছি মাত্র।

—কুচ-এর সঙ্গে আমি'ত থাকতে পারব না—নিয়ম নেই শুনেছি।

—হ্যাঁ, স্ট্যাট্‌ফোর্ড সাহেব আপত্তি করেছিলেন। আমি বলে কয়ে রাজী করিয়েছি।

—এখান থেকে আপনারা কতদূর যাবেন?

—চারদিন পরে এলাহাবাদে ফিরতে হবে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কাশী যাবার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেল।

—কেন?

—আমরা আদেশ পালন করি মাত্র। কোন প্রশ্ন করবার এক্তিয়ার নেই। তবে মনে হয় কোন জরুরী খবর এসে গেছে।

—আমাকে আজকে ছেড়ে দিন তবে?

এতক্ষণে একটু হাসেন ডাক্তারবাবু। বলেন,—আপনি কারো কয়েদত' নন্। তবে আপনার যাবার মতো তাগদ্ শরীরে নেই। কুচের সঙ্গে কোন কাজ করবেন?

খুদাবক্স কি যেন একটা ধরতে পারে। বলে,—জনাব, আপনি জান বাঁচিয়েছেন, ও-ই বড় কথা। ফির 'আপনি' বলে কথা বলবেন না। আমি কখনো শুনিনি, না আমার অভ্যেস আছে। বলুন কি কাজ করব?

হাসপাতাল সাফাখানার জন্যে আমি একজন লোক চাই, ওষুধপত্রের তদারক করতে, হল্‌টে সাফাখানার বন্দোবস্ত করতে। পথে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, পরে ছুটি দিয়েছি, সে এলাবাহাদে আমাদের সঙ্গে মিলবে । তুমি থাকতে চাও'ত আমি সাহেবকে বলব। বুঝতেই পারছ, তোমাকে রেজিমেণ্ট কোন মাইনে দেবে না। এখান থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাবে। খরচ যা, আমি দেব।

রাজী হয়ে যায় খুদাবক্স। সাহেব, রেজিমেণ্ট, এইসব কথা সে কতবার শুনেছে। ঝাঁসীতে থাকতে এলিস সাহেবের সঙ্গে ঘোসের সেলাম বিনিময়ের সম্পর্ক ছিল। দু'জনেই সামান্য মাথা হেলিয়ে পরিচয় স্বীকার করতেন। ঝাঁসীর সাহেবদের সে কখনো আগ্রহ করে কাছে গিয়ে দেখেনি। সব সাহেব ডোভড্‌সন নয়। তবু তার একটা বিদ্বেষের ভাব রক্তে ছিল। কিন্তু সে রাজী হয়ে গেল। মনে হল এ-ও একটা সুযোগ।

স্নান শেষ করে পরিষ্কার চিপা ও কুর্তা পরে যখন মুরেঠা বাঁধল খুদাবক্স, সকলেই একবার তাকে তাকিয়ে দেখল। পরে ডাক্তারবাবু সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সাহেবের তাঁবুতে। বললেন—আজ রবিবার। কাজ কম। স্ট্যাটফোর্ড সাহেবকে সেলাম পেশ করতে হবে—খেয়াল রেখ।

স্যামুয়েল হেনরী স্ট্যাটফোর্ড সাহেবের ছাব্বিশ বছর কাটল ইণ্ডিয়াতে। তবু গরমে অভ্যস্ত হতে পারলেন না। তাঁবুর ভেতর টেবিলে বসে কি লিখছিলেন। ডাক্তারবাবু ভেতরে ঢুকতে বললেন,—অনেকদিন বাঁচবে তুমি, তোমার কথাই ভাবছিলাম। সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের হাতের ব্যথাটা তুমি দেখবে।

—দেখব স্যার।

—চিতাবাঘের আঁচড়—একটু গোলমাল হতে পারে কি?

মনে হয় না। বাচ্চা বাঘত'?

—বড় ill-fated কুচ এবারকার। তোমাকে ত' বলেছি গাঙ্গুলী, ঐ লোকটাকে তুমি

ছাড়ো। ও সঙ্গে থাকলেই গোলমাল সুরু হয়।

—সেত' অসুখ হয়ে ছুটিতে চলে গিয়েছে স্যার।

সাহেব পাইপ নামিয়ে বলেন,—কিছু বলবে আর?

—হাঁ—বলে খুদাবক্সের কথাটা পেশ করেন তিনি। খুদাবক্স তাঁর নির্দেশে ঘরে ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়। একটু অবাক হয়ে দেখেন সাহেব। বলেন,—যাও। ঠিক আছে। গাঙ্গুলীকে বলেন,—এ রকম striking চেহারা, good carriage. He is not used to serve বলে বোধ হয় গাঙ্গুলী। কোন গোলমাল করবে না ত?

—সামান্য ক'টা দিনের জন্যে।

—ঠিক আছে। Serve করেনি কথা কেন বললাম জানো? আমি ছাব্বিশ বছর ধরে তোমার দেশের লোকদের দেখছি। কোনো নেটিভ সাহেবের সামনে ওভাবে দাঁড়ায় না। How free he looks. You know me quite well. তাই ভুল বুঝবে না এরা বেশীদিন serve করতে পারে না। Better under Native States, ফৌজী জীবনে চলতে পারে না।

গাঙ্গুলী চলে আসেন। অন্য সাহেবদের কথা আলাদা। স্ট্যাটফোর্ডকে তিনি ভাল-ভাবেই জানেন। ভারতীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের জন্য, সরলতা ও সংবেদনশীল স্বভাবের জন্য তিনি ভারতীয়দের মধ্যে যতটা প্রিয়, ততটা স্ব-জাতীয়ের মধ্যে নন্। মীরাট, এলাহাবাদ ও বেনারসে ক্যাণ্টনমেণ্ট ক্লাবে তাঁকে দোস্ত সাহেব নামে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়, তাও তিনি শুনেছেন। স্ট্যাটফোর্ডের রেজিমেণ্ট তাঁকে ভালবেসে রিসালার দোস্ত বলে। সেই নামই কি অন্য ভাষণ পেয়েছে সাহেবমহলে? স্ট্যাটফোর্ডের কথাটা হয়ত' সত্যি। অনেক দেখেছেন তিনি, বেশী দেখেছেন ভারতীয়দের। হিন্দী, হিন্দুস্তানী এবং তাঁর প্রথম কর্মস্থল রাজস্থানের কিছু স্থানীয় ভাষাও তিনি জানেন। রিটায়ার করার পরে রেওয়া ও পান্নার জীবজন্তু ও পাখীর ওপর একখানা প্রামাণ্য বই লেখবার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করছেন। সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে আগে গলা ঝেড়ে উপস্থিতি জানালেন। ব্রাইটের মেজাজ স্ট্যাটফোর্ডের থেকে একেবারে আলাদা। জড়িত কণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়েই তাঁকে ঢুকতে বলল বলে বোধ হল।

ফৌজের জীবন বড় আগ্রহের সঙ্গে দেখে খুদাবক্স। একেবারেই নতুন রকম লাগে।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার খানা তুমিই বানাবে'ত?

—আপনাদের যা আদত্।

কি বুঝেছিলেন ডাক্তারবাবু কে জানে, তাঁর সাফাখানার মুসলমান বেয়ারা খুদাবক্সকে খানা পৌঁছে দিয়ে গেল তাঁবুতে।

ভোরবেলা উর্দি বাজে, তখন উঠে পড়ে ফৌজ। বাঁশীর পরেই ড্রাম বাজে। সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরে, বন্দুক নিয়ে সিপাহীরা প্যারেড্ করে।

বানিয়ার তাঁবুতে এগারোটার সময় সিধা নিতে যায় সিপাহীরা। বানিয়া সিপাহী ও রিসালার সওয়ারদের মেপে মেপে সিধা দেয়। অড়হরের ডাল আর আটা, লবণ আর সামান্য ঘি। এই একই খাদ্য দিনের পর দিন দুই বেলা। কেন রোজ একই খাবার খাও? জিজ্ঞাসা করেছিল খুদাবক্স একদিন। পরমেশ্বর আহীর তার দিকে চোখ মট্‌কাল। অর্থাৎ প্রশ্ন কোর না। পরে বলল,—বৃহস্পতিবার প্যারেড নেই, সাহেবরা শীকার খেলতে যাবেন, নারায়ণপুরের ঠাকুরসাহেব নেমন্তন্ন করেছেন। সেদিন গল্পসল্প করব।

কেউ যেন কাউকে বিশ্বাস করে না। জাত, জাত, জাতের কথা খুব শোনে খুদাবক্স। ভাবে, জাতের মধ্যে দুটোত' জাত দেখলাম। কিছু মানুষ ভালো, আর কিছু মন্দ। হাঁ, হিন্দু মুসলমানও জানি। কিন্তু এখানে এসে অনেক ভাগ বিভাগের নজীর পেল খুদাবক্স। পুরবিয়া হিন্দুস্থানীরা এসেছে প্রধানত এলাহাবাদ, অযোধ্যা থেকে। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, আহীর বা গোয়ালা ও গড়েরিয়া আছে। ফৌজে এরা ভালো ভালো পদে আছে। আবার তারাই সুবেদার, জমাদার ও হাবিলদার হতে পারে যারা একটু ভাল ঘর থেকে এসেছে। এরা মাছ মাংস খায় না। এক বেলা আহার করে। জাতের গর্ব একটু রাখে।

শিখরা ভাল সিপাহী হয়। তারা নিজেদের মধ্যে থাকে, মাংস খেতে আপত্তি নেই। কিন্তু নিজেরা জবাই করলে তবেই, অন্যথায় মাংস তাদের কাছে অস্পৃশ্য।

গুর্খারা এক আশ্চর্য জাত। বেঁটে, পেশল চৌকো শরীর, ছোট ছোট চোখ। এরা এসেছে নেপাল থেকে। ইংরেজ অফিসাররা গুর্খা আর শিখদের ভারী খাতির করেন। বড় পরিশ্রমী আর স্বল্পে তুষ্ট থাকে গুর্খারা। মাছ, মাংস, বুনো শুয়োর, যা যখন সংগ্রহ করতে পারে খায়।

পাঠান, আফগান ও মকরানী মুসলমান ভালো সওয়ার হয়। তারা দুবেলা আহার করে।

জাত নিয়ে বড় কথা হয়। এ ওর সঙ্গে খাওয়া-পরা ওঠা-বসা করে না। গুর্খাদের নিয়ে শিখরা হাসে। শিখদের দেখে গড়েরিয়ারা ঠাট্টা করে।

সাহেবদের তাঁবুতে, বাবুর্চিখানার সামনে, মেস-তাঁবুতে, সাফাখানার সামনে, উর্দি তাঁবুতে, সর্বত্র পাহারা দেয় সিপাহীরা। ডিউটি পড়ে তাদের। ছোকরা একজন সিপাহী, সাফাখানার সামনে দুই ঘণ্টার কাছাকাছি পায়চারি করছে পা গুণে গুণে দেখে একদিন খুদাবক্স বলেছিল,—বোস না তুমি! থকে গেছ ত?

—এরকম বলবেন না খাঁ সাহেব। জমাদার সাহেব জানলে আমারই কোর্ট্‌মার্শাল হয়ে যাবে।

গাঙ্গুলী বলেছিলেন,—দুঘণ্টার ভেতরে একবার থামলে কি বললে কোর্টমার্শাল হয়ে যাবে তা-ও যেমন সত্যি, না বসলেও কোর্টমার্শাল হতে পারে। কেউ যদি রিপোর্ট করে যে তুমি ওকে বসতে বলেছ, বেত খেতে ও-ই খাবে। কেন না জমাদার বলবে নিশ্চয় ও তোমার কাছে কোন রকমে ওর যে পরিশ্রম হচ্ছে, সেই অভিযোগ করেছে, নয় তো তুমি বলবে কেন?

—সে ত অন্যায় হবে।

—এই রকম করে সিপাহীদের ছলছুতো দেখাতে পারলে জমাদারের উন্নতি হবার ভরসা থাকে।

বেতমারবার বহরও একদিন দেখল খুদাবক্স। দুজন রিসালার সহিস নাকি বাবুর্চিখানা থেকে আলু চুরি করেছিল। শাস্তি ঠিক হল পাঁচ ঘা ক'রে বেত। শুনে মনে হল সামান্য। কার্যকালে দেখা গেল এমন কাতরভাবে কাঁদছে সহিসরা যেন তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুজন সিপাহী তাদের ধরে নিয়ে এল। চামড়ার জোড়া বেত অপেক্ষা করছিল। তুলে নিল তার একখানা রিসালার সুলতান। মিনিট দশেক সময় মাত্র। কিন্তু খুদাবক্সের মনে হল মনুষ্যত্বের কোন দোহাই আর রইল না। মানুষকে একেবারে নগ্নভাবে

অসহায় ক'রে ফেলে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হল কে জানে!

বেতমারা হচ্ছিল সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের তত্ত্বাবধানে। স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড ঠাকুর সাহেবের নিমন্ত্রণ রাখতে গেছেন। বেতমারা হয়ে যাবার পর গাঙ্গুলী সহিস দুজনকে সাফাখানার তাঁবুতে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। ব্রাইটের প্রশ্নের জবাবে বললেন—এখন ত' ওদের ওষুধ লাগিয়ে দেওয়াই দরকার। পরে সাফাখানার তাঁবুর বাইরে একটা তৈলাক্ত মোলায়েম গলা শোনা গেল—ডাক্তারসাহেব আছেন?

ছোট ছোট চোখ, কালো রঙ দাস্য সুখে পরিতৃপ্ত চেহারা লোকটাকে দেখেই কি রকম যেন লাগল খুদাবক্সের। গাঙ্গুলী তার হাতের শিশিটাতে খানিকটা মলম ভরে দিতে দিতে বললেন—সুখচাঁদ আর বংশীকে ধরিয়ে দিয়েছে কে, তুমিই ত? তুমি রূপচাঁদ না?

—হাঁ হুজুর আমিই। মেহেরবান আপনি নাম মনে রেখেছেন। চুরি করছিল হুজুর।

—আলুর সের দু-পয়সা রূপচাঁদ, আর সুখচাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছে। শরম আসে না তোমার?

তেমনি হেসেই লোকটা বলল,—ভুল হয়ে গেছে হুজুর। কোম্পানীর ওপর চুরি দেখে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল হুজুর।

যখন ফৌজে সিপাহী হয়ে ঢুকেছিলাম, ভেবেছিলাম সুবেদার হয়ে বেরুব। সাত বছর হয়ে গেল। এখন বুঝি সুবেদার আমি আর হব না। মাসে সাত টাকা মাইনেতে ঢুকেছি। খাইদাই, কাপড়-লত্তা বাবদ বেনিয়া মুদীর খাতা চুকিয়ে হাতে পেয়েছি বড়-জোর এক টাকা, কি দেড় টাকা। এমন অনেক মাস গেছে যখন এক আনাও মেলেনি। বেনিয়ার ধার শুধে সাত টাকার একটা পয়সাও বাঁচেনি। কোম্পানীর হয়ে খাট্‌লাম, লড়লাম, চাবুক খেলাম, আর সারা জীবনটা ডাল রুটি খেয়েই কেটে গেল। ঐ দিন তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে, কেন ডাল রুটি খায় ফৌজ। জানবে, যে সব্‌জী বাড়ীতে আমরা হরদম চাষ করি, এখানে তা মেলে না। তরকারী সেই খাবে, যার পয়সা আছে। ঘরে টাকা পাঠাতে পারব এই ভরসায় ফৌজে এসেছিলাম, কিন্তু হাতে করে টাকার চেহারা না নিজে দেখলাম, না ঘরে কেউ জানল, সাতটা টাকা কি রকম দেখতে!

ঝর্ণার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে তিন চারজন সিপাহীর সঙ্গে কথা বলে খুদাবক্স। একটা চরম হতাশার ছবি কথায় এঁকে চুপ করে গিরধারীলাল। পরমেশ্বর আহীর বলে,—এসেছিলাম আঠারো বছর বয়সে। অযোধ্যাতে গণ্ডক নদীর ধারে আমার গ্রাম। আমের জন্যে আমাদের জেলার খুব নাম। যদি মাসে পাঁচ টাকা কামাতে পারো ত' রাজার মতো থাকবে আমাদের গাঁয়ে। আমার বাপের দুই বিয়ে। মা-কে বাবা বড় কষ্ট দিয়েছিল। তাই ভাবতাম মা-কে আমি সুখে রাখব। জ্যেঠাইন-মা আমাকে আর মা-কে শুতে ঘর দিত না। ঝোপড়ীতে শীতের মধ্যে দুজনে তুঁষের বোরা চাপা দিয়ে ঘুমোতাম আর ভাবতাম, একটু জমি, একখানা ঘর, দুটো বকরী, একটা ছোট বৌ—পঞ্চাশ টাকা যদি জীবনে কামাতে পারি ত' এইসব হবে। কিন্তু কিছুই হলো না। আট বছর ধরে কাজ করছি, পায়ে হেঁটেছি কম ক'রে ক-হাজার মাইল হবে। জলে ভিজেছি, রোদে পুড়েছি, অনেক তক্‌লিফ করলাম। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ টাকা আজও ছুঁতে পারলাম না।

—রিসালার সওয়ার কত পায়?

—সিপাহীর অনেক বেশী। খাতায় লিখা পায় সাতাশ টাকা, হাতে পায় নয় টাকা। সহিস, ঘোড়া, এদের খরচ থেকে সুরু করে, তাঁবু, কাপড়, ধোবি, নাপিত, সব টাকাই কেটে যায়। রিসালাতে ঢুকতে অনেক টাকার ধাক্কা। দুইশো আশী টাকা ঘোড়ার জন্যে দিতে হয়, আর দেড় মাসের মাইনের টাকা দিতে হয় আমানত ফাণ্ডে। তিনশো থেকে চারশো টাকা ঘর থেকে না আনলে সওয়ার বানায় না কোম্পানী।

সকলেই বলে,—বড় পরেশানীর কাজ। না করেছ, ভালো আছ। যদি ঘরে জমি থাকত, টাকা থাকত, ঠিক ঠিক মতো পেঁছাতে পারতাম সে সব ভেট, তাহলে হয়ত উন্নতি হত আমাদেরও।

এই দিনের গল্পকথা এটাই। এই ফৌজী জীবন এক দিল্লীর লাড্ডু, যে খেয়েছে, আর যে খায়নি, সবাই পস্তিয়েছে। এ-ও বোঝে খুদাবক্স, যা সে শুনল, সবই বাইরের কথা। ভেতরে আরো অনেক গলতি আছে, অনেক কথা জমা আছে। সহজ স্ফূর্তির অভাব। স্বচ্ছন্দ জীবনের অভাব। অনেক আশা আকাঙ্খা সমাধি পেয়ে যাবে এ কথাও যেন জানা হয়ে গেছে, এমনি ধারা ক্লান্তি এইসব মানুষের চোখে লেখা আছে।

পাশাপাশি আরেকটা জীবনস্রোত প্রবহমান।

কুচে এসেছেন সাহেবরা, এক একজনের জন্যে পাঁচটা ক'রে তাঁবু পড়েছে। বসবার কামরা, খানা-কামরা, শোবার কামরা, গোসলখানা। আসবাব এসেছে খাট, টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, তিনটে বড় ঘোড়া, সাত আটজন সহিস তাদের দেখাশোনা করছে। পাঁচ ছয়টা টাট্টু ঘোড়াও রয়েছে। সাহেবদের আসবাব উটে বয়ে এনেছে। বেয়ারা, বাবুর্চি, মশালচী, খানসামা সর্বদা সাহেবদের সুখবিধানে ব্যস্ত। বিলিতী মদও দুষ্প্রাপ্য নয় হল্‌টে। গ্রাম থেকে ঠাকুর সাহেবের লোকরা বয়ে আনে হরিণের মাংস, খাসী, বড় বড় মাছ, ফল, ঘি, দুধ। প্রত্যহ খাবার সময়ে বাজনা বাজে মিঠেসুরে। বিকেলে কোনদিন এমনিই ঘোড়া চড়েন সাহেবরা, কোনদিন শিকার খেলতে যান জঙ্গলে। তখন সিপাহীরা গ্রামবাসীদের জুটিয়ে আনে। টিন বাজিয়ে জঙ্গল তাড়িয়ে বরাহ ও হরিণ বের করে, কখনো বেরিয়ে আসে চিতাবাঘ। শিকার খেলতে গিয়ে দুটো একটা বে-কায়দার ঘটনা বে-নজীর নয়। তখন টাকা দিতে হয় কিছু। মিটে যায় হাঙ্গামা।

ফিরতি পথে সাহেবদের জোশ্ বেড়ে যায়। গ্রামে পড়েছিলেন, ক্লাব আর সভ্যজগতের মধ্যে ফিরতে না পারলে স্বস্তি নেই। জোরে জোরে আরো জোরে চলতে পারে না কেন এরা? তেজী ঘোড়ার পিঠে বসে, বড়ই অধৈর্য লাগে, মনে হয় কুচের কদম বড় মন্দা। মনে হয়, দেশের জন্যে কি স্বার্থত্যাগটাই না করছি। কোন দূর দেশে, এই যে পথে জঙ্গলে, গ্রামে, কত অবস্থার মধ্যে চলছি, একি কম কৃতিত্বের কথা। এরপর ক্লাবের একটা সন্ধ্যা, তার দাম-ই অনেক। একজন আর একজনকে মন্তব্য করে,— বাজি ফেলে বলতে পারি, নেটিভগুলো তাদের রেজিমেণ্ট বাজারের মেয়েমানুষগুলোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—You mean those licensed ones? —বলে দুজনেই হাসে।

সিপাহীরা তিনজন মিলে একটা ক'রে তাঁবু বয়। শবদেহ বহন করবার মতো ভঙ্গীতে। ধীরে ধীরে চলে। খালি পা, খাকি পট্টি জড়ানো, টেনে টেনে চলে। যতদূর দেখা যায় সিপাহী আর রিসালা, লাইন-ডুরি গার্ড, রসদ গার্ড, ভিস্তি, মেথর, দফাদার, জমাদার, নায়েক, সকলের একটা বিরাট মিছিল। চলবার যান্ত্রিক ছন্দের মধ্যে ফৌজী জীবনের

অনেক ইতিহাস লেখা আছে।

পথ, পথ, আর পথ! বড় বড় চওড়া সড়ক বাঁধিয়ে আম্বালা, মীরাট, কানপুর, কর্ণাল, আগ্রা, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা, এদিকে সাগর, নীমাচ, জব্বলপুর, কোথাও আর তফাৎ রাখেনি কোম্পানী। সব দূর এক হয়ে গেছে। যত পথ, তত অনির্দিষ্ট যাত্রা। সব সময় চলো তাল রেখে, সোজা হয়ে, সাহেবদের সম্মান বাঁচিয়ে।

সিপাহী থেকে সুবেদার, সওয়ার থেকে পেহেলা রিসালদার, এই স্বপ্ন সামনে থাক। তাকে নিশানা ক'রে চল। চলতে চলতে একদিন চলা ফুরিয়ে যাবে। তুমি হয়তো ঠিকানা মতো কবর অথবা চিতায় পেঁছে যাবে, তাতে এই মিছিল থামবে না। ভালো সাহেব, মন্দ সাহেব, দয়ালু, রাগী, হিংস্র অথবা যে কোন মেজাজেরই হোক না কেন, কোন না কোন সাহেব তোমাদের ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবে। অর্ডার ঠিক পেয়ে যাবে।

তার পরে যদি জিজ্ঞাসা জাগে মনে? যদি মন ও হৃদয় বুভুক্ষু হয়? সে জন্যও ব্যবস্থা আছে। ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স পাওয়া কিছু বিলাসিনী রাখে সরকার। চালাঘরে কুপীর আলোয় তার কাছে বসে মাইনের টাকা তুলে দিয়ে কিছু নিরালা মুহূর্ত কিনতে পারো তুমি। সকালে বাজারে তাকে দেখলে হয়তো তোমারই ঘৃণা হবে, দুঃখ হবে। তাতে কারো এসে যাবে না।

এই জীবন কাটাতে কাটাতে রক্তে ও মজ্জায় এই বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসবে, যে সাহেবরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমরা তাদের নীচে। তখন সহজ হবে সেলাম করা, আনুগত্যের হাসি আপনিই ফুটবে। আর প্রশ্ন করবে না। সেই দিন এখনও অনেক দূরে। তাই সাহেবদের চেষ্টার অন্ত নেই।

এলাহাবাদ কাছে আসতে গাণ্ডুলীবাবু জানতে চাইলেন—খুদাবক্স কাজ করতে রাজী আছে কি না। কোন কাজ কি সে চায়?

খুদাবক্স মাথা নাড়ল। ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু সে কাজ করবে না। একটা কথা জানতে তার ইচ্ছে করে, দেশঘর ছেড়ে এতদূরে কাজ করেন ডাক্তারবাবু, তাঁর ভালো লাগে?

ডাক্তারবাবু বলেন,—আমার কাজটা ত' ভাল। আর সবাই যদি সব সুবিধার কথা ভাববে খুদাবক্স তবে রুগীর রোগ সারাবে কে? রোগ ত' সারাতে হবে, ব্যথা ত' আরাম করতে হবে?

অকাট্য যুক্তি। সশ্রদ্ধ হয়েই স্বীকার করে খুদাবক্স। তা যদিও মানা গেল, তবু এ কাজে কি তাঁর মন তুষ্ট হয়?

তখন ডাক্তারবাবু যে কথা বলেন, বড় মূল্যবান মনে হয় সে কথাগুলো খুদাবক্সের কাছে। তিনি বলেন,—তুমি তরুণ, আমি প্রৌঢ়। তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে যা মনে করি তাই বলছি। আমি কার নোকরী করছি তা বেশী ভাবি না খুদাবক্স। আমি কি কাজ করছি, তাই ভাবি। আমার ভাবনা আমি ভাবব কেন? সে কথা নিশ্চয় ভগবান ভাববেন। আমার শুধু মনে হয়, এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অবিচার, এত যন্ত্রণা, যদি এতটুকু আরাম করতে পারি, যদি এতটুকু ভালো করতে পারি। চেষ্টা করতে ত' দোষ নেই।

বড় দামী কথা। স্পর্শ করে খুদাবক্সকে। সে বলে,—ডাক্তারবাবু, আপনার মতো

যদি আমিও পারতাম! আমি যে তা পারি না।

ডাক্তারবাবু বলেন,—তোমার সঙ্গে আলাপই হল না, স্বল্প পরিচয়, তুমিও চলে যাচ্ছ। কোথা থেকে এলে, কি তোমার পরিচয় কিছুই জানি না। ভাগ্যে থাকে আবার দেখা হবে। তারপর হেসে বলেন,—আমার রিটায়ার করবার আর চার বছর আছে। তারপর কলকাতা যদি না ফিরি'ত এখানেই কোথাও রয়ে যাব। তখন দেখা হতে পারে।

কলকাতার নামই শুনেছে খুদাবক্স।—খুব বড় সহর, তাই না?

—খুব বড় সহর। সাহেবদের আসল ঘাঁটি সেখানে। অনেক ঘরবাড়ী, অনেক মানুষ।

খুদাবক্স ডাক্তার গাঙ্গুলীকে অভিবাদন জানায়। ডাক্তারবাবু দেব দেব করেও কিছু টাকা হাতে তুলে দিতে পারেন না তাকে। কেমন যেন মনে হয়, তাকে অপমান করা হবে।

ফিরবার সময় পরমেশ্বর আহীর একটু আন্‌মনা হয়ে যায়। বলে, আমার কথা মনে রেখ।

ফিরতে ফিরতে খুদাবক্স ভাবে কোন্ কথা? কোন্ কাহিনী? এক একটা মানুষের জীবন একটা কাহিনী। একখানা ঘর, একটু ক্ষেত, একজন মল-বাজানো ছেলেমানুষ বৌ—এই স্বপ্ন ভেঙে ভেঙেই গেল পরমেশ্বরের চোখে, শুধু পঞ্চাশ টাকার জন্যে। আট বছর ধরে খাতায় কলমে ছয়শো' সত্তর টাকা রোজগার করল পরমেশ্বর, হাতে তুলে পেল একশো টাকা। এ গল্প ত' কম আশ্চর্য নয়। আরো বিস্ময়ের এই যে এ কথাও সত্যি।

আবার এই ফৌজী জীবনেই ডাক্তারবাবুর মতো লোকের দেখা মেলে, এও কম অবাক কথা নয়। অসঙ্গতি, অন্যায় ও অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নীরবে অবিচলভাবে মনুষ্যত্বের কাছে কর্তব্য ক'রে যাবার মধ্যে যে হিম্মৎ আছে, তা খুদাবক্সকে কম স্পর্শ করেনি। ডাক্তারবাবু তার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

তারপরে খুদাবক্স পৌঁছয় পরন্তপের কাছে। শুধু দাঁড়ই নয়, ঘোড়াও জোগাড় করেছে ইতিমধ্যে পরন্তপ। কিছু টাকা জলখাই দিয়ে হুকুমনামাও বের করেছে ফৌজী দফ্‌তর থেকে। ফৌজকে ঘোড়া বেচবার এজিয়ার তার মিলেছে। তার ও খুদাবক্সের জন্যে একখানা নীচু দোতলা বাড়ী, পাশে ঘোড়ার আস্তাবল। ছয়জন সহিস, চারজন চাকর। অবশ্য আস্তাবলটা পুরানো, বাড়ীর নীচটা শুধু শালকাঠের খুঁটি, মই দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়, বৃষ্টি হলে নীচ দিয়ে ধুয়ে চলে যায় জল, তাতেই বা কি! চাকর আর সহিস নাকি পরন্তপ পেয়েছে তার কোনো খুড়শ্বশুরের কাছ থেকে। মারা গেছেন তিনি, এদের লালন-পালনের ভার দিয়ে গেছেন পরন্তপকে। জামাইবাড়ীতে কাজ করে জামাইকে লজ্জায় ফেলে না তারা, অধিকাংশ সময়ই ধুতুরো পাতার বিড়ি খেয়ে ঘুমোয়, কিন্তু তাতে কি! তাদের থাকবার ঘরটাই খুব গর্ব ক'রে দেখায় পরন্তপ। মেঝেতে তক্তা দিয়ে ফুটো ঢাকা আছে। পূর্ববর্তী মালিককে নাকি ডাকাতরা, ঐ ফুটো দিয়ে বর্শা খোঁচাত।

—কিন্তু কি জায়গা ভাই, তারিফ্ ত করো! বলে জানলা খুলে দেয় পরন্তপ। চোখ জুড়িয়ে যায় খুদাবক্সের। শেরশাহী সড়ক চলে গেছে প্রায় সামনে দিয়ে। পেছনে যমুনা নদী, পূবে এলাহাবাদ, উত্তর-পশ্চিমে কানপুর। তাদের ঘরের ঠিক পেছনেই একটি স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনী বয়ে গেছে। তার পাশে পাশে বড় বড় কালো পাথর। সেখান থেকে জল ভরে গোয়ালিন্ মেয়েরা। রাখাল স্নান করায় মহিষকে। এইসব অখ্যাত নদী-গুলো যেন গাঁয়ের মেয়েদের মতো। কল্যাণী অঞ্জলিতে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে চলেছে এরা অবিরাম। আসন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুয়াশাচ্ছন্ন করুণ দিগন্ত। এমনি দিনে ঘর, প্রিয়জনের

সঙ্গ, কাঠের আগুনের সামনে বসে গল্পগুজব এই ভালো লাগে। যার ঘর নেই তার পক্ষে এই চিন্তা বিলাস বই কি!

রাতে বসে বসে পরন্তপকে কিছু কথা বলে খুদাবক্স। শুধু মোতির প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করে। বলে,—কাজ দিতে পারো? অনেক কাজ, যাতে সব ভুলতে পারি, কখনো নিজের কথা মনে না পড়ে?

পরন্তপ বলে,—কাজের দিন সবে সুরু হল খুদাবক্স। এখন তুমি অনেক কাজ পাবে।

রিসালায় ভর্তি হতে যখন সওয়ার আসবে তখন সাহেব জিজ্ঞাসা করবে—রুপেয়া মজুদ্ হ্যায়? দুইশো' টাকা সওয়ারকে ঘর থেকে আনতে হয়। সে বলে—হাঁ হুজুর, হ্যায়। তার টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনে দেওয়া হয় সওয়ারকে। সেই ঘোড়া সরবরাহ করবার অনুমতি মিলেছে পরন্তপের। আপাতত দশটা ঘোড়া আছে। আগ্রা থেকে দিন দশেকের মধ্যেই আরো ঘোড়া এসে পড়বে। তারপর চাহিদামত খবর আসবে ফতেপুর, বিন্দ্‌কি, কাল্পী ও হামীরপুর থেকে। ঘোড়া নিয়ে পৌঁছবে কখনো খুদাবক্স, কখনো পরন্তপ। অনেক দূর ভেবেই সড়কের ওপরে জায়গা বেছে নিয়েছে পরন্তপ। এই পথ যোগ করেছে উত্তর হিন্দুস্তানের বড় বড় সহরগুলো। এই পথ দিয়ে ডাক চলাচল করবে, কুচ যাবে, যাত্রী যাবে, সব খবরাখবর পাবে তারা।

—এ কাজে অনেক টাকা দরকার, তাই নয়?

পরন্তপ গভীর চোখে তাকাল। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট একটা পেটি এনে নামাল। বলল,—খুলে দেখ। খুদাবক্স নড়ল না। পরন্তপ নিজেই খুলে ফেলল পেটি। তুলে ধরল একমুঠো সোনা ও রুপোর টাকা। বলল,—এখানে তিন হাজার আছে। যখন দরকার হবে টিকমগড় থেকে টাকা আসবে আরো। তোমাকে সব কথা বলিনি খুদাবক্স। টিকমগড়ে আমার একটা গদী আছে। পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা যে কোন সময়ে আমি যোগাড় করতে পারি। কিন্তু রাহী মানুষের কাছে বেশী টাকা থাকা ত' কাজের কথা নয়?

খুদাবক্স বলল,—আমাকে এত কথা বলছ পরন্তপ, তুমি আমাকে কতটুকু জানো?

—সে দায়িত্ব আমার।

—বেশ, মানলাম। কিন্তু পরন্তপ, আসল কথাটা এবার বল। শুধু শুধু ঘোড়ার কারবার করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছ কেন? এর মধ্যে কি ফন্দী আছে? সেটা ভাল, কি মন্দ?

—চোহান কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না। বলে অনেকদিন পর হা-হা ক'রে হাসল পরন্তপ। বলল,—হবে সব কথা হবে।

—এখনই হোক না কেন?

—দাঁড়াও। বলে একটু আগুন জ্বালাল পরন্তপ। মাঝখানে রাখল তার তরোয়াল। বলল,—খুদাবক্স, তোমার আর আমার দুই ধর্ম, এরকম শুনি, কিন্তু আমি মানি না। তাহলে তোমার আর আমার এই দোস্তি সম্ভব হত না। তুমিও যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা, তোমার আর আমার কাছে এই তরবারি পরম পবিত্র। তাই একে সাক্ষী ক'রে বল, যা শুনবে তা দ্বিতীয় লোকের কাছে বলবে না।

খুদাবক্স ছুঁল না। তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষ্ ক'রে বলল,—পরন্তপ, আমি মেয়েমানুষ নই, যে নিশানা ছুঁয়ে শপথ করব। আমি নিজের জবানকে দমন করতে জানি।

অধর দংশন করল পরন্তপ। বলল,—খুদাবক্স, তুমি অনেক আদত জয় করেছ, আমি বুড়ো হয়েছি। কিন্তু তুমি সহজে অস্বীকার করবার জোর রাখ, এই দেখেই তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি। তবে শোন। আমি আগে ফৌজে ছিলাম, তুমি জান বোধ হয়?

—শুনেছিলাম তোমারই কাছে।

—ফৌজের কিছু তুমি দেখেছ, তা-ও বাইরে থেকে। ও দেখা কিছুই নয়। দেখে থাকবে ইংরেজ আর হিন্দুস্থানের সিপাহীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এ-ও জেন, ইংরেজ এই দেশে এসেছে প্রায় একশো' বছর হতে চলল। তাদের সব আইনকানুন সবাই মনে মনে মেনে নিতে পারেনি। গত তিরিশ বছরের মধ্যে বারবার সিপাহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আখেরে কিছুই মেলেনি। ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে তাদের লড়াই।...গত চার পাঁচ বছরে ইংরেজ কোম্পানী এমন অনেক কাজ করেছে, যাতে খাঁটি হিন্দুস্থানী মনে মনে ভয় পাচ্ছে। এরা জাত মানছে না, ধর্ম রাখছে না, দেশী সরকার-গুলোকে নিয়ে নিচ্ছে একে একে। রণজিৎ সিংহের মতো রাজা, যে নাকি কাশীর বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা মন্দিরের চূড়ো বাঁধতে বাইশ মণ সোনা ঢেলেছিল, যার নামে লাটসাহেব তিনবার কে'পে যেত, তার পাঞ্জাবও হয়ে গেল কোম্পানীর তালুক। ছোটখাটো রাজ্যগুলো ত' বাঘের মুখে হরিণের মতো একে একে চলে যাচ্ছে। একেবারে কায়েম হয়ে বসছে কোম্পানী, আর সব জায়গায় হিন্দুস্থানের মানুষকে একেবারে বিগর দাম, মূল্যহীন ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। কোন কিছুর দাম দিচ্ছে না, না ইজ্জতের, না জানের। কিন্তু একবারে ফুটো টাকা হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই দাম আদায় করবার কথা উঠেছে। অনেক জায়গায় অনেক লোক অনেক কথা ভাবছে। ভাবছে সুবিধে হলেই এই কোম্পানীকে মেরে তাড়াতে হবে। ফৌজের মধ্যে অনেকেই গরম হয়ে আছে। এ কথাও শোনা গেছে যে ফৌজকে যদি না টানা যায় ত' কিছু হবে না। কেননা, ফৌজের হাতে আছে কামান, বন্দুক, তোফখানা। আমার চেনা জানা কিছু মানুষ, আর আমি, মাঝে মাঝে কথা বলে দেখেছি। ঠিক হয়েছে চেষ্টা করতে থাকব। ফৌজের সঙ্গে মিলব, মিশব, আসব, যাব, খবর করব।

—তারপর?

—তারপর দেখা যাবে কি হয়। তাই এই মৌকা নিয়ে নিয়েছি। এখন শুধু দেখে যাবার সময়। আসল কাজের সময় পরে আসবে। কারণ কেউ তৈরী নেই, দেখছ না? আমার মুখে শুনলে বলে তাই, আমার মতন জেনো কম ক'রে কয়েক হাজার মানুষ আছে।

পেছনের নদীটার নাম চুণারকি। তাই নিজেদের ডেরার নামকরণ করে পরন্তপ—চুণারকি-রিসালা হল্‌ট। ধীরে ধীরে চুণারকি-রিসালা হল্‌ট একটি পরিচিত ঘাঁটি হয়ে ওঠে। মুৎসুদ্দীর চিঠ্‌ঠা নিয়ে লোক আসে, চৌথা রেজিমেণ্টে দশটা ঘোড়া চাই, বিন্দ্‌কীর পহেলা রিসালদার নিজের জন্যে দু'টো ঘোড়া চান। ঘোড়া নিয়ে সহিস নিয়ে খুদাবক্স বা পরন্তপ চলে ছাউনীতে। পুরানো ফৌজী বাপ ছেলেকে নিয়ে নাম লেখাতে আসে রিসালাতে। গাছের তলায় রান্নাবান্না ক'রে খায় তারা, কিষাণ ঘরের ছেলে সরল চোখে দেখে ছাউনীর কাণ্ডকারখানা। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হলে ঘোড়া কেনে, দেড়শো থেকে দুইশো টাকা দিয়ে, আশী টাকা জমা দেয় চাঁদা ফাণ্ডে, জিনপোষ, লাগাম, এইসব বাবদ। দুই নম্বর রিসালদার সাহেব দাঁড়িয়ে থেকে এই সব কেনাবেচা করান। বাপ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে থলি থেকে গুণে গুণে টাকা দেয়। এই টাকা শেষ জীবনে ফেরত পাবার কথা জেনেও সে স্বচ্ছন্দ

বোধ করে না। টাকা দেবার পর বাইরে এসে যখন খাই দাই-এর প্রসঙ্গ ওঠে, তখন প্রাণে ধরে এক পয়সার সব্‌জী কিনতেও চায় না সে। ছেলেকে ধমক দিয়ে বলে—আজকের মতো আচার দিয়ে রুটি খা! তারপর ছেলেকে ভজিয়ে রেসাইদারকে আর একে তাকে কিছু কিছু দর্শনী দিয়ে খুশী রাখে।

টাকা নিয়ে খুদাবক্স সহিসদের খাবার ছুটি দেয়। পরন্তপের শেখানো কায়দায় বাজার থেকে খাসী, মাছ, দুধ, ঘি, সব্‌জী কিনে ভালো সাজিয়ে রিসালদার মেজর সাহেবকে ভেট লাগায়। তাঁর সন্তুষ্টিতে কিছু প্রশ্রয় মেলে। তারই জোরে অল্প-স্বল্প গল্প করে ফৌজের সঙ্গে। কাছাকাছি গাঁ যাদের, তাদের চিঠিও কখন পেঁাছে দেয়।

শেরশাহী সড়ক বিশ্রাম জানে না। বাদশাহ শের শাহ, যাঁর মতো শাসক দিল্লীর সিংহাসনে বসেনি, তাঁর অক্ষয় কীর্তি এই বিশাল সড়ক। গোটা উত্তর হিন্দুস্থানে আর তফাৎ রইল না, সব দেশে দেশে যোগাযোগের সেতু বাঁধল এই পথ। পাশাপাশি গাঁয়ের ঠাকুর সাহেব বা তালুকদার যখন কীর্তি অর্জন করতে চায়, এই পথের ধারে তারা গাছ বোনে, সরাইখানা বসায়, ইঁদারা খুঁড়ে দেয়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে জলসত্র খোলে। তাপিতকে ছায়া দাও, তৃষ্ণার্তকে জল দাও, পরিশ্রান্তকে দাও রাতের মতো আশ্রয়। ধর্ম হবে, পুণ্য হবে, মুক্তি পাবে।

এদিকে কোন অতন্দ্র-জাগর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে এই পথ, চলাচল সেখানে থামে না। কোম্পানী বাহাদুরের ডাক আসে, ঘোড়ার পিঠে, গাড়ী ক'রে, রাণারের কাঁধে। কোন রেজিমেণ্ট কুচকাওয়াজ ক'রে চলে। রিসালা রেজিমেণ্টের শত শত ঘোড়া, ইংরেজ অফিসারের ঘোড়া, ভারতীয় অফিসারের ঘোড়া, মালবাহী টাট্টু ও অশ্বেতরের পিঠে তাঁবু, রসদ, পোষাক, উটের পিঠে রসদ, অনেক মানুষ ও জন্তুর পায়ের শব্দে একটা জীবন্ত ঝড় চলেছে বলে বোধ হয়। কখনো ইংরেজ অফিসার পরিবারবর্গসহ স্থানান্তরে চলেন। সাহেবদের সঙ্গে কোন কোন উৎসাহী মেমসাহেবও ঘোড়ার পিঠে চলেন। কখনো তাঁরা চলেন পাল্কীতে। মেম সাহেবের আয়া, দাসী, ছেলেমেয়েদের আয়া, দাই, সাহেবের খানসামা, আবদার, খিদমৎগার, বাবুর্চি, মেটবাবুর্চি, মশালচী, ধোবি, ইস্ত্রীওয়ালা দর্জি, জোরিয়া, সর্দারবেয়ারা, মেটবেয়ারা, পাখাবেয়ারা, মুর্গীওয়ালা, মালী, কুলী, কোচ্‌ম্যান, সহিস, ঘেসেড়া, ভিস্তি, বড়াই মিস্ত্রী, চৌকিদার, দারোয়ান, চাপরাশী, সবাই পেছনে পেছনে চলে সারি সারি গরুর গাড়ীতে। টাট্টু বা উটের পিঠে চলে আসবার ও রসদ। কখনো তীর্থযাত্রায় চলেন কোন রানীসাহেবা। সারিসারি ঘোড়া আগে আগে চলে, পাল্কীতে চলেন রাজপরিবারের বধূ ও কন্যারা। পুরুষরা কখনো পাল্কীতে, কখনো ঘোড়াতে চলেন। দাস, দাসী, আশ্রিত, পরিজন, গরুর-গাড়ী, পাল্কী, ডুলি, সে যেন একখানা নগর চলেছে শোভাযাত্রা ক'রে। কখনো আসে গ্রামের বিয়ের যাত্রীরা। লাল জামা, কাপড়, পাগড়ীতে সাজানো বালক-বরকে সামনে নিয়ে বাবা ঘোড়া বা উটের পিঠে বসে মিছরী ও মোরব্বা বিতরণ করতে করতে চলে, বাজনা বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা যায়, পাল্কীতে বসে নথ ও হলুদরঙের কাপড়-পরা বালিকা-বধূ কাঁদতে থাকে। তাকে সান্ত্বনা দেয় বৃদ্ধা দাসী।

আবার কখনো মহাযাত্রার পথিকদেরও দেখা যায়। নদীতীরে দাহ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চায় না বলে দূর দূর গ্রাম থেকে ডোলা সাজিয়ে, লাল রেশমী কাপড়ে ঢেকে প্রিয়জনকে বয়ে আনে মানুষ। রাম নাম উচ্চারণ ক'রে ক'রে প্রতি পদক্ষেপে শুধু শ্মশানই নয়, স্বর্গকেও যেন কাছে টেনে আনে।

রাহী চলে, কিষাণ চলে, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ চলে, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সবাই চলে এই পথ দিয়ে।

বহু মানুষের পদচারণায় পথ হয়েছে তীর্থ। সেই তীর্থের এক পাশের চুণারকি হল্‌টে আস্তে আস্তে সকলেরই পরিচিত হয়ে ওঠে। কেউ বিশ্রাম করে, কেউ কিছু খাদ্য চায়, কেউ অর্থ চায়, কেউ আসে নিছক গল্প করতে ও সময় কাটাবার জন্যে।

যখন কাজকর্ম থাকে না, তখন পরন্তপ আর খুদাবক্স মাঝে মাঝে চুণারকিতে মাছ ধরতে যায়। একটু এগিয়ে গেলে শিকারও মেলে। কিন্তু শিকারে খুদাবক্সের উৎসাহ আসে না। মাঝে মাঝে পরন্তপ বলে,—কি খুদাবক্স, দিনগুলো ঝুলে যাচ্ছে নয় কি? একটু জোস্ লাগিয়ে দেব?

হৈ চৈ বাধাবার ক্ষমতা তার অপরিসীম। রাস্তা থেকে একদল ভানুমতীর খেল্ যোগাড় করে, সাঁহসরা কাছাকাছি চুণারকি গাঁয়ে খবর দেয়। তামাশা লাগাবে হল্‌টের সামনে, খবর পেয়ে ভীড় জমে যায় চট্‌পট্। ভানুমতীর খেল্, বাঁশবাজী, ভাল্লুক নাচ, বা মুরগীর লড়াই, সবতাতেই মাঝখানে বসে বিচারক হয় পরন্তপ আর খুদাবক্স। টাকা ইনাম দেয়, কখনো কাপড়ও দেয়, তারপর উদার ভাবে মিষ্টি বিতরণ করে।

এইসব বিষয়ে সবচেয়ে আগে ছুটে আসে লখিয়া। চুণারকির গয়লাদের মেয়ে সে। বিয়ে হয়েছে, স্বামী নেয়নি, এমনি কোন গোলমাল আছে। রঙ কালো, স্বাস্থ্য সুন্দর, বয়স বড়জোর পনেরো হবে। গাঁয়ের অনেক ছেলেই লখিয়ার মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত। সেই মনোযোগ পেয়ে লখিয়া খুব আত্মসচেতন হয়েছে। পরন্তপ বলে,—তুমি ওকে ঘায়েল করেছ খুদাবক্স। খুদাবক্স হেসে উড়িয়ে দেয় পরন্তপের কথা।

ভোরবেলা গাছের ফল, সব্‌জী ডালায় ক'রে হল্‌টে বেচতে আনত লখিয়া। একবার মাছ ধরতে গিয়েছিল খুদাবক্স একা, তখন তাকে খুব সাহায্য করেছিল লখিয়া। কলকণ্ঠে গল্প করেছিল, মাছ বয়ে নিয়ে ফিরেছিল চার ঘণ্টা ধরে। পরদিন স্নান করতে গিয়ে খুদাবক্স দেখে, তখনো বসে আছে লখিয়া। বলল,—আজ মাছ ধরবেন না হুজুর? খুদাবক্স না বলাতে মনে হয়েছিল যেন আশাহত হল লখিয়া। কিন্তু তারপরই তার ঘন ঘন আনাগোনা বেড়ে গেল হল্‌টে। কখনো মধু নিয়ে আসে, কখনো আনে পাকা কলা। কখনো এমনিই গল্প করতে আসে। ময়লা হলদে ঘাঘরাটা বিছিয়ে বসে। বলে,—কি করছ, এখানে একলা কেন থাক, তোমার ঘর আছে কি নেই, কখনো বলে, একটা কিস্‌সা শোনাও।

ক্রমে সন্দেহ হল খুদাবক্সের। আরো তাকে সচেতন করল লখিয়ার ভাই দুখ্‌রী। তিন ছেলে মরে গিয়ে সে হয়েছে, তাই তার নাম দুখ্‌রী। খুদাবক্সের খুব ভক্ত এই পনেরো ষোল বছরের কিশোরটি। সে বলল,—খাঁ সাহেব, লখিয়ার সঙ্গে আপনি কথা বলেন, তাতে কি মনে মনে মেনেছে লখিয়া কে জানে, তাকে নিতে আসবে শ্বশুরঘর থেকে শুনেই কান্নাকাটি করছে। আমার আর এক বহিন্‌কে বলেছে ও গাঁয়ে গেলে আপনাকে দেখতে পাবে না, তাই সে যাবে না।

শুনে স্তম্ভিত হয় খুদাবক্স। পরন্তপ ত' তাকে বকে বকে কিছু রাখল না। বলল, —তুমি একটা পয়লা নম্বরের বুদ্ধু। আমার বুড়ো ঘোড়াটারও তোমার চেয়ে বুদ্ধি আছে।

খুদাবক্স বলল,—একেবারে বাচ্চা মেয়ে পরন্তপ, কি বলছ তুমি!

পরন্তপ বলল,—খুদাবক্স, তুমি নিশ্চয় কোন আঠারো বছরের ফাঁদে পড়েছ, তাই ওকে বলছ বাচ্চা মেয়ে! গাঁয়ের মেয়ে, পনেরো বছর বয়েস, সে হল বাচ্চা? কোন্ সহরের মানুষ

হে তুমি?

সত্যি কথা। খুদাবক্স মানল তার যুক্তি। পরদিন কোন কাজে গাঁ থেকে ফিরতে ফিরতে দেখে পথের বাঁকে লখিয়া দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার। তারপর কয়দিন একেবারে এড়িয়ে চলল লখিয়াকে। একবার বিন্দ্‌কীতে থেকে গেল দিন দশেক। এসে জানল লখিয়া চলে গেছে। পরন্তপ বলল,—খুব কেঁদে-কেটে তবে গেছে লখিয়া। শুনে দুঃখই হল খুদাবক্সের। সেই নিতান্ত সরলা গ্রাম্য মেয়েটি তাকে নিশ্চয় মনে রাখবে না উত্তরকালে, তবু খুদাবক্স—অজানিতে হলেও তার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে, সেজন্য নিজেকেই সে অপরাধী মনে করল।

একবার টিকমগড় থেকে বেশ কিছু টাকা আনল পরন্তপ। গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জোয়ানদের খেলা লাগিয়ে দিল। সাতদিন ধরে আজ ভেড়ার লড়াই, কাল মুরগীর লড়াই, ঘোড়দৌড়, বর্শা, তাঁর আর ভাল্লার জোর, পাল্লাছুট, এইসব নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। পরে প্রবীণ বিচারকের মতো জোয়ানদের, তরোয়াল, পাগড়ী, বর্শা এইসব ইনাম দিল পরন্তপ।

এতে ইজ্জত বেড়ে গেল রিসালা হল্‌টের। গাঁয়ের ছেলেদের সহযোগিতা মিলল। মাতব্বররাও খুদাবক্স আর পরন্তপকে নিজের লোক বলে মেনে নিল। সাপে কামড়ালে কি করতে হবে, কার মেয়েটা ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে, কুপাদয়ালের গোঁড়ালেবুর গাছটা ইন্দ্র মিশির প্রয়োজনে কেটে ফেলতে পারে কিনা, কালিযুগ পূর্ণ হলে রামচন্দ্র আবার আসবেন কিনা, কালিয়া কাহারের মোষটা বিক্রী হবে কি রাখা উচিত, এইসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাতে প্রায়ই পরন্তপ মধ্যস্থ হয়। ছোট ছেলেমেয়েরাও নানারকম আরজি নিয়ে আসে। খুদাবক্সের মধ্যস্থতায় দশদিনের বিবাদ মিটিয়ে সুলতান ও রাজু খরগোসের সঙ্গে কাকাতুয়া বিনিময় করে বন্ধুত্ব করে। ছয় বছরের সোনা ও সাত বছরের পণ্ডীর পুতুলের বিয়েতে পরন্তপ পুঁতির মালা এবং মিঠাইএর বন্দোবস্ত করে। প্রয়োজনে খুদাবক্সকে পাখী ধরবার ফাঁদ, ঘুড়ির লাটাই এবং তীরধনুক বানিয়ে দিতে হয়। ঘোড়াও চড়াতে হয়। একদিন দুপুরে খুদাবক্স দেখে—তিন বছরের লছ্‌মনকে পিঠে বসিয়ে পরন্তপ ঘোড়া হয়ে ঘুরছে। খুদাবক্সকে দেখে উঠে দাঁড়াল পরন্তপ। বলল,—তিনদিন থেকে ঝামেলা লাগিয়েছে। তারপর দুজনেই হেসে ফেলল।

বাইরের কোন ঘটনা ছাড়া এমনিতে রিসালা হল্‌টের জীবন চলে নিজস্ব একটা ছন্দে। ঘোড়াগুলো শেষরাত্রিতে ছুট করিয়ে আনে সাঁহসরা, নতুন বেয়াড়া ঘোড়া হলে খুদাবক্স নিজে তাকে তালিম দেয়। ফৌজের ঘোড়া, তাদের দলাইমালাই করা, তাজা ঘাস আর দানা খাওয়ান, এ সমস্ত তত্ত্বাবধান করে খুদাবক্স। রোদ উঠতে না উঠতে তার সাঁহস রহিমবক্স দুধ গরম করে আনে। চুণারকি নদী পেরিয়ে যারা সড়ক ধরে ফেরি নিয়ে যাবে, তাদের ধরে ধরে সওদা করে পরন্তপ। সাঁহসদের জন্যে, তার ও খুদাবক্সের জন্যে। ইতিমধ্যেই নীচে চারপাই পড়তে থাকে, আর তাদের এখানে অতিথিরা আসতে সুরু করে। সরকারী ডাক পিয়ন, তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ, কখনো কোন সাধু সন্ন্যাসী, দূর থেকে রিসালা হল্‌টের দোতলা কুঠিটা দেখে সোজা চলে আসে। শালগাছের খুঁটির ওপর ঘর দু'খানাকে ইতিমধ্যে রং করেছে পরন্তপ। মেরামত করিয়েছে কারিগর ডেকে। অতিথিদের কাউকে পানীয় জল দেয়, কেউ চায় ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশ, কেউ আসে নিছক প্রার্থী হয়ে। একবার বৃষ্টি হতে সন্ধ্যেবেলা এল এক বাজিওয়ালার দল। একটা ভাল্লুক, একজোড়া

রামছাগল, একজন বুড়ো লোক, আর একটি তরুণী। দুইদিন থাকল তারা। বৃদ্ধটির শরীর রোগে জীর্ণ, মেজাজ তিক্ত। মেয়েটি তাকে যে কত রকমে সেবাযত্ন করল। পাছে খুদাবক্সদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, সেজন্য সে হাত জোড় করেই থাকত। যাবার সময়ে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। বলে গেল, এ আমার স্বামী। একসময়ে খুব শক্তি ছিল, ভালো খেলা জানত, এখন একটু কমজোরী হয়ে পড়েছে।

তাদের দেশ না কি কোথায় কোন দূরে, হায়দ্রাবাদ জিলাতে। দেশঘর ছেড়ে অনেক দূরে অন্য মানুষের মধ্যে, অন্য জায়গায়, একটি তরুণী তার বৃদ্ধ স্বামী, একটা ভাল্লুক ও একজোড়া ছাগল নিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, এই ছবিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা খুদাবক্সকে স্পর্শ করেছিল।

প্রতি সন্ধ্যায় বাতি জেবলে চশমা নিয়ে বসে পরন্তপের চাকর প্রভুদয়াল সুস্বরে তুলসীদাস পাঠ করে—যবসে রামচন্দ্র রাজসুখ ছোড় গেই—

সেই সময়টা পরন্তপ ও খুদাবক্স খুব শ্রদ্ধা ভরে শোনে। প্রভুদয়াল ভক্ত মানুষ। বলে,—শুনছেন যখন, চৌহানজী, হাতে তামা ও তুলসী নিয়ে বসুন। কিছু খেয়াল ত' রাখুন। তার কথা শোনে পরন্তপ।

দিন চলে যায়। হৈমন্তিক শস্যসম্পদ কবে শীতের রিক্ত বৈরাগ্যে পরিণত হয় তার হিসাব রাখে না খুদাবক্স। শীতের পরে পুনর্বার বসন্তের সূচনায় ধীরে ধীরে মধ্যাহ্নের বাতাসে উদাস সুর লাগে, গাছগুলো সাজে নবকিশলয়ের ভূষণে। এই প্রত্যেকটি দিন তার কাছে মোতির সমৃতি দিয়ে ভরা। এমনি একদিনে মোতিকে দেখেছিল খুদাবক্স, সে কবেকার কথা হবে? অনেকদিন। এখন যখনই তার সময় মেলে, সেই কথা, সেই গান মনে মনে নাড়াচাড়া করে। একটি নামই ব্যথা ও আনন্দে গুঞ্জরণ করে তার মনে।

এমনি এক সময়ে, একদিন সন্ধ্যা যখন তার কুয়াশার উত্তরীয় পরিহার ক'রে, বসন্তের মধুর আবেশ গায়ে জড়িয়েছে, তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বটগাছের তলায় শিবলিঙ্গের সামনে ঘিয়ের প্রদীপটির এক ফোঁটা আলো দেখতে দেখতে খুদাবক্সের মনে হয়, একজন পথিক যেন ঘোড়ার পিঠে তারই ডেরার দিকে আসছে। কে হতে পারে? চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা তার মনে হয়, এই লোকটি তার একান্ত পরিচিত। বারান্দার নীচে এসে সে যখন দাঁড়ায় তখন তার সহিস প্রশ্ন করে—কি আরাজি? খুদাবক্স শোনে—খুদাবক্স খাঁ সাহেবকে খবর দাও কি ঝাঁসীর বাহ্‌রাম খাঁ তাঁকে মিলতে চান। নেমে আসে খুদাবক্স। বাহ্‌রামও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে। দু'জনে সোল্লাসে দু'জনকে আলিঙ্গন করে। সহিস ঘোড়া নিয়ে যায় ওপাশে।

দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে কথা হয়। তন্দুরী রুটি আর কাবাব দিয়ে অভ্যর্থনা করে বন্ধুকে খুদাবক্স। বলে,—কাল আমার ঝর্ণা থেকে মাছ ধরে খাওয়াব।

আলো মাঝখানে রেখে দু'জনে বসে। বাহ্‌রাম বলে,—তোমাকে ধরবার জন্যে কত খোঁজ করেছি। শেষে টিকমগড়ে পরন্তপের সঙ্গে দেখা হল। নিশানা ক'রে আসছি। অনেক কথা আছে দোস্ত। পহেলা কথা শোন। ঝাঁসী চলে গেছে অংরেজের হাতে। কত কি যে হয়ে গেল খুদাবক্স তুমি কিছুই জান না। তারপর বাহ্‌রাম বলে,—তুমি বড় ভুল করেছ খুদাবক্স। সবচেয়ে বড় ভুল করেছ, চলে এসে।

এ প্রসঙ্গ খুদাবক্স তুলতে নারাজ। কিন্তু তার বারণ শোনে না বাহ্‌রাম। বলে,—এ কথা বলে যদি তুমি চিরদিনের মতো সম্পর্ক কাটিয়ে দাও, তাতেও আমি আপত্তি করব না।

কিন্তু শুনতে তোমাকে হবেই। আরো বুঝবে তুমি ওস্তাদের খত্ পড়লে।

ঘোসের চিঠি! কম্পিত হাতে সেই চিঠি খোলে খুদাবক্স। শিষ্টাচার ক'রে তাকে সহস্র আশীর্বাদ জানিয়ে ঘোস লিখেছেন, খুদাবক্সের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। নিজেই আসতেন তিনি, কিন্তু বড় দুর্দিন আজ। বাঈ সাহেবের অবস্থা শোচনীয়। নগরীর ওপরে দুঃখের ছায়া। কেল্লার ওপরে উড়ছে কোম্পানীর পতাকা। তাঁরই প্রাণাধিক প্রিয় কামান-গুলি ইংরেজের সম্মানে গর্জন করেছে—তা-ও তাঁকে শুনতে হয়েছে, আরো শুনছেন ইংরেজের মহারানীর জন্মদিনে কেল্লাতে বাতি দিয়ে সাজাতে হবে। এই দুর্দিনের পটভূমিকায় তিনি নিজে আসতে পারলেন না। কিন্তু খুদাবক্স কি একবার আসবে না? অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, আল্লার বিধানের উপর টেক্কা দিতে গিয়ে তিনি তার ও আর একজনের জীবন নষ্ট করেছেন। আজ মনে করছেন, ভুল সংশোধন করবার সময় বয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর মিনতি—

চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল খুদাবক্স। তারপর সযত্নে সেটাকে ভাঁজ ক'রে বুকের পকেটে রাখল। বাহ্‌রাম বলল,—সেদিন ওস্তাদের অনুরোধে তোমার ভালোর জন্যে, তোমাকে ঘা দিয়েছিল মোতি। তুমি যদি তাকে দেখতে খুদাবক্স, কতদিন গেল পাগলের মতন। শুনেছি খায়নি, কারো কথা মানেনি, কতদিন তানপুরা কি ঘুঙুর ছোয়নি, শুধু কেঁদেছে। তারপরে সে মানুষও একেবারে বদলে গেছে। এমন বদলে গিয়েছে যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। ভজনের পাঠ নেয় চন্দ্রভাণজীর কাছে। বাঈ সাহেবকে গান শোনায় কখনো কখনো। ওস্তাদের ওপরে আগে বড়ই রাগ করেছিল, কিন্তু এখন তাও মেনে নিয়েছে। ওস্তাদের সঙ্গে তার দেখা হয়। শুধু তোমার কথা, তোমার ধ্যান নিয়ে বেঁচে আছে। তুমি একবার চল।

খুদাবক্স ঘাড় নাড়ে। তা হয় না। বলে, পরন্তপ আমার ওপর হল্‌ট ছেড়ে দিয়ে টিকমগড় গেছে। দুই মাসের আগে সে ফিরবে না, আমি যেতে পারব না এখন। আর কি জান, মনে হয় কত দিন কেটে গেছে, অন্যরকম হয়ে গেল হালচাল, এখন একেবারে ভাঙা জলসায় গিয়ে যদি দাঁড়াই, তবেই কি আবার বাতি জ্বলে উঠবে আর গাওনা সুরু হয়ে যাবে? যদি প্রাণমনেও চাই, তাহলেই কি আগেকার মত সব হবে?

বাহ্‌রাম বিষন্নভাবে মাথা নেড়ে জানায় না, তা হতে পারে না।

খুদাবক্স বলে,—ওস্তাদকে আমি খত লিখে দেব, আর তুমি এই খবরও পৌঁছে দেবে, যে আমিও কম অপরাধ করিনি, কষ্ট দিয়েছি, কষ্ট পেয়েছি, এখনো আমি তৈরি নই বাহ্‌রাম। সময় হলেই যাব, যখন ছুটি মিলবে, যখন সময় হবে।

বাহ্‌রাম বলে,—আর কখনো সময় হবে খুদাবক্স? যে দিন চলে গেল তাকে আর কখনো দেখতে পাব?

অতীত মাত্রেই মধুর। যে দিনটা চলে গেছে, সেটাই যেন ভাল। বাইশ টাকার সওয়ার বাহ্‌রাম, ছোট একটা রাজ্যের ছায়াতলে বাস করেছে। তবু সেও অতীত জামানার কথা স্মরণ করে কাঁদে, যে রাজার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক ছিল না, সেই রাজার মৃত্যুতেই অসহায় বোধ করে। খুদাবক্স একটু করুণ হাসে। বলে,—না বাহ্‌রাম, তা কখনোই হয় না। তারপর বলে,—ওস্তাদকে খত্ আমিই লিখে দেব। সেই খত্ দিও, আরো বলো যে, সময় হয়েছে জানলেই আমি আসব। তুমি এখন থাকবে ত?

বাহ্‌রাম বলে,—কাল ত' আমাকে যেতেই হবে খুদাবক্স। আমাদের ত' চাকরী ছেড়ে গেল। বাট্টা, ভাতা, সব নাকি দুই মাসের ক'রে হাতে হাতে মিলবে। ঝাঁসীতে এখন

ফৌজ আসবে বাইরে থেকে, জানো ত'? হল্‌টে ত' আছ, ফৌজী ছাউনীর কিছু খবর রাখ?

—কি খবর?

—কি রকম দেখছ? ওখানে ত' আমরা হরদম শুনতে পাই, এদিকে ওদিকে ফৌজ নাকি কোম্পানীর ওপর খুসী থাকছে না।

—কে জানে ভাই। খবর কত উড়ে আসে, দেখবে সব সত্যি নয়।

—না, সত্যি হতেও পারে। কেন কি, আমার মৌ, সাগর, আগ্রা, অনেক জায়গার খবর পাই। শুনি নানারকম গোলমাল চলে ছাউনীতে। কিছু যদি সত্যি না থাকবে ত' এত কথাই বা উঠবে কেন?

খুদাবক্স জবাব দেয় না। বলে,—তুমি আরাম কর বাহ্‌রাম। আমি ওস্তাদকে খত্‌ লিখি।

কম্বল টেনে আরাম ক'রে শুয়ে মুখের কাছের জানলাটা খুলে দেয় বাহ্‌রাম। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসে। বাহ্‌রাম বলে,—এইরকম একটা ডেরা পেলেই বিয়ে করি আমি। বৌ ওখানে বসে রান্না করে আমি তার সঙ্গে গল্প করি। বাড়ীর সামনে ঝারা বাঁধি, একটা যুইফুলের গাছ উঠিয়ে দিই।

—পরমেশ্বর আহ্‌রীরও এইরকম কথাই বলতো।

—আরে ভাই বলবে, দিল্‌দার মানুষ হলেই এই কথা বলবে। আর কথা কি আছে বল?

—তাও ঠিক।

বাহ্‌রাম ঘুমিয়ে পড়লে পরে খুদাবক্স কলম কাগজ ধরে। প্রথমে ঘোসের কাছে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারো ওপর আর কোন অভিযোগ তার নেই। তার জীবনে যা যা ঘটল, সব কিছুর জন্যে কেউ দায়ী নন। এই কথা রাগ ক'রে সে বলছে না, এ তার অন্তরের কথা। সে কথা ঘোস নিশ্চয় বুঝবেন। তাঁর চিঠিতে খুদাবক্সের অন্তরের পোষিদায় যে কথা দুঃখে ঘুমিয়েছিল তাই জেগে উঠল, আর আজ খুদাবক্স বুঝছে যে সে জখম আরাম হয়নি। খুদাবক্স এখন যেতে পারবে না কেন, তার আপাত কারণগুলো বাহ্‌রামই বলবে। আরো কথা আছে যে, আবার যদি সে ফেরে ত' রাজার মতো যাবে, যাতে আবার ফিরে আসতে না হয়। সেই একজনকে যেন ঘোস বলেন, খুদাবক্স তার কথা ধ্যানে ধরে এখানে ওখানে ভেসে একটু মাটি পেয়েছে, একটু দম নিচ্ছে, এখনই সে যেতে চায় না। যেতে চায় না এই জন্যে যে, তার এখনো সময় হয়নি। দুর্লভ সৌভাগ্য লাভের সুকৃতি তার ছিল না, তাই হয়ত ভালো বুঝেই ভাগ্য তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই সময়ে। এখন সে বোঝে, সেই একজন যেমন করে নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ছে, তেমনি খুদাবক্সও ব্যস্ত আছে। একই আশাকে সে সযত্নে লালন করছে মনের গোপনে, নতুন ক'রে নতুন আসরে তাকে বরণ করবে। সেইজন নিশ্চয় তার ভাষা বুঝবে, কেননা সে ত' জানে খুদাবক্স কিয়াণ। একটি অঙ্কুর বুনে, সেই গাছের ফল পাবার আশায় যারা সারাজীবন পরিশ্রম করে, তাদেরই সে একজন। সেই দুর্লভ জনের সাধনই সে করছে। এইসব কথা ঘোস তাকে বললে সে বুঝবে নিশ্চয়। সে বুঝেছে জানলে, খুদাবক্সও শান্তি পাবে। আজ বোঝে খুদাবক্স, খোদা যা করলেন তা মঙ্গলের জন্য। ঘোসকে তিনি শান্তিতে রাখবেন, তাকে দেবেন ধৈর্য।

চিঠিটা শেষ ক'রে খুদাবক্স সযত্নে ভাঁজ করে। কাপড়ের খাপের ভেতর বন্ধ ক'রে মুখে গালা দিয়ে মোহর করে।

বাহ্‌রাম ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্ত হয়ে। পাশের ঘরে গিয়ে খুদাবক্সও শুয়ে পড়ে। মাথার কাছের খোলা জানলা দিয়ে বাতাস কতদূর থেকে বয়ে আনে ঢেউয়ের পর ঢেউ। এই বাতাসে স্বপ্নচারিণী হয়ে আসে মোতির প্রেম। কোন গান যেন গাইত মোতি—'কৈসে বীতাউঁ দিন রাতিয়া—' বলত, হে প্রিয় তুমি যদি চিঠি না পাঠালে, তবে কেমন করে আমি দিন ও রাত কাটাব। তাইত' সেও ভেবেছিল, কিন্তু দেখ, কেমন ক'রে কতদিন কেটে গেল।...নসীব বড় খেলাই খেলল খুদাবক্সের সঙ্গে। ছয় মাস আগেকার মন হলে, খুদাবক্স এখনি চলে যেত। কিন্তু বারবার ভালবাসতে গিয়ে হারাল, আর সব দিক থেকে বাঁধন খসেই পড়ল, তাই তার আবার ফিরে বাঁধন জড়াতে ভয় হয়। মনে হয় সময় হয়নি। মনে হয়, একবার ত' দেখলাম লোভীর মতো দুই হাতে ধরে, বুকের কাছে রেখে অন্ধ হয়ে। তাতেও ত' চলে আসতে হল। রক্তাক্ত হৃদয় ভেঙে-চুরে গেল। এবার তাই বিশ্রাম নিচ্ছে খুদাবক্স। আবার যাবে, কিন্তু এবার আর বৃথা সময় বইয়ে দেবে না। একটু দেরী হচ্ছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই। কোথা থেকে যেন বিশ্বাস এসেছে, এতে কোন ক্ষতি হবে না। বিশ্বাস যে এসেছে, তাই কি সে আগে বুঝেছিল?

ক্ষমা করবার কথা ভেব না মোতি। তুমি ত' জানো তোমার ওপর আমার কোন অভিমান থাকতে পারে না। এ কথা আজ, এখন যেমন বুঝছি, আগে তা' বুঝিনি। অভিমান হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু সে দিনও পেছনে রেখে এসেছি। আমার মনে তুমি আর তুমি নেই মোতি, আমার সঙ্গে এক হয়ে গেছ। তোমার প্রেম আঘাত করেছিল, আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে ঠেলে পথের পথিক করেছিলে। মোতি, সেই থেকে আমার অনুভূতিতে দুনিয়াটা বড় হয়ে গেছে। এখন মনে হয়, অনেক বড় আমার ঘর, আমার আপন মানুষও অনেকজন। আমি ছিলাম কিষাণ আর তুমি ছিলে নটি, দুই দুনিয়া ছিল আমার আর তোমার। ভাবতাম প্রেম দিয়ে সেতু বাঁধব। সেই সেতুতে দাঁড়িয়ে ভালবাসব। আজ আমাকে তুমি প্রেমিক করেছ, অনেক বেশী ভালবাসতে শিখিয়েছ দুনিয়াকে। এক বিশাল ঘরে আমি বাস করি, এক মস্ত আঙিনায় তোমার পথ চেয়ে থাকি। তুমি সেখানে যেমন ক'রে চাও, তেমনি ক'রে এসো, বরণ ক'রে নিতে বাধবে না।

এই আকাশ তোমার আমার চন্দ্রাতপ, এই বাতাসে তোমার সৌরভ পাচ্ছি, তুমি বিশ্বাস করো, তোমার পায়ের ঘুঙুরের শব্দ আমি সব সময় শুনি। শুনি তুমি আমার ঘরে আসছ সেই মঞ্জীর বাজিয়ে।

তুমি শুনিয়েছিলে, বিনা প্রেম্‌সে ন মিলে নন্দ্‌লালা—বিনা প্রেমে ত' কিছুই মেলে না। আমার হৃদয়ে তুমি সেই প্রেম দিয়েছ।

এই প্রতীক্ষা কষ্টকর। কষ্ট হোক, অপেক্ষা করো, তুমি চাও, তোমার চাওয়া আর আমার চাওয়া যেদিন অমোঘ হয়ে উঠবে সেদিন আর দূরে থাকতে পারবে না। আপনা থেকেই সব এক হয়ে যাবে, আর আমরা মিলবই। সেদিন জেনো কোন বিচ্ছেদই আর থাকতে পারবে না।

[আগামীবারে সমাপ্য]

সাহিত্যিক স্মৃতি ও বর্তমান সমস্যা

আঁদ্রে জিদ

[এই রচনাটি আঁদ্রে জিদ ১৯৪৬ সালে সাহিত্যসভায় ভাষণ হিসেবে লেখেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে ফরাসী সাহিত্যধারা সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি ও অভিমত এই ভাষণে তিনি ব্যক্ত করেন। তাঁর বয়স তখন ৭৭ বছর। তিনি মারা যান ১৯৫১ সালে।—অনুবাদক]

সাহিত্যিক স্মৃতি, বর্তমান সমস্যা—বিষয় দুটো প্রথমে মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখলাম তারা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, ওতপ্রোত। কারণ সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে—প্রায়ই যা মর্মান্তিক—অতীত আলোকিত হয়। তাই বর্তমানের শিক্ষার সন্ধানে আমি প্রথমে কিছু স্মৃতিকথা ব'লে নেব।

বছর আঠার বয়স থেকেই একজন যুবক লিখতে চায়। ক্লাসে সে শুনেছে এবং তার বিশ্বাসও জন্মেছে যে, ভালো ক'রে লেখার মানে হল প্রথমে ভালো ক'রে অনুভব করা এবং ভালো ক'রে চিন্তা করা। লাব্রুইয়ের-এর *Caractères*-এ সে পড়েছে : "বই লেখা একটা কাজ" অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে : এমন একটা জিনিষ যা শিক্ষা করা যায় এবং শিক্ষা করতে হয়।

চিত্রশিল্পীরা কোনো খ্যাতিমান গুরুর শিল্পালয়ে যান শিক্ষানবিশি করতে। কিন্তু নবীন সাহিত্যশিল্পী কোথায় যাবে?

পিয়ের লুই আর আমি ছিলাম সহপাঠী। আমরা সানন্দে আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের দু'জনের রুচি হুবহু এক না হলেও অন্তত কাব্যের প্রতি অনুরাগ সমান। লুই আমার চেয়ে উদ্যোগী বেশী, বেপরোয়াও। স্বেচ্ছায়ই আমি তাকে আমায় টেনে নিয়ে যেতে দিতাম।

সে আমায় টেনে নিয়ে গেল মালার্মের বাড়ীতে।

মালার্মে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় র্যু দ্য রম-এ তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটে বৈঠক করতেন। এ বৈঠকের কথা অনেকেই অনেকবার বলেছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আবার বলতে আমার দ্বিধা হওয়ার কথা। বলছি একটা কারণে। আমার উদ্দেশ্য তাঁর মূর্তির কয়েকটা লক্ষণ তুলে ধরা, তাঁর শিক্ষার এমন কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা যা আজ দূর থেকে আমার মনে হয় খুব উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে এই কারণে যে, তখন যা কিছু দেখা যেত এবং এখন যা কিছু দেখা যায় শোনা যায় বা করা হয় তা থেকে তা পৃথক।

মালার্মের গৃহের অভ্যন্তর এবং তাঁর নিজের চালচলন যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বর। কঁদরসে স্কুলে ইংরিজি পড়িয়ে তিনি যে মাইনে পেতেন তা দিয়ে বিলাসিতা চলত না; কিন্তু তাঁর সব কিছুতেই অপূর্ব রুচির পরিচয় ছিল। যে ছোট্ট খাবার ঘরটিতে তিনি আমাদের বসাতেন সেখানে আটজন, বড় জোর দশজন আঁটত। আগন্তুকরা টেবিলের চারপাশে বসতেন, টেবিলের উপর আহার্যের জায়গায় থাকত বড় একটি তামাকের পাত্র। কবি নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন মেটে রঙের একটা স্টোভে পিঠ ঠেস দিয়ে। মাদাম মালার্মে ঘর

থেকে চলে যেতেন। তাঁর মেয়ে জনভিয়েভ ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যমধুর ভঙ্গীতে নিয়ে আসতেন পানীয়, কোনো কোনো সময় লোক কম থাকলে অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন; কিন্তু কখনো আলাপে যোগ দিতেন না। বলা যায়, একমাত্র মালার্মেই কথা বলতেন। পরে তিনি *Divagations* নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর এইসব আলাপের কিছু সঠিক প্রতিফলন পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর, সেই হাসি! ঠোঁটের হাসি নয়, দৃষ্টির। সাধারণত একটা সন্তর্পণ ভঙ্গীর সঙ্গে থাকত নম্র এক হাসি, অবগুণ্ঠিত, যেন ভীরু : তর্জনীটা উঠে আছে প্রশ্নের বা প্রতীক্ষার ভঙ্গীতে। আহা, সেই ছোট্ট ঘরে মনে হত আমরা যেন কতদূরে রয়েছি র্যু দ্য রম থেকে, কর্মব্যস্ত শহরের শূন্যগর্ভ কোলাহল থেকে, রাজনীতিক হট্টগোল, সবরকম স্বার্থান্বেষা আর চক্রান্ত থেকে। মালার্মের সঙ্গে সকলে প্রবেশ করত এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, যেখানে অর্থ সম্মান করতালি মূল্যহীন হয়ে পড়ত। অথচ তাঁর গৌরবের বিকীরণ ছিল অতি অনাড়ম্বর, অতি সংগোপন। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি আজ জানেন (কিন্তু সে সময়ে আমরা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বীকার করতাম) যে, মালার্মে আমাদের ক্লাসিক পদ্যকে এমন এক ধ্বনিময় পূর্ণতার, এমন এক রূপগত অন্তর্লীন সৌন্দর্যের, এমন এক মন্ত্রস্বর-ক্ষমতার স্তরে নিয়ে গিয়েছেন যেখানে তা আগে কখনো পৌঁছয়নি এবং আমার বিশ্বাস কখনো পৌঁছবেও না; কারণ আর্টে যা পূর্ণ তাতে আর ফিরে যাওয়া চলে না। যেতে হয় তার বাইরে, খুঁজতে হয় অন্যত্র। সেটাই আসল।

কিন্তু মালার্মের মধ্যে এ ছাড়াও আরো কিছু ছিল। তাঁর মধ্যে থেকে বিকীর্ণ হত একটা তাপস ভাব। এই পৃথিবীর বাইরের এক রাজ্যে তিনি যেন তন্ত্রধারক। তাঁর কথাগুলো ছিল আমাদের মনকে উদ্দেশ ক'রে, আর তাঁর দৃষ্টান্ত স্পর্শ করত আমাদের আত্মাকে—অবশ্য অতি সহজভাবে, কারণ গুরুগিরির কোনো ভাব তাঁর ছিল না। তাঁর কথা দিয়ে এবং তার চেয়েও বেশী তাঁর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি আমাদের শেখাতেন নিষ্ঠা। সত্যিই এক তপস্বীর মতো তিনি আমার কাছে প্রতিভাত। সেই ভাবেই আমি তাঁকে দেখি। এই সংক্ষিপ্ত প্রশস্তিতে আমি কয়েকটা বিশেষ গুণের উপর জোর দিতে চাই যা আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যকে ছাড়িয়ে, কিন্তু যার উপর আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি নির্ভরশীল। এই নিষ্ঠার উপাদান কি ছিল? কতকগুলি নির্বিশেষ, স্পর্শবোধাতীত এবং ঘটনা বা অবস্থা দ্বারা অপরিবর্তনীয় সত্যে বিশ্বাস ও ভরসা। এক অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রতি অনুরক্তি, যে-সত্যের সামনে আর সব কিছু সরে যেত, মুছে যেত, মূল্যহীন হয়ে যেত।

প্রত্যক্ষের প্রতি এই বিরাগ যে কোন্ পরিণামে নিয়ে যেতে পারে তা আমি খুব ভালো ক'রেই জানি। জীবনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবার আমন্ত্রণ ছিল তার। কবি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলছিলেন; সাহিত্যকে তিনি বস্তুবিচ্ছিন্ন অনড় এক জগতে ঠেলে দেবার বিপদ ঘনিয়ে তুলছিলেন। বাহ্যজগতের প্রতি এই অবজ্ঞা—একটা কাহিনী দিয়ে একে পরিষ্কার করি।

সিম্বলিজ্‌ম্ আন্দোলনে তখনো কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি, তখনো পর্যন্ত শুধু কবিতাই লেখা হচ্ছে। সেই উপন্যাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ন্যাচরালিস্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আমি লিখলাম *Voyage d'Urien;* তার তৃতীয় ও শেষ অংশ বেরুল পৃথকভাবে, নাম *Voyage au Spitzberg* । মালার্মেকে দিলাম এই বই, তিনি নিলেন

সামান্য ভ্রূকুঞ্চন সহকারে, নাম দেখে ভাবলেন সত্যিকার কোনো ভ্রমণকাহিনী বুঝিবা। কয়েকদিন পরে আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হলে বললেন, "ওঃ, আপনি আমাকে বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি গিয়েছেন সেখানে!" আর সেই সঙ্গে তাঁর সেই অপরূপ হাসি।

এর অল্পকাল পরেই আমার মনে হল সাহিত্য এবং বাহ্যজগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গত সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আমার *Nourritures Terrestres*-এর ভূমিকায় যা লিখলাম : প্রয়োজন "আবার নতুন ক'রে মাটির উপর খালি পা রাখা।" অবশ্যই এতে ক'রে আমি মালার্মের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। অনায়াসসাধ্যতা সম্বন্ধে, আত্মপ্রসাদ সম্বন্ধে, জীবন ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই যা কিছু আত্মতুষ্ট করে, মনোরঞ্জন করে তার সম্বন্ধে এক পবিত্র বিতৃষ্ণা আমি ধরে রাখলাম মালার্মের শিক্ষা থেকে; ধরে রাখলাম নিজের সম্পর্কে এবং মানুষের সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ আন্তরিকতার এক আপোষহীন অনুরাগ ও প্রয়োজনবোধ; এই অটল বিশ্বাস যে, যাই ঘটুক না কেন, মানুষের মূল্য মানুষের সম্মান ও মর্যাদা যা থেকে সৃষ্ট হয় তার কাছে আর সব কিছু পরাভূত হয়, পরাভূত হতে বাধ্য, তার কাছে আর সব কিছু গৌণ ক'রে রাখা উচিত, দরকার হলে বিসর্জন দেওয়া উচিত।

একটা জিনিষ লক্ষণীয়, যা কেউ যথেষ্টরকম লক্ষ করেছেন বলে আমি জানি না। এই আপোষহীনতা, এই সর্বাঙ্গীণ সত্যানুরাগের পরোক্ষ পরিণাম। ন্যায়বিচারের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে তা ওতপ্রোত। বিখ্যাত দ্রেফ্যুস ঘটনার সময় আপোষহীন ন্যায়বিচারবোধ তার সব চেয়ে উৎসাহী সমর্থকদের পেয়েছিল মালার্মের নিকট ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে থেকেই। সুতরাং আমার এ কথা ভুল নয় যে র‍্যু দ্য রম-এর শিক্ষা শুধু মনকে শেখাত না, আমাদের আত্মাকেও তৈরী করত। সে-শিক্ষা স্মরণ ক'রেই আমি এখন কিছু বলতে চাই সুবিধাবাদ সম্বন্ধে, যার প্রকাশ দেখি "সংগ্রামী সাহিত্যে"র (littérature engagée) আকারে। এখন তার খুব চল।

মালার্মের আমলে "সংগ্রামী সাহিত্যে"র একজন অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন : মরিস বারেস।

তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ছিল, কারণ তিনি আমার প্রথম বই *Les Cahiers d'André Walter*-কে অভিনন্দিত করেছিলেন। বইটা তখনো বারেস-এর প্রকাশক পের্‍্যাঁর দপ্তরে গাদা হয়ে পড়ে ছিল। বারেস একটু খুলে চোখ বুলোলেন, যেটুকু পড়লেন তাতেই তাঁর ইচ্ছে হল আমার সঙ্গে পরিচয় করবার। আমাকে খবর পাঠালেন। আমার বয়স তখন মাত্র কুড়ি পেরিয়েছে। বারেস আমার চেয়ে আট বছরের বড়। যুবকদলে তখন তাঁর ভীষণ প্রতিপত্তি, যদিও তখনো পর্যন্ত অল্প গ্রন্থই তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁরই অভিহিত "আমির আরাধনা" নিয়ে যে-উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন শুধু সেগুলিই বেরিয়েছে তখন। তা ছাড়া একা একাই একটা পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি : *Les Taches d'Encre*। তার লেখকও ছিলেন তিনি একা। মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। তাতে বোদলের সম্বন্ধে একটা লেখা পড়েছিলাম। লেখাটা এযাবৎ খুব অল্প লোকেরই নজরে এসেছে। আমার মতে খুব অসাধারণ রচনা, সত্যিই শক্তিশালী। শক্তিমত্তার ব্যঞ্জনা বারেস-এর ছিল সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে, তাঁর অঙ্গভঙ্গীতে, তাঁর গতিভঙ্গীতে, তাঁর উদ্ধত, শ্লেষপূর্ণ ও অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠস্বরে। তাঁর ভাবভঙ্গী অপরকে সঙ্কুচিত ক'রে দিত,

যেমন শাতোব্রিয়াঁর ভাবভঙ্গী করত বলে আমার ধারণা। শাতোব্রিয়াঁর সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল। কিন্তু বারেস ছিলেন আরো দীর্ঘকায়, আরো সুদর্শন, এবং তাঁর সমস্ত সত্তা থেকে একটু অবজ্ঞাসূচক বা উন্নাসিক এক ধরনের কর্তৃত্ব বিকীর্ণ হত, যার কাছে লোকে কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে ভালোবাসত। তিনি মুগ্ধ করতেন, কিন্তু লোকে তাঁর কাছে যেত কাঁপতে কাঁপতে। নিজের চেহারার দিকে তাঁর খুব নজর ছিল এবং সব সময় চমৎকার সাজ-পোষাক করতেন তিনি। সজ্জায় খুব মার্জিত একটা সৌষ্ঠব ছিল এবং সেই সঙ্গে একটা সযত্ন অবহেলা।...তাঁকে দেখলে মনে হত স্পেনীয়। তোলেদোকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে এল গ্রেকোর আঁকা মূর্তির সাদৃশ্য ছিল।

তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তিনি যখন চিঠি দিলেন, আমার বুক দুরু দুরু করে উঠল। যখন গিয়ে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলাম তখন তো আরো। প্যারিসের অন্যতম অভিজাত পাড়ায় তিনি থাকতেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন আমার যে-আলাপ হয়েছিল তা আমার পরিষ্কার মনে নেই। আমি তেমন সহজ বোধ করছিলাম না। এবং বারেসও তাঁর থেকে ভিন্ন ব্যক্তিত্বকে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করতেন না। আমার পরিষ্কার মনে আছে এইটুকু : বাইরের ঘরে বসে যখন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তখন মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম সেই ঘরে থাকে থাকে সাজানো চমৎকার বাঁধানো সব বই। অথচ জনশ্রুতি ছিল এবং বারেসও জাঁক ক'রে বলতেন যে তিনি পড়েন কমই। আমার সামনে সাজানো ছিল বায়রনের এক গ্রন্থাবলী। কি যে খেয়াল হল, তার একটা খণ্ড টানলাম, অমনি সমস্ত গ্রন্থাবলী লুটিয়ে পড়ল। ওগুলো সত্যিকার বই ছিল না, ড্রয়ার ঢাকবার একটা আচ্ছাদন মাত্র। ড্রয়ারটার মধ্যে ছিল (তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম) বুরুশ আর সুগন্ধির শিশি।

তখনকার দিনের যুবকদের চোখে বারেস-এর মর্যাদা ছিল অসাধারণ। কারো কারো মনে প্রশংসা ছিল ভক্তি ও আরাধনারই নামান্তর। আমার বন্ধু মরিস কীয়ো (যাকে পরে আমি *Nourritures Terrestres* উৎসর্গ করি) একটা ছোট্ট ঘরে থাকত, গরীব ছাত্রের ঘর। তার মধ্যে সে একটা পুজোবেদীর মতো তৈরী করেছিল, সেখানে আইকনের বদলে ছিল বারেস-এর এক মস্ত বড় প্রতিকৃতি, প্রদীপ জ্বালিয়ে তার অর্চনা হত।

আমার মনে আছে এই মরিস কীয়োরই প্রস্তাবক্রমে (তখন কী তরুণই ছিলাম আমরা!) ভাগাভাগি ক'রে খরচা দিয়ে আমরা স্যাঁ সেভর‍্যাঁ গির্জায় উপাসনা করালাম বারেস-এর আত্মার শান্তির জন্যে—অবশ্য বারেস মারা যাননি, বিয়ে করেছিলেন।

বারেস পড়তেন কমই। পিয়ের লোতির চেয়ে সামান্য একটু বেশী। তবুও যে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল লোক ছিলেন তার কারণ সেক্রেটারীরা এবং বন্ধুরা তাঁর হয়ে পড়তেন এবং তাঁকে যুক্তি ও উপযুক্ত উদ্ধৃতি জোগাতেন।

তাঁর নিজের মতের পথে যা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ় করতে পারে, এই বিরাট অহংজ্ঞানী শুধু তাই খুঁজতেন বইয়ের মধ্যে, প্রকৃতির রূপের মধ্যে, জীবনের দৃশ্যের মধ্যে। অন্যের সম্বন্ধে একান্তভাবে কৌতূহলহীন ছিলেন তিনি। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা পরে নামযশে তাঁর সমকক্ষ হন তাঁদের কারো মূল্য তিনি আবিষ্কার করেননি, এমনকি স্বীকারও করেননি। জ্যুল রনার, প্রুস্ত, ক্লোদেল, ভালেরি, জিরোদু—কারো প্রতি তিনি সামান্য মনোযোগও দেননি।

বারেস-এর সঙ্গে আমার সংযোগ বেশী দিন বজায় রইল না। ১৮৯৭ সালে তাঁর *Déracinés* প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই আমি বুঝতে ও অনুভব করতে আরম্ভ

সামান্য ভ্রূকুঞ্চন সহকারে, নাম দেখে ভাবলেন সত্যিকার কোনো ভ্রমণকাহিনী বুঝিবা। কয়েকদিন পরে আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হলে বললেন, "ওঃ, আপনি আমাকে বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি গিয়েছেন সেখানে!" আর সেই সঙ্গে তাঁর সেই অপরূপ হাসি।

এর অল্পকাল পরেই আমার মনে হল সাহিত্য এবং বাহ্যজগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গত সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আমার *Nourritures Terrestres*-এর ভূমিকায় যা লিখলাম : প্রয়োজন "আবার নতুন ক'রে মাটির উপর খালি পা রাখা।" অবশ্যই এতে ক'রে আমি মালার্মের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। অনায়াসসাধ্যতা সম্বন্ধে, আত্মপ্রসাদ সম্বন্ধে, জীবন ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই যা কিছু আত্মতুষ্ট করে, মনোরঞ্জন করে তার সম্বন্ধে এক পবিত্র বিতৃষ্ণা আমি ধরে রাখলাম মালার্মের শিক্ষা থেকে; ধরে রাখলাম নিজের সম্পর্কে এবং মানুষের সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ আন্তরিকতার এক আপোষহীন অনুরাগ ও প্রয়োজনবোধ; এই অটল বিশ্বাস যে, যাই ঘটুক না কেন, মানুষের মূল্য মানুষের সম্মান ও মর্যাদা যা থেকে সৃষ্ট হয় তার কাছে আর সব কিছু পরাভূত হয়, পরাভূত হতে বাধ্য, তার কাছে আর সব কিছু গৌণ ক'রে রাখা উচিত, দরকার হলে বিসর্জন দেওয়া উচিত।

একটা জিনিষ লক্ষণীয়, যা কেউ যথেষ্টরকম লক্ষ করেছেন বলে আমি জানি না। এই আপোষহীনতা, এই সর্বাঙ্গীণ সত্যানুরাগের পরোক্ষ পরিণাম। ন্যায়বিচারের প্রয়োজন-বোধের সঙ্গে তা ওতপ্রোত। বিখ্যাত দ্রেফ্যুস ঘটনার সময় আপোষহীন ন্যায়বিচারবোধ তার সব চেয়ে উৎসাহী সমর্থকদের পেয়েছিল মালার্মের নিকট ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে থেকেই। সুতরাং আমার এ কথা ভুল নয় যে রাঁ দ্য রম-এর শিক্ষা শুধু মনকে শেখাত না, আমাদের আত্মাকেও তৈরী করত। সে-শিক্ষা স্মরণ ক'রেই আমি এখন কিছু বলতে চাই সুবিধাবাদ সম্বন্ধে, যার প্রকাশ দেখি "সংগ্রামী সাহিত্যে"র (littérature engagée) আকারে। এখন তার খুব চল।

মালার্মের আমলে "সংগ্রামী সাহিত্যে"র একজন অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন : মরিস বারেস।

তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ছিল, কারণ তিনি আমার প্রথম বই *Les Cahiers d'André Walter*-কে অভিনন্দিত করেছিলেন। বইটা তখনো বারেস-এর প্রকাশক পেরোঁর দপ্তরে গাদা হয়ে পড়ে ছিল। বারেস একটু খুলে চোখ বুলোলেন, যেটুকু পড়লেন তাতেই তাঁর ইচ্ছে হল আমার সঙ্গে পরিচয় করবার। আমাকে খবর পাঠালেন। আমার বয়স তখন মাত্র কুড়ি পেরিয়েছে। বারেস আমার চেয়ে আট বছরের বড়। যুবকদলে তখন তাঁর ভীষণ প্রতিপত্তি, যদিও তখনো পর্যন্ত অল্প গ্রন্থই তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁরই অভিহিত "আমির আরাধনা" নিয়ে যে-উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন শুধু সেগুলিই বেরিয়েছে তখন। তা ছাড়া একা একাই একটা পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি : *Les Taches d'Encre*। তার লেখকও ছিলেন তিনি একা। মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। তাতে বোদলের সম্বন্ধে একটা লেখা পড়েছিলাম। লেখাটা এযাবৎ খুব অল্প লোকেরই নজরে এসেছে। আমার মতে খুব অসাধারণ রচনা, সত্যিই শক্তিশালী। শক্তিমত্তার ব্যঞ্জনা বারেস-এর ছিল সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে, তাঁর অঙ্গভঙ্গীতে, তাঁর গতিভঙ্গীতে, তাঁর উদ্ধত, শ্লেষপূর্ণ ও অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠস্বরে। তাঁর ভাবভঙ্গী অপরকে সঙ্কুচিত ক'রে দিত,

যেমন শাতোব্রিয়াঁর ভাবভঙ্গী করত বলে আমার ধারণা। শাতোব্রিয়াঁর সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল। কিন্তু বারেস ছিলেন আরো দীর্ঘকায়, আরো সুদর্শন, এবং তাঁর সমস্ত সত্তা থেকে একটু অবজ্ঞাসূচক বা উন্নাসিক এক ধরনের কর্তৃত্ব বিকীর্ণ হত, যার কাছে লোকে কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে ভালোবাসত। তিনি মুগ্ধ করতেন, কিন্তু লোকে তাঁর কাছে যেত কাঁপতে কাঁপতে। নিজের চেহারার দিকে তাঁর খুব নজর ছিল এবং সব সময় চমৎকার সাজ-পোষাক করতেন তিনি। সজ্জায় খুব মার্জিত একটা সৌষ্ঠব ছিল এবং সেই সঙ্গে একটা সযত্ন অবহেলা।...তাঁকে দেখলে মনে হত স্পেনীয়। তোলেদোকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে এল গ্রেকোর আঁকা মূর্তির সাদৃশ্য ছিল।

তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তিনি যখন চিঠি দিলেন, আমার বুক দুরু দুরু ক'রে উঠল। যখন গিয়ে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলাম তখন তো আরো। প্যারিসের অন্যতম অভিজাত পাড়ায় তিনি থাকতেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন আমার যে-আলাপ হয়েছিল তা আমার পরিষ্কার মনে নেই। আমি তেমন সহজ বোধ করছিলাম না। এবং বারেসও তাঁর থেকে ভিন্ন ব্যক্তিত্বকে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করতেন না। আমার পরিষ্কার মনে আছে এইটুকু : বাইরের ঘরে বসে যখন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তখন মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম সেই ঘরে থাকে থাকে সাজানো চমৎকার বাঁধানো সব বই। অথচ জনশ্রুতি ছিল এবং বারেসও জাঁক ক'রে বলতেন যে তিনি পড়েন কমই। আমার সামনে সাজানো ছিল বায়রনের এক গ্রন্থাবলী। কি যে খেয়াল হল, তার একটা খণ্ড টানলাম, অমনি সমস্ত গ্রন্থাবলী লুটিয়ে পড়ল। ওগুলো সত্যিকার বই ছিল না, ড্রয়ার ঢাকবার একটা আচ্ছাদন মাত্র। ড্রয়ারটার মধ্যে ছিল (তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম) বুরুশ আর সুগন্ধির শিশি।

তখনকার দিনের যুবকদের চোখে বারেস-এর মর্যাদা ছিল অসাধারণ। কারো কারো মনে প্রশংসা ছিল ভক্তি ও আরাধনারই নামান্তর। আমার বন্ধু মরিস কাঁয়ো (যাকে পরে আমি *Nourritures Terrestres* উৎসর্গ করি) একটা ছোট্ট ঘরে থাকত, গরীব ছাত্রের ঘর। তার মধ্যে সে একটা পুজোবেদীর মতো তৈরী করেছিল, সেখানে আইকনের বদলে ছিল বারেস-এর এক মস্ত বড় প্রতিকৃতি, প্রদীপ জ্বালিয়ে তার অর্চনা হত।

আমার মনে আছে এই মরিস কাঁয়োরই প্রস্তাবক্রমে (তখন কী তরুণই ছিলাম আমরা!) ভাগাভাগি ক'রে খরচা দিয়ে আমরা স্যাঁ সেভ্যাঁ গির্জায় উপাসনা করালাম বারেস-এর আত্মার শান্তির জন্যে—অবশ্য বারেস মারা যাননি, বিয়ে করেছিলেন।

বারেস পড়তেন কমই। পিয়ের লোতির চেয়ে সামান্য একটু বেশী। তবুও যে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল লোক ছিলেন তার কারণ সেক্রেটারীরা এবং বন্ধুরা তাঁর হয়ে পড়তেন এবং তাঁকে যুক্তি ও উপযুক্ত উদ্ধৃতি জোগাতেন।

তাঁর নিজের মতের পথে যা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ় করতে পারে, এই বিরাট অহংজ্ঞানী শুধু তাই খুঁজতেন বইয়ের মধ্যে, প্রকৃতির রূপের মধ্যে, জীবনের দৃশ্যের মধ্যে। অন্যের সম্বন্ধে একান্তভাবে কৌতূহলহীন ছিলেন তিনি। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা পরে নামযশে তাঁর সমকক্ষ হন তাঁদের কারো মূল্য তিনি আবিষ্কার করেননি, এমনকি স্বীকারও করেননি। জুল রনার, প্রুস্ত, ক্লোদেল, ভালেরি, জিরোদু—কারো প্রতি তিনি সামান্য মনোযোগও দেননি।

বারেস-এর সঙ্গে আমার সংযোগ বেশী দিন বজায় রইল না। ১৮৯৭ সালে তাঁর *Déracinés* প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই আমি বুঝতে ও অনুভব করতে আরম্ভ

করলাম, যে-সব মতবাদ তিনি প্রচার করছেন ও অনুসরণ করছেন তা সুস্থ মানবিকতার পক্ষে কত অশুভ, এমনকি ফরাসীদের পক্ষেও কত ক্ষতিকর। কিভাবে সেটা স্পষ্ট ক'রে বলবার চেষ্টা করছি।

এই সব মতবাদ, যা নাকি ফরাসী এবং অতি বিশেষভাবেই ফরাসী, এই সব স্থানীয় অর্থাৎ লরেন প্রদেশীয় সত্য, তাদের বারেস খাড়া করলেন কাণ্ট-এর মতবাদের বিরুদ্ধে। তিনি বলতেন : "অসুস্থ কাণ্টবাদ"। অসুস্থ কেন? যেহেতু কাণ্ট তাঁর নীতির ভিত্তি স্থাপন করেন সাধারণ সত্যের উপর, যেহেতু তিনি বলেন : "সর্বদা এমনভাবে ক্রিয়া কর যাতে তুমি প্রত্যাশা করতে পার তোমার ক্রিয়ার মূলনীতি বিশ্বজনীন নীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।" এখন, বারেস-এর মতে নীতির ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন বা নির্বিশেষ বলে কিছু থাকতে পারে না, থাকতে পারে শুধু সময়োপযোগী বিশেষ বিশেষ সত্য, যা স্থান ও ঘটনার দ্বারা রূপায়িত। সত্য আর শিব হল আপেক্ষিক বস্তু, এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিত সেটা হৃদয়ঙ্গম করা, 'মৃত্তিকা ও মৃতদের' শিক্ষা ও নির্দেশ শ্রবণ করা।

এ হল নতুন আকারে সেই পুরনো জার্সেনিজম্-বিরোধী কলহের পুনরারম্ভ। এ হল মোরাস এবং 'আকসিয়' ফ্রাঁসেজ'-এর মতবাদ : "রাজনীতি আগে"। এ হল বাঁজাকারে দ্রেফ্যুস ঘটনার সময়কার কর্ণেল আঁরির "দেশপ্রেমিক ধাপ্পাবাজি"র সাফাই; অর্থাৎ সত্যের জন্যে মাথা না ঘামিয়ে সময়োপযোগী ও ফলপ্রদ ভেবে ভুয়া দলিল তৈরী করা, যার মূলে সেই বিখ্যাত সূত্র : "উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে উপায় খারাপ হলেও চলে"। এ মতবাদ অতিশয় চমৎকার এবং অতিশয় ফলপ্রদ মনে হতে পারে ততদিনই যতদিন তা একাই কাজে লাগানো যায়। কিন্তু যখন শত্রু তা আয়ত্ত করে তখন উল্টো সুর আরম্ভ হয়। *Les Amitiés Françaises* গ্রন্থে পত্র ফিলিপ বারেসকে বাস্তববুদ্ধি নিয়ে বেশ মজা ক'রে শেখানো চলে যে, জার্মানদের আত্মা নেই, অতএব তাদের সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। কিন্তু জার্মানরা যখন অল্প দিনের মধ্যে ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে আমাদের বিরুদ্ধে, তখন তাদের ঠেকায় কে? দেখা গেল প্রতিবেশী শত্রু-জাতির দ্বারা গৃহীত হয়ে বারেস-এর চমৎকার মতবাদের চোট ফিরে এল আমাদের উপর, ভয়ঙ্কর আগুন উল্টোদিকে ছড়িয়ে আমাদের পোড়াল। হিটলারের মধ্যে আমি চিললাম বারেস-এর শিক্ষা।...

Déracinés-র প্রকাশকাল থেকেই আমি বারেস-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, অন্তত তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে। তখন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আমি কখনো ক্ষান্ত হইনি। এমন অবিশ্রাম সে-বিদ্রোহ যে, মাসিস তাঁর *Jugements* বইতে রায় দিলেন যে, বারেস-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল আমার লেখার একমাত্র মূলকারণ এবং বারেস না থাকলে আমার অস্তিত্ব নেই (অবশ্যই সাহিত্যিক অস্তিত্ব)। মাসিস-এর বক্তব্য সত্ত্বেও বারেস-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উচিত কারণ যে আমার ছিল, দুর্ভাগ্যবশত তা পরবর্তী ঘটনাবলী ভালো-ভাবেই প্রমাণ করেছে। কারো কারো কী অন্ধতাই না ছিল! আজ হোক কাল হোক এর পরিণতি যে কি তা বুঝতে কী বিলম্বই না হল তাদের! তাই L'Action Française টিকে রইল। মনে হয়, আজকের তরুণ ফরাসীরা বারেসকে আর বিশেষ পড়ে না (তারা ভুল করে), অন্তত তারা তাঁকে আর বিশেষ অনুসরণ করে না (তারা ঠিক করে)। একটা অদ্ভুত জিনিষ, তাৎপর্যপূর্ণও বটে : আজ বিপক্ষ শিবিরেই, কমিউনিস্টদের মধ্যেই আপেক্ষিক মতবাদের মারাত্মক ক্রিয়া টের পাওয়া যাচ্ছে। 'উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে উপায় খারাপ হলেও চলে'—এই নীতির। বিচারবুদ্ধিকে বিগড়ে দেবার, কখনো কখনো

চিরকালের মতো, আশ্চর্য ক্ষমতা এই নীতির। রাজনীতিক জীবনের মতো ব্যক্তিগত জীবনেও তা চরম ক্ষতিকর ভ্রান্তির কারণ। আমি মনে করি, সত্যকে (তাকে যদি ঈশ্বর বলতে চান তো বলুন) কখনো ফাঁকি দিয়ে চলা যায় না, চলতে গেলে শাস্তি পেতে হয়ই।

মোরাস-এর মতো বারেসও ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না। মৃত্তিকা ও মৃতদের' কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধর্ম তাঁর সুবিধাবাদেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তা তাঁর হৃদয় ভাবালুতায় স্পর্শ করত, কিন্তু নির্বিশেষভাবে তাঁকে কিছু দেয়নি। *Les Amitiés Françaises* গ্রন্থে তিনি তাঁর পুত্রকে শিক্ষাদানের সূত্রগুলি বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে সর্বপ্রধান হল শিশু ফিলিপ-এর মনে "আমাদের মৃত্তিকা ও মৃতদের" প্রতি আনুরক্তি সঞ্চার করা। সেটাই তাঁর কাছে একেবারে গোড়ার কথা। "আমাদের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের উপলব্ধি" তিনি তাঁর পুত্রকে দান করতে চান, "তার সহজাত প্রবণতার পরিবর্তে এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা" ঠিক ক'রে দিতে চান।.....

কিন্তু বারেস-এর রচনার যে-সব পৃষ্ঠায় এই "সহজাত প্রবণতা" অবাধে প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিরই বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। যখনই এই লরেনবাসী তাঁর অভিপ্রায়ের কথা না ভেবে নিজেকে ছেড়ে দেন, যা তিনি হতে চান তা হতে ভুলে যান, স্বাভাবিক হতে সম্মত হন, অর্থাৎ নিছক লরেনবাসী না থেকে মানুষ হন, তখনই তাঁর রচনা আমাদের নাড়ায়, এখনও নাড়ায়।

কারণ আমাদের ফরাসী সংস্কৃতির মহত্ত্ব, মূল্য, ইষ্ট হল এই যে, তা স্থানীয় কৌতূহলের বস্তু নয়। যে-সব চিন্তাপদ্ধতি, যে-সব সত্য সে আমাদের শিক্ষা দেয় তারা বিশেষভাবে লরেনীয় নয়, সুতরাং প্রতিবেশী জাতি তাদের গ্রহণ করলে আমাদের উপর উল্টে চোট লাগবার কোনো বিপদ নেই। তারা সর্বজনীন, মানবিক, বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করবার উপযোগী। যেহেতু তাদের মারফৎ প্রত্যেক মানুষ নিজেকে জানবার শিক্ষা নিতে পারে, নিজেকে চিনতে ও অন্যের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করতে পারে, সেই হেতু তাদের ক্রিয়াবিভাগও বিরোধের দিকে নয়, মৈত্রীর দিকে।

এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই, যার গুরুত্ব আমার মতে সর্বাধিক। ফরাসী সাহিত্যের গতি শুধু একমুখী নয়। ফরাসী চিন্তা তার বিকাশের ও তার ইতিহাসের সর্ব যুগে আমাদের সামনে ধরেছে এক কথোপকথন, এক প্রাণস্পর্শী অবিশ্রান্ত কথোপকথন, যা আমাদের হৃদয় ও মন উভয়কেই মাতিয়ে রাখবার মতো। এ কথোপকথন শুনলেই তাতে যোগ দিতে হয়। যে-তরুণ মন আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎসুক এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক, আমার বিশ্বাস সে-মন বিকৃত হয়ে যাবে যদি এই কথোপকথনে মাত্র একটি কণ্ঠই সে শুনতে পায় বা তাকে শুনতে দেওয়া হয়। এ কথোপকথন মোটেই রাজনীতিক দক্ষিণ ও বামের মধ্যে নয়; তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও মৌলিক। এ হল লৌকিক ঐতিহ্য, স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের বশ্যতা এবং স্বাধীন চিন্তা, তর্ক করবার, পরীক্ষা করবার মনোভাব, যা ধীরে ধীরে মানুষের মস্তিষ্কে এগিয়ে আনে—এ দুয়ের মধ্যে কথোপকথন। আমরা এর সূত্রপাত দেখতে পাই আবেলার এবং খৃষ্টি ধর্মসংঘের মধ্যে সংগ্রামে। বলা বাহুল্য, খৃষ্টি ধর্মসংঘ সর্বদাই জয়ী হয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকবার তার প্রথম ব্যূহের মধ্যে অনেকখানি হটে গিয়ে এবং তার অবস্থানকে নতুন ক'রে সাজিয়ে তবেই জয়ী হয়েছে। ঐ কথোপকথন আবার সুরু হয়েছে ম'তেএ-র বিরুদ্ধে পাস্‌কাল-এর দ্বন্দ্বে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কোনো বাক্যবিনিময় হয়নি, কারণ পাস্‌কাল যখন কথা বলতে আরম্ভ করেছেন তখন

ম'তেঞ্জ-র মৃত্যু হয়েছে। তবু ম'তেঞ্জ-কে উদ্দেশ ক'রেই পাস্‌কাল-এর কথা। শুধু মসিয়ো দ্য সাসি'র সঙ্গে সেই বিখ্যাত আলাপেই নয়। ম'তেঞ্জ-র *Essais*-র বিরুদ্ধেই এবং তাকে ভিত্তি ক'রেই পাস্‌কাল-এর *Pensées*। ম'তেঞ্জ সম্বন্ধে তিনি বলেন : "নিজেকে চিত্রিত করার মূর্খ পরিকল্পনা তাঁর হয়েছিল"। একথা কিন্তু তখন পাস্‌কাল অনুমান করতে পারেননি যে, *Pensées*-র যে-সব অংশে তিনি, পাস্‌কাল, তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর সংশয়সুদ্ধ নিজেকে চিত্রিত করেছেন সেই সব অংশ তাঁর গোঁড়া ধর্মমতের বিবরণের চেয়ে আমাদের আজ অনেক বেশী স্পর্শ করে। ঠিক ঐরকম, বসুয়ে-র মধ্যে যা আমরা আজ প্রশংসা করি তা তাঁর সেকেলে ধর্মতত্ত্ব নয়, তা হল তাঁর অপূর্ব ভাষার নিখুঁত শিল্প, যার গুণে তিনি আমাদের সাহিত্যের এক অসামান্য লেখকরূপে গণ্য। এ শিল্প না থাকলে আজ তাঁকে কেউ আর বিশেষ পড়ত না। যে-ফর্মুকে তিনি ধর্মের দিক থেকে অবান্তর মনে করতেন সেই ফর্মের জন্যেই তিনি বেঁচে আছেন।

যুগের পর যুগ বার বার আরব্ধ কথোপকথন, ক্ষান্তি নেই তার। স্বাধীন চিন্তার তরফে তা অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন। বিচক্ষণতার ফলেই। আমাদের ধর্মশাস্ত্র-কথিত সেই "সাপের বিচক্ষণতা", কারণ মনকে লুব্ধ করে, মুক্তি দেয় যে-শয়তান সে ইচ্ছে ক'রেই অস্ফুট স্বরে কথা বলে। সে আভাষ দেয়, আর ধর্মবিশ্বাসী জোর গলায় ঘোষণা করে। তাই দেকার্ত-এর মন্ত্র হল : "আমি মুখোস পরে এগোই।"

কখনো কখনো দুই কণ্ঠের মধ্যে একটি জয়ী হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জয়ী হল স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠ; সে তখন আর মোটেই মুখোস-পরা নয়। সে এতদূর জয়ী হল যে গীতিময়তা স্বভাবতই শুকিয়ে গেল। কিন্তু ঐ কথোপকথনের সমতা ফ্রান্সে কখনো বেশী দিনের জন্যে নষ্ট হয়নি। শাতোব্রিয়াঁ ও লামার্তিন-এর সঙ্গে ধর্মানুভূতি, যা গীতিময়তার উৎস, আবার অপূর্বভাবে উৎসারিত হল। রোমাণ্টীসিজ্‌ম্‌-এর বিরাট তরঙ্গ উঠল। মিশ্‌লে ও য়ুগো সমস্ত ধর্মসঙ্ঘের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু দাঁড়ালেন এক গভীর ধর্মানুভূতির প্রেরণা নিয়ে।

এক ধার থেকে আর এক ধারে দুলে দুলে ফরাসী সংস্কৃতির তরণী এগিয়ে চলেছে তার দুঃসাহস যাত্রায়। সে চলেছে, ডুববে না। তার ডোবার সম্ভাবনা দেখা দেবে, ডুববেও সে, সেইদিন যেদিন ঐ কথোপকথনের এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর নিশ্চিতভাবে জয়ী হবে, তাকে স্তব্ধ ক'রে দেবে। নৌকো সেদিন একদিকে একেবারে হেলে পড়বে।

আমাদের কালে আমরা ক্যাথলিক লেখকদের এক বিরাট স্ফুরণ দেখছি। উইস্‌মাঁস ও লেয়ঁ রোয়ার পরে জাম্‌, পেগি, ক্লোদেল, মরিয়াক, গারিয়েল মার্‌সেল, বের্‌নানস, মারিত্যাঁ। আবার অন্যদিকে প্রুস্ত ও সায়ুরেস-এর উল্লেখ না ক'রেও বলা যায়, একা বিরাট ও অটল ভালেরি তাঁদের সকলের ভারসাম্য ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। সমালোচক-মন কোনো কালে এত বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনবদ্যভাবে ব্যাপৃত হয়নি, এমন আশ্চর্যভাবে সৃজনশীল হয়নি। অস্কার ওয়াইল্ড-এর বাক্য মনে পড়ে : "কল্পনা অনুকরণ করে, সমালোচক মন সৃষ্টি করে।" এ বাক্য বোদলের-এরও হতে পারত এবং প্রত্যেক লেখক এর অনুধ্যান করলে লাভবান হবেন। (বলা বাহুল্য, অন্যকে সমালোচনা করা নয়, নিজেকে সমালোচনা করার কথা এটা)। কারণ, কল্পনা যে বহু বিচিত্র ছায়ামূর্তি বিশৃঙ্খলভাবে আমাদের সামনে ধরে, তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক চিত্রের গোড়ার কথা হল নির্বাচন। আর ফ্রান্স বলতে একটা চিত্রণধারার কথা আমার মনে আসে, যার আমি সবচেয়ে অনুরক্ত।

যখন আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধু মিলে *Nouvelle Revue Française* স্থাপন করেছিলাম, যে-পত্রিকা পরে এক অপ্রত্যাশিত গুরুত্ব অর্জন করে, তখন লোকে ভেবেছিল একটা ছোট দল তৈরী হল এবং, যা প্রায়ই দাঁড়ায়, একটা 'পারস্পরিক প্রশংসা সমিতি'। কিন্তু আমাদের ছিল ঠিক তার উল্টো, বলতে পারা যায় 'সমালোচনা সমিতি', পারস্পরিক সমালোচনার। তরুণ বয়সে যখন সাহিত্যিক হওয়া যায় তখন আত্মপ্রসাদের প্রতি সাধারণত খুব ঝোঁক থাকে। এই আত্মপ্রসাদকে আমরা ভয় করতাম, এতদূর ভয় করতাম যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা পত্রিকায় পরস্পরের সম্বন্ধে কিছু বলব না। কিন্তু কোন পাঠক আমাদের এই বিবেচনা লক্ষ করেননি; কারণ নীরবতা লোকে লক্ষ করে খুব কমই, যদিচ প্রায়শ নীরবতারই তাৎপর্য ও গুরুত্ব সর্বাধিক।

Nouvelle Revue Française-এর আর একটা বিশেষত্ব ছিল, যা লোকে অবশ্যই লক্ষ করেছে, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেছে কমই। তা এই যে আমাদের পত্রিকা যে-সব লেখা ছাপাত, একমাত্র গুণ বিচার ক'রেই ছাপাত, আদৌ তাদের প্রবণতা বিচার ক'রে নয়। যা চমৎকার তাই সে গ্রহণ করত, তার রং কি তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না তার। এর ফলে শুধু যা উৎকৃষ্ট তাই দিতে পারা যেত। এইভাবে *Nouvelle Revue Française*-এর মলাটের মধ্যে চলেছিল সেই বিরাট কথোপকথন যার সম্বন্ধে এইমাত্র বলেছি। আমাদের নিরন্তর ভাবনা ছিল চিন্তার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

ব্যাপারটা বাইরে থেকে খুব সামান্য মনে হয়, কিন্তু আসলে খুব বিরাট। আমার বিশ্বাস, একমাত্র আমাদের পত্রিকারই কোন দিকে উদ্দেশ্যপ্রবণতা ছিল না। এর ফলেই ক্লোদেল মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হতেন। তিনি প্রবলভাবে প্রতিবাদ করতেন, এমনকি তাঁর রচনা একেবারে প্রথমে দিলেও, যদি দেখতেন প্রুস্ত, সায়ুরেস, ভালেরি বা লেওতো এঁদের কারো রচনা, যা তাঁর বৈর মনে হত, তাঁর রচনার পাশে ছাপা হয়েছে। দল ও মত নির্বিশেষে গুণগ্রহণের এই নীতিই ছিল *Nouvelle Revue Française*-এর অসাধারণ সাফল্য ও অগ্রগতির মূলে, শুধু ফ্রান্সেই নয়, বিদেশেও। সত্যিকার মূল্য আছে এমন কোনো লেখক আমার জানা নেই যাঁকে আমরা প্রকাশ করিনি বা আশ্রয় দিইনি। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব লেখক তখন অজ্ঞাতই ছিলেন। অবশ্য আমি প্রাকযুদ্ধ *Nouvelle Revue Française*-এর কথা বলছি। নতুন পরিচালকমণ্ডলীর মনোভাবের দরুন তার প্রাচীন সহযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরা যখন বিদায় নিতে বাধ্য হলেন তার আগের কথা বলছি।

বিভিন্নমুখী রচনার সন্নিবেশে *Nouvelle Revue Française* ছিল চিন্তার একটা গোষ্ঠী। সমালোচনাই ছিল তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। সাহিত্যের অঙ্গন থেকে যত ভুয়া মূল্যের আবর্জনা দূর করবার এবং সুস্থ ও মহৎ ঐতিহ্যের চর্চা, চিন্তার শৈলী ও বিশ্বরূপায়ণের অনুশীলন পুনঃপ্রবর্তন করবার কাজ তার দান বিরাট।...নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে *Vieux Colombier* ছিল তার মানস-সন্তান।

তারপর এল যুদ্ধ। বিরাট, অন্ধকারময়। যা কিছুর প্রতি আমাদের হৃদয়ের অনুরাগ, তাকে এ যুদ্ধ বিপন্ন করল। বিপন্ন করল মানুষের মর্যাদা এবং আমাদের জীবনধারণের আদর্শ। আবার নতুন বনিয়াদের উপর আরম্ভ করতে হবে, আবার সব আরম্ভ করতে হবে। আমি বলছি : নতুন বনিয়াদের উপর। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিছক অতীতে প্রত্যাবর্তন এবং অতীতের প্রতি অনুরক্তিতে আমরা উদ্ধার পাব না। সব কিছুর সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন জাগাতে হবে।.....

গতকাল প্রয়োজন ছিল যোদ্ধার, আজ প্রয়োজন স্থপতির। পাওয়া যাবে স্থপতি। তাদের যে আজ প্রয়োজন হয়েছে তাইতেই তারা জন্মাবে। আহ্বানে সাড়া দেবে তারা। আমার খুব আশা আছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, আমাদের যুবসম্প্রদায় এই নিদারুণ ধাক্কার ফলে স্থিতিহীন। এক সর্বনাশ-চিহ্নিত আকাশের নীচে আজকের যুবকেরা, অন্তত এক্‌জিস্টানশিয়ালিস্ট গোষ্ঠী নামক তাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেন বারেস-এর শোচনীয় উক্তিকে আপন ক'রে নিয়েছে। বারেস-এর যে বইয়ের কথা বলছিলাম তাতেই আছে : "যে কোনো দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, বিশ্বজগৎ এবং আমাদের অস্তিত্ব এক অর্থহীন হট্টগোল।" বারেস-এর পরে, কিন্তু কামু, সার্ত্‌র্‌ ইত্যাদি আজকের একজিস্টানশিয়ালিস্টদের আগে মারত্যাঁ দ্যু গার (অন্তত তাঁর একজন নায়ক) এবং জাঁ রুস্তাঁ আমাদের শুনিয়েছেন : "আমরা এক উদ্ভট জগতে বাস করছি যেখানে কোনো কিছুর সঙ্গেই কোনো কিছুর অন্তর্মিল নেই।" আমি যুবকদের বলতে চাই, বিশ্বাসের অভাব মানুষকে উন্মার্গগামী করে। এই জগৎ যাতে কিছুর সঙ্গে মেলে তা তোমাদের উপর নির্ভর করছে। নির্ভর করছে মানুষের উপর। মানুষের থেকেই আরম্ভ করতে হবে। এই উদ্ভট জগৎ আর উদ্ভট থাকবে না। তোমাদের উপর তা নির্ভর করছে। জগৎ তাই হবে যা তোমরা তাকে করবে। তোমরা যতই আমাকে বলবে এবং বোঝাবার চেষ্টা করবে যে, এই জগতে এবং আমাদের এই আকাশে নির্বিশেষ ব'লে কিছু নেই, সত্য ন্যায় আর সৌন্দর্য মানুষের সৃষ্টি, ততই বেশী ক'রে আমি এই বুঝব যে, মানুষকেই তাহলে ওগুলো বজায় রাখতে হবে এবং তার সম্মানের প্রশ্ন এতে জড়িত।

এমন একটা দেশ নেই, তা সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যতদূরেই অবস্থিত হোক, যার উপরে নতুন সব সমস্যার ছায়া পড়েনি, এমন কোনো জাতি নেই যে সকলের সঙ্গে একই ভাবনায় কিছু না ভাবিত, চিন্তাশীল এমন কোনো যুবসম্প্রদায় নেই যে উদ্বিগ্ন ও গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করছে না। অন্য কোনো প্রমাণ দেখাতে চাই না, মিশর থেকে চ'লে আসার আগে আমি যে-পত্র পেয়েছি সেটিই যথেষ্ট। পত্রলেখক বাগদাদের এক ছাত্র। সে লিখেছে :

"একজন অপরিচিত লোক আপনাকে পত্র লিখছে ব'লে ক্ষমা করবেন। আমি মনে করি, লেখক যা লেখেন তার জন্যে দায়ী থাকেন। আপনি আপনার রচনাবলীর ভিতর দিয়ে আমাদের অভ্যস্ত করেছেন এক শাশ্বত ও সঞ্জীবনী উৎকণ্ঠায়। যে-পুরুষ (generation) পূর্ব থেকে উৎসর্গীকৃত, তার পক্ষে আপনার শেখানো এই উৎকণ্ঠাই একমাত্র আশা।"

এ কথা শুনলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ফ্রান্সে ও অন্যত্র এ কথা আমি অনেকবার শুনেছি : অনেক যুবক মনে করে তারা এক "উৎসর্গীকৃত পুরুষে"র লোক। আমি যে সর্বান্তঃকরণে এই ধারণার প্রতিবাদ করি, তা বলাই বাহুল্য।

ঐ যুবক চিঠিতে লিখেছে : "আমি আরও বেশী বলব : এই উৎকণ্ঠাই আমাদের একমাত্র মহত্ত্ব। মোট কথা, আপনার শিক্ষার সার হল এই যে, আগে থেকেই আমাদের কিছু মেনে নেওয়া বা স্বতঃসিদ্ধ মনে ক'রে নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমার বন্ধু 'ক' আপনার কাছ থেকে যে-পত্র পেয়েছে তা প'ড়ে সত্যি কথা বলতে আমি অবাক হলাম। তাতে আপনি তাকে আশা রাখতে বলেছেন, কারণ নাকি 'আশা ব্যতিরেকে আত্মা জীর্ণ হয়, নির্জীব হয়ে পড়ে'।"

এখানে বলি, যে-যুবকের বিষয় এই পত্র-লেখক উল্লেখ করেছে তাকে আমি চিনতাম না। সে আরবী ভাষায় আমার সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছিল। তা আমি পড়তে পারিনি, তবু

আমার শুভেচ্ছা জানবার জন্যে তাকে আমি কিছু লিখি। স্বভাবতই আমার বক্তব্য তাতে স্পষ্ট হতে পারেনি।

অতঃপর পত্রলেখক বলেছে : "হে গুরু, আশা অবলম্বনের প্রস্তাব আপনি এখন আমাদের কাছে করতে পারেন না। এই যে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার কাল সুরু হয়েছে তার মধ্যে আশা অবলম্বনের অর্থ হল পতিত হওয়া, কারণ আমাদের জীবনকালে যদি কখনো উৎকৃষ্টতর দিনের মুখ দেখতে পাই আমরা, তা নিশ্চয়ই আশায় তুষ্ট হওয়ার ফলে দেখতে পাব না। না, আশা করলে চলবে না ; নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। আমি মনে করি সেই আমাদের একমাত্র ন্যায্য মনোভাব এবং একমাত্র তাইতেই আমাদের সততা বজায় রাখা সম্ভব। আপনি আমায় বলুন এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি এবং আমি ঠিক বলেছি কিনা। আপনার রচনা যা কিছু আমি পড়েছি তা থেকে আমার ঐ ধারণাই হয়েছিল। সেই জন্যে আমার বন্ধুর কাছে লেখা আপনার চিঠি আমাকে সন্ত্রস্ত করেছে। আমার মনে হল, মহত্ত্বে আমাদের যে শেষ অধিকার তা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে ঐ চিঠিতে। সত্যি কিনা বলুন।"

অপূর্ব পত্র। কিন্তু কি উত্তর দেব এমন পত্রের? আমাকে তা আরো নাড়িয়েছে এই কারণে যে, পত্রটি এসেছে এমন এক দেশ থেকে যাকে আমি সুদূর মনে করেছি, মনে করেছি বিগত ঘটনাবলী তার গায়ে বিশেষ কোনো চোট রেখে যায়নি এবং আমাদের সংস্কৃতিকে তেমনভাবে অনুভব করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার উত্তর কিন্তু খুবই সহজ।

যে-কালে মানুষের মূল্য, সম্মান ও মর্যাদা এমন বিপন্ন, চারদিক থেকে এমন অবরুদ্ধ, সেইকালে আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা হল এই কথা জানা যে, যুবকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, সংখ্যায় যতই কম হোক এবং যে দেশেরই হোক, যারা সদা জাগ্রত, যারা তাদের নৈতিক ও মানসিক সততাকে অটুট রাখছে এবং সমস্ত ডিক্টেটরী হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, চিন্তাকে দাবিয়ে দিতে ও শৃঙ্খলিত করতে, আত্মাকে নষ্ট করতে উন্মুখ সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। এইসব যুবক রয়েছে বলেই আমরা অগ্রগেরা বিশ্বাস রাখতে পারছি। আমি খুব বৃদ্ধ হয়েছি। শীঘ্রিই জীবন থেকে বিদায় নিতে হবে। তবু এই কারণেই আমি হতাশা নিয়ে মরব না।

আমি অল্প কিছু লোকের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করি, আমি অল্প সংখ্যকের গুণে বিশ্বাস করি।

পৃথিবীকে বাঁচাবে কয়েকজন।

অনুবাদ : **অরুণ মিত্র**

আলোচনা

ভাষার অর্থ লইয়া আলোচনা বাংলা ভাষায় কমই আছে। 'শিল্পতত্ত্বের' (sic) বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে (শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু—অমলেন্দু দাশগুপ্ত। 'চতুরঙ্গ', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩) দাশগুপ্ত মহাশয় ভাষার অর্থের আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে সাধারণতঃ শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় আমরা যে সমস্ত শব্দ পাইয়া থাকি তাহার "রহস্যালোকে একবার প্রবেশ করলে বোঝা যায় কেন জনৈক আধুনিক দার্শনিক শিল্পতত্ত্বের আলোচনাকে বলেছেন 'boring . . . and largely bogus' ।" তিনি আরও মনে করেন যে, "শিল্পতত্ত্ব নিয়ে এ যাবৎ যত দীর্ঘ ও জটিল তর্ক হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভাষার অর্থ সম্বন্ধে বোঝাপড়ার অভাবেই তর্কের মীমাংসা কঠিন হয়েছে।"

মনে হয় দাশগুপ্ত মহাশয় উইট্‌গেনষ্টাইনের মতবাদের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে "শব্দের অর্থ তার ব্যবহারে।" অত্যাধুনিক চিন্তারাজ্যে ইহাকে ভাষার ব্যবহারিক অথবা প্রায়োগিক অর্থবাদ বলা যায়। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরবর্তী আলোচনা এই উক্তির 'যথা যাথ্যে' (sic) সন্দেহের সৃষ্টি করে।

"শব্দের অর্থ তো শুধু তার অভিধানগত বস্তু বা ভাবসত্তাই নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে আলোচনা-রত ব্যক্তিবর্গের মনের আরো অনেক কিছু।" অভিধানে আমরা শব্দের অত্যন্ত সাধারণ প্রচলিত ব্যবহারই পাইয়া থাকি। অভিধান নির্দিষ্ট ব্যবহার ছাড়াও শব্দের অনেক প্রকারের ব্যবহার আছে। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয়ের "মনের আরো অনেক কিছু" বস্তুটা কি? তাঁহাকেও কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে এই "মনের আরো অনেক কিছু"-ই চিন্তারাজ্যে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি অন্যের মনের খবর কোথা হইতে পাইয়াছেন? তিনি নিজের মনের খবরই বা কি করিয়া পান? 'মন' শব্দের অর্থ কি? এইসব প্রশ্ন দাশগুপ্ত মহাশয় একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছেন। যদি না এড়াইতেন তাহা হইলে "প্রতীকধারীদের" (sic) কথা বলিতে পারিতেন না। প্রতীকধারী ও প্রতীকে কি তফাৎ তাহাও তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই। হয়ত এইরূপ বিশ্লেষণ তাঁহার মতের পরিপন্থী হইবে বলিয়াই তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণী মনকে আরো একটু যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে তিনি মূরীয় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ অথবা বাহিরার্থবাদ আর উইট্‌গেনষ্টাইনীয় ভাষার প্রয়োগিক অর্থবাদের খিচুড়ী পরিবেশন করিতে পারিতেন না। মূরীয় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত উইট্‌গেনষ্টাইনের 'ট্রেক্‌টেটাস্‌ লজিকো ফিল-সফিকাস্‌' পুস্তকের এক সমন্বয়ের চেষ্টা হয় ত করা যাইতে পারে। কিন্তু উইট্‌গেনষ্টাইন তাঁহার অর্থের ব্যবহারবাদ 'ট্রেক্‌টেটাস'-এ দেন নাই। দাশগুপ্ত মহাশয় নিশ্চয়ই উইট্‌গেনষ্টাইনের 'ট্রেকটেটাস্‌ লজিকো ফিলসফিকাস্‌' ও 'ফিলসফিক্যাল ইনভেষ্টিগেসনস্‌'-এর তফাৎ জানেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন 'প্রতীকধারী' তাঁহার আলোচ্য বিষয় নয়; প্রতীকই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"...অর্থের ব্যবহারিক ভিত্তির কথা স্মরণ করে প্রতীকের তথাকথিত 'আসল' অর্থ অন্বেষণ থেকে নিরস্ত থাকলে তত্ত্ব আলোচনার অনেক বিভ্রান্তি কমবে।"

তাঁহার 'প্রতীকধারীর' শ্রেণীবিভাগ এই 'আসল' অর্থেরই নামান্তর নয় কি? ইহাতে কি তিনি অর্থের প্রতিষঙ্গবাদের অথবা স্বারূপ্যবাদের গন্ধ পান নাই? তাহা হইলে তাঁহার অর্থের ব্যবহারিকবাদ কোথায় গেল?

দাশগুপ্ত মহাশয় 'নির্বস্তুক' গুণের (sic) কথা বলিয়াছেন। ইহা আবার কি বস্তু? মূর সাহেব নিজেই ত বলিয়াছেন যে—'বস্তুর গুণ' ও 'নির্বস্তুক গুণের' মধ্যে তিনি তাঁহার 'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' পুস্তকে যে তফাৎ দেখাইয়াছিলেন তাহা "not only silly but preposterous." কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয় মূর সাহেবকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মূর সাহেব

তাঁহার স্বীকৃতি সত্ত্বেও 'নির্বস্তুক গুণ'কে ভাবসত্তা বলিতে পারেন নাই। দাশগুপ্ত মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন। যদি ইহা ভাবসত্তাই হয় তাহা হইলে ইহা কোন অর্থে 'গুণ'? ভাবসত্তা বলিতে দাশগুপ্ত মহাশয় হয়তো প্রক্ষোভকে বুঝাইতেছেন। প্রক্ষোভকে আমরা জানি না। প্রকাশ করি, আর সেই প্রকাশকে আমরা জানি। দাশগুপ্ত মহাশয় শব্দের যথাযথ প্রয়োগের পক্ষপাতী। তাঁহার এই চেষ্টার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। "জানা", "অনুভব" করা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নির্ণয় করিলে তাঁহার ধারণা আরও স্পষ্ট হইত। তিনি উইট্‌গেনষ্টাইন, গিলবার্ট রাইলে, উইস্‌ডম্‌ প্রভৃতির মতবাদের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। তাঁহাকেও কি এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে?

তিনি উইট্‌গেনষ্টাইনের "the craving for generality" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "একটু বিচার করলে দেখা যাবে যে এই ধরনের উক্তির মধ্যে পরিহাস যতটা আছে, যুক্তি ততটা নেই।" কিন্তু ইহার পরেই তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হয় ত উইট্‌গেনষ্টাইনীয় মতবাদকেই সমর্থন করে। দাশগুপ্ত মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করেন তাহা হইলে বলিব যে, আশা করি 'সার্বিক' সম্বন্ধে উইট্‌গেনষ্টাইনের মতবাদ তাঁহার ভালভাবেই জানা আছে। অবশ্য তিনি যদি মনে করেন সার্বিক-এরও একটা অস্তিত্ব আছে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। গিলবার্ট রাইলের মতবাদ তাঁর জানা আছে; আশা করি তিনি জাতি-ভ্রান্তি (category mistake) করিবেন না।

ইহার পরেই তিনি অধ্যাপক রিচার্ডস্‌-এর সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপের উল্লেখ করিয়াছেন। বুঝিতে পরিলাম না কেন তিনি মনে করেন "এই পত্রালাপ থেকে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যাঁরা আধুনিক অর্থতাত্ত্বিক বিচারপদ্ধতিতে আর্ট বা এস্‌থেটিক্‌স-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁরাও তাঁদের অস্বীকৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অথবা ফলাফল বিশ্লেষণ করতে নারাজ।" মনে হয় তাঁহার প্রধান যুক্তি "How can discussion on an *unreal* subject have *real* significance?" যদি আমি কোন কিছুকে অর্থহীন বলি, তাহা হইলে সেই অর্থহীন-এরও একটা অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। (ডায়েলেক্‌টিক্‌সের অপপ্রয়োগ!) ইহাই দাশগুপ্ত মহাশয়ের যুক্তি। Unreal subject-এর discussion কেন real significance পাইবে না, তাহা বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। আমি যদি বলি 'সোনার পাহাড়' অবাস্তব, তাহা হইলে সোনার পাহাড় সম্বন্ধে আমার উক্তি কেন *real* significance পাইবে না? আর সোনার পাহাড়ই বা তাতে কি করিয়া *real* হইয়া যাইবে? দাশগুপ্ত মহাশয় যতই অর্থের ব্যবহারবাদের কথা বলুন না কেন তাঁহার মন কিন্তু সেই অর্থের প্রতিষঙ্গবাদেই আটকাইয়া আছে।

ইহার পরবর্তী অংশেই তিনি "আর্ট বস্তুর মধ্যে......প্রকৃতিগত সাধারণ ক্ষেত্র" খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মনে হয় তিনি একপ্রকার বস্তু-সার্বিক-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না। একটু পরে তিনি নিজেই বলিতেছেন "আরেক ধরনের প্রশ্ন আছে। যথা, সৌন্দর্য বা শিল্পরসের স্বরূপ কী; ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস এই সব প্রশ্ন নিয়ে কোন যুক্তিগ্রাহ্য ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ এ-সব প্রশ্নের প্রাক্‌-স্বীকৃত অনির্দেশ্য মূল্য বোধ।" দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে শব্দের অর্থ তার ব্যবহারে। 'সৌন্দর্য,' 'শিল্প,' 'শিল্পরস' প্রভৃতি শব্দ এবং তাহাদের সমার্থক ও সহার্থক শব্দের ব্যবহার নির্ণয় করাই তাঁহার শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত ছিল। তাঁহাকে কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে উইট্‌গেনষ্টাইন্‌ ও মূরের সমন্বয় চেষ্টা অপচেষ্টারই নামান্তর। দু'টি মতবাদকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

দাশগুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে অর্থের ব্যবহারবাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোথা হইতে সেই পুরানো "বস্তু-সত্তা নির্ভরতা" (sic.), 'ভাব-সত্তা' (sic) ইত্যাদি আসিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, এবং একপ্রকার অধিবিদ্যার পথে তাঁহাকে চালিত করিয়াছে।

শিল্পতত্ত্বের ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যবহারই শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু। (এই স্থলে 'শিল্প-তত্ত্ব' বলিতে কোন এক বিশেষ এবং সাধারণ তত্ত্বকে বুঝিতেছি না। শিল্প সম্বন্ধে কথা বলিতে আমরা যে শব্দসমষ্টির ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাই শিল্পতত্ত্বের উপাদান। এই উপাদানের উর্ধ্বে

কোন শিল্পতত্ত্ব নাই।) শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন আর শিল্প-তাত্ত্বিক সেই শিল্প সম্বন্ধে কথা বলেন। সেই কথার অর্থ নিহিত আছে তার ব্যবহারে। আমরা যাহা জানি তাহা প্রকাশ করিতে পারি। যাহা জানি না তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। সেই না জানার বিষয় আলোচনা নিরর্থক। যাহা প্রকাশ করি এবং যে ভাষায় প্রকাশ করি তার অর্থ ভাষার ব্যবহারে। এই ব্যবহার ভাষার ব্যাকরণের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। ব্যবহারের ঊর্ধ্বে কোন ভাষা নাই। যাহা ভাষায় প্রকাশ করি তাহাও ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করি।

পরিশেষে দাশগুপ্ত মহাশয়ের ইংরেজী শব্দের বাংলা করিবার প্রচেষ্টার উপরে কয়েকটি মন্তব্য করিব। তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু কয়েকটি শব্দ প্রসঙ্গে আমার কিছু আপত্তি আছে। Factএর বাংলা যদি 'বস্তু' হয় তাহা হইলে 'Thing', 'Object', ইত্যাদি শব্দের বাংলা কি হইবে? 'তথ্য' কি দোষ করিল বুঝিতে পারিলাম না। 'a priori' শব্দের বাংলা কেন 'প্রাক্‌সর্বীকৃত' হইল তাহাও বোধগম্য হইল না। কাণ্ট-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'a priori' শব্দের অর্থ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ (independent of experience)। যে তত্ত্ব, 'a priori' সেই তত্ত্বে আমাদের অভিজ্ঞতা কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। এই অর্থেই কাণ্টের 'a priori' অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। (কাণ্টীয় 'a priori'-এর অনেক রকম বিশ্লেষণ পরবর্তী পণ্ডিতরা করিয়াছেন, কিন্তু এইসব ব্যাখ্যানের মধ্যে যাহা মোটামুটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাই বলিলাম। ব্যাখ্যানের কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন।) কাণ্টের পরে কোন চিন্তাবীর এই শব্দকে অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। 'সত্তা' কথাটির বহুল ব্যবহারে আমার আপত্তি আছে। 'সত্তা'র ইংরেজী মানে যদি existence হয় তাহা হইলে কথাটার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের আরও সচেতন হইতে হইবে।

মোহিতকুমার হালদার

আলোচনার উত্তর

যেহেতু আমার প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উইটগেনস্টাইনের নাম উল্লেখ করেছিলাম এবং যেহেতু মোহিতবাবু নিজের পাণ্ডিত্য ও বিবেচনায় আমার কোনো বক্তব্যের সঙ্গে উইটগেনস্টাইনের কোনো মতের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, সেইহেতু তাঁর দাবি এই যে, উইটগেনস্টাইনের মত অনুসরণ না করে আমার গতি নেই। কিন্তু হঠাৎ আবার তিনি মূরের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। এতে তিনি বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। "মনে হয় দাশগুপ্ত মহাশয় উইটগেনস্টাইনের মতবাদের পক্ষপাতী।" মনে হওয়ার দায়িত্ব মোহিতবাবুর। তাঁর আরো মনে হয় এই মতবাদের সঙ্গে "মূরীয় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ" মিশে গেছে, কারণ আমি *Tractatus* এবং *Philosophical Investigations*-এর তফাৎ ভুলে গিয়েছি। এও তাঁর প্রথম মনে হওয়ার ফল। আমার বিনীত নিবেদন এই মূর বা উইটগেনস্টাইন, রাইল বা উইজডম—কারুর সঙ্গেই আমার মূল বক্তব্যের কোনো কারবার নেই। আমার বিচার-বুদ্ধিতে আমি যা স্থির করতে পেরেছি তাই আমার প্রবন্ধে পেশ করেছি। কোনো পণ্ডিতপ্রবরের মতবাদের চর্বিতচর্বণ করবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা কোনোটাই আমার নেই। সে কাজ তারাই করবেন যাদের, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প"। আমার বক্তব্যে যদি মূর ও উইটগেনস্টাইন অথবা *Tractatus* ও *Philosophical Investigations*-এর ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। কারণ যে খিচুড়ি মোহিতবাবু খুঁজে পেয়েছেন সেটা তাঁর-ই মস্তিষ্কপ্রসূত।

এই অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক আক্ষেপের বাইরে মোহিতবাবুর কি বক্তব্য দেখা যাক। উনি বলছেন, "অভিধানে আমরা শব্দের অত্যন্ত সাধারণ প্রচলিত ব্যাবহারই পাইয়া থাকি।" অভিধানে থাকে সমার্থক শব্দ, কোনো কোনো সময় দু'একটা প্রচলিত ব্যাবহারের রূপ। ব্যাবহার কী করে পাওয়া যায়? "মনের আরো অনেক কিছু" বলতে আমি প্রধানত অর্থের নিম্নোক্ত উপাদানগুলিকে

ধরেছি : (১) অভিব্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধে বক্তার মনোভাব (feeling or attitude of the speaker about the state of affairs), (২) শ্রোতার প্রতি বক্তার মনোভাব (tone or attitude of the speaker to his listener) এবং (৩) বক্তার উদ্দেশ্য (the speaker's intention or the effect he seeks to promote)। অভিধানে যা থাকে তা থেকে আমরা বড়োজোর পেতে পারি a general conceptual equivalent of a state of affairs। এই সব কিছু নিয়েই বক্তার সম্পূর্ণ অর্থ।

"মন" শব্দের ব্যবহার নিয়ে মোহিতবাবু রসিকতা করবার চেষ্টা করেছেন। এটা আজকাল প্রায় পুরোনো, যদিও mind বা other minds নিয়ে সমস্যা মেটেনি। আমার নিজের মনের খবর কী করে পাই? বলতে পারতাম যে ঠিক একই উপায়ে যাতে মোহিতবাবুর "মনে হয়" যে আমি উইটগেনস্টাইনের মতবাদের পক্ষপাতী। অপরের মন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরেও বলা চলতো যে যেই প্রক্রিয়ায় মোহিতবাবু আমার মন সম্বন্ধে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত করে নিয়ে আলোচনা সুরু করেছেন আমারও সেই পথ। কিন্তু এই তুলনায় আমি নিজেই একটু অস্বস্তি বোধ করবো, কারণ প্রক্রিয়া মূলত একই প্রকৃতির হলেও ব্যক্তিবিশেষে ফলাফলের তারতম্য হয় দেখতে পাচ্ছি।

আর এক প্রশ্ন "নির্বস্তুক গুণ" নিয়ে। আমার প্রবন্ধেই আমি বলেছি নির্বস্তুক গুণ মানে non-natural quality or value। যেহেতু value, সেইহেতু মূল্যসত্তা বা ভাবসত্তা। অন্য কোনো বাংলা শব্দ যদি মোহিতবাবু ব্যবহার করতে চান আমার আপত্তি নেই। কিন্তু নির্বস্তুক গুণ যে কী বস্তু সে কথা আমার প্রবন্ধেই আমি বিশ্লেষণ করেছি। উইটগেনস্টাইন বা মূর নিয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রবন্ধটা মন দিয়ে পড়লে মোহিতবাবু বুঝতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সে চেষ্টা না করে তিনি গভীর তত্ত্বের প্রকাশে ব্যস্ত। "প্রক্ষোভকে আমরা জানি না। প্রকাশ করি, আর সেই প্রকাশকে আমরা জানি।" এর সঙ্গে মোহিতবাবুর আর এক উক্তি তুলনীয় : "আমরা যাহা জানি তাহা প্রকাশ করিতে পারি। যাহা জানি না তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।" পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি শেষের উক্তিটা ছাড়া আজকাল কোনো পণ্ডিতী আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে মোহিতবাবু প্রথম উক্তির সঙ্গে এর বিরোধটা বিস্মৃত হয়েছেন।

Craving for generality নিয়ে আমার আলোচনা সম্বন্ধে মোহিতবাবুর বক্তব্য বুঝতে পারলাম না, কারণ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা উনি করেননি। ধরে নিয়েছেন কোনো কোনো পণ্ডিতদের মতের সঙ্গে আমি "সবিশেষ পরিচিত," কাজেই আমি বুঝতে পারবো। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মোহিতবাবু নিজের পাণ্ডিত্যের সামান্য অংশও আমার ওপরে আরোপ করে অবিচার করেছেন। বিবৃতি স্পষ্ট হলেই আমার বোঝা সম্ভব।

Discussion on an unreal subject বলতে denial of an unreal subject-ও discussion-এর অন্তর্গত একথা আমি ভাবিনি। এক অর্থে হয়তো তাই। কিন্তু রিচার্ডস আমার অর্থই বুঝেছিলেন। বিশ্বাস ছিলো পাঠকও তাই বুঝবেন। না বুঝলে অভিযোগ নেই। বিশ্বাস নিয়েই ভাষা-ব্যবহার। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে মোহিতবাবুর বেগ পেতে হয়নি—"তাঁহার মন কিন্তু সেই অর্থের প্রতিষঙ্গবাদেই আটকাইয়া আছে।" আবার সেই "মন"। মন নিয়ে মোহিতবাবু বড়োই বিপদে পড়েছেন।

প্রতিষঙ্গবাদ, ব্যবহারবাদ, বস্তুসাপেক্ষস্বাতন্ত্র্যবাদ, বাহিরার্থবাদ—ইত্যাদি নানা বাদের অরণ্যেই মোহিতবাবুর বিচরণ। কিন্তু এদের সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য, আর এদের পারস্পরিক মিল বা গরমিল নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ বাদ-নিরপেক্ষ। কোনো বাদের সঙ্গে তার সংগতি বা বিরোধ নিয়ে মোহিতবাবু অযথা কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি প্রথমেই ধরে নিয়েছেন যে আমি বিশেষ একটা মতবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ হয়েছে। আর এই সন্দেহের জ্বালায় ওঁর নিজের কিছু বক্তব্য আছে কিনা সে কথা প্রায় ভুলে গিয়েছেন।

যেটুকু বক্তব্য উদ্ধার করতে পারলাম তাতে দেখা যায় প্রতীক ও প্রতীকধারীর কোনো প্রভেদ মোহিতবাবুর পছন্দ নয়। প্রভেদের প্রকৃতি ও সীমা আমি আমার প্রবন্ধে নির্ধারিত করতে চেষ্টা

করেছি। ভাষার অর্থ তার ব্যবহারে—এ কথায় প্রতীকধর্মীর অস্তিত্ব লোপ পায় না। ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে প্রতীকধর্মীর পরিবর্তন হয়। "ভাষার অর্থ" কথাটাই দ্বৈতবাচক। ভাষা ও তার অর্থ—এই দ্বৈতের মধ্যেই প্রতীক ও প্রতীকধর্মীর দ্বৈত নিহিত। ব্যবহারেই এই অর্থ নির্ধারিত এবং সেই জন্যেই ব্যবহারের ঊর্ধ্বে কোনো ভাষা নেই। নানা বাদের জালে জড়িয়ে না পড়লে এই সম্পর্কটা মোহিতবাবু সহজেই বুঝতে পারতেন। উনি নিজেই বলছেন : "যাহা ভাষায় প্রকাশ করি তাহাও ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করি।" কিসের প্রকাশ? "প্রকাশ" কথাটাতেই মোহিতবাবুর অদ্বৈতদর্শনের পরিসমাপ্তি। দ্বৈতের ধারণা ছাড়া মাধ্যমের কথা কী করে আসে? মোহিতবাবু বলছেন শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন আর শিল্পতাত্ত্বিক সেই শিল্প সম্বন্ধে কথা বলেন, এবং এই কথাই শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু। শিল্পী কী সৃষ্টি করেন? মোহিতবাবুর বিশ্লেষণে সেই সৃষ্টিও তো একটা কথা। তা হলে শিল্পীর কর্ম ও শিল্পতাত্ত্বিকের কর্মে এই প্রভেদ নির্ধারণের প্রয়াস কেন? কূটতার্কিক হলে বলতে পারতাম যে মোহিতবাবুর বক্তব্য যদি ঠিক হয় তবে তা অর্থহীন, আর যদি তার অর্থ থাকে তবে তার প্রতিপাদ্য ভুল।

মোহিতবাবুর শেষ আপত্তি আমার ব্যবহৃত কয়েকটা বাংলা শব্দ নিয়ে। তত্ত্বমূলক আলোচনায় যাকে fact বলে তাকে যদি তথ্য বলি তা হ'লে information বা facts of a case-এর বাংলা কী? অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষতায় অভিজ্ঞতার অভাবও অনেক সময় সূচিত হয়। অভিজ্ঞতার আগেই যাকে স্বীকার করে নেয়া হয় তাই a priori।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

ইতিহাস নিত্যই রচিত হচ্ছে। মিথ্যে ক'রে সাজিয়েও তা' লেখানো যায়। কিন্তু কিংবদন্তীর বেলা তা' পারা যায় না।

কেমন ক'রে যে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, তার জন্মের রহস্য যে কি, তা বিশ্লেষণ ক'রে বার করবার বোধ হয় নয়।

কিংবদন্তীর সত্যের ভিত্তি হয়তো সব সময় তেমন পাকা নয়, কিন্তু তবু সত্যের চেয়ে তা অনেক বেশি প্রবল।

সত্যের জমিতে কি বিশেষ অনুকূল আবহাওয়ায় কিংবদন্তী পল্লবিত হয়ে ওঠে জানতে পারলে, ভবভূতির বদলে কালিদাস, অশোকের বদলে বিক্রমাদিত্য কেন যে কিংবদন্তীর আধার তা আমরা বুঝতে পারতাম।

কিন্তু সে রহস্য অজ্ঞাত।

পত্রিকা আমাদের দেশে এর আগে অনেক বেরিয়েছে, সার্থকও হয়েছে তাদের অনেক-গুলি, কিন্তু তার মধ্যে 'কল্লোল'-ই কেন যে ইতিহাসের এলাকা ছাড়িয়ে কিংবদন্তীর রাজ্যে পৌঁছল তা তাই বলা কঠিন।

কিন্তু 'কল্লোল' যে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার বিরুদ্ধবাদীরাও বোধ হয় করবেন না।

'কল্লোল' ও তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত 'কালি-কলম' একদিন সাহিত্যে একটা আলোড়ন নিশ্চয় তুলেছিল। কিন্তু সে রকম আলোড়ন তোলার নজির সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা আগে-পরে দেখাতে পারেন। 'কল্লোল'-এর চেয়ে অন্য পত্রিকার আরো জোরালো দাবিও কেউ কেউ পেশ করতে প্রস্তুত।

কিন্তু তবু অন্য সমস্ত পত্রিকা যেখানে ইতিহাস মাত্র 'কল্লোল' সেখানে কিংবদন্তী।

কল্লোলের এ কিংবদন্তী বিশেষ একটি কোন প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছিল এমন কয়েকটি লেখকের সমষ্টিগত সাধনাকে অবলম্বন ক'রে। রচনাশক্তি, ভাঙ্গি, এমন কি সাহিত্যধর্মের দিক দিয়েও যাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

তফাৎ তাঁদের মধ্যে যতখানিই থাক মিলও যে কোথাও ছিল তা সে যুগের 'কল্লোল'-এর যে কোন লেখকের লেখা পড়লে বোধ হয় কিছুটা বোঝা যায়।

বিশেষ ক'রে সে লেখা যদি 'পটলডাঙার পাঁচালী' হয় আর লেখক হয় যুবনাশ্ব।

'কল্লোল'-এর কিংবদন্তী গড়ে ওঠার মূলে যাঁরা ছিলেন যুবনাশ্ব তাঁদের মধ্যে অগ্র-গণ্যদের একজন। 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠাতেও এ লেখকের নাম খুব বেশি দেখা যায়নি, 'কল্লোল'-এর পর সাহিত্যজগতে সে নাম ছাপার অক্ষরে কখনো-সখনো চোখে পড়েছে কি না সন্দেহ। তবু 'কল্লোল'-এর মতো যুবনাশ্বও কতকটা কিংবদন্তী হয়ে আছেন। লেখার স্বল্পতা কি সুদীর্ঘ নীরবতাও তাঁর স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেনি।

কেন যে পারেনি, 'পটলডাঙার পাঁচালী'-র কয়েকটি পাতা ওল্টাতে না ওল্টাতে তা বোধ হয় অস্পষ্ট থাকবে না।

পুরানো মাসিক 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠাতেই 'পটলডাঙার পাঁচালী' এতদিন প্রায় অজ্ঞাতবাস করছিল। তাকে পুস্তকাকারে এতদিন বাদে যে প্রকাশক বার ক'রে এনেছেন তাঁরা যে লুপ্তরত্ন উদ্ধারের কীর্তি দাবি করতে পারেন এ যুগের গুণগ্রাহী রসিক পাঠকেরা তা অস্বীকার করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রথম প্রকাশের যুগে 'পটলডাঙার পাঁচালী' যে সাড়া জাগিয়েছিল তার মূলে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই হয়তো ছিল প্রধান। আজ অনুসরণে ও অনুকরণে সে অভিনবত্ব অনেকখানি ফিকে হ'য়ে গেলেও এ বই-এর মূল্য ও আবেদন এতটুকু কমেনি বলেই আমার মনে হয় এবং তা থেকে বোঝা যায় যে সাময়িক হুজুগের চেয়ে আরো স্থায়ী ও গভীর কোনো ভিত্তি এ কাহিনীর আছে।

'পটলডাঙার পাঁচালী' যাদের জগত নিয়ে লেখা আমাদের নগরজীবনের সেই অন্ধকার পাতালপুরীতে সাহিত্যের প্রবেশ সেদিন ছিল নিষিদ্ধ। সেদিন সাহিত্যের জাত খুইয়ে যাঁরা দুঃসাহস ভরে এ জগতে প্রবেশ করেছেন তাঁদের এ স্পর্ধা কোনখানে কারো মার্জনা পায়নি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও বদলেছে। সেদিন যার জন্যে এক ঘরে হতে হয়েছে আজ তারই জোরে সাহিত্যের সদরে নির্বিচারে সমাদরের ব্যবস্থা। নগরের আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর দিকের উল্টো পিঠে কাহিনীর উপাদান খুঁজতে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তাই আর মোটেই বিরল নয়। কিন্তু তবু মনে হয় যুবনাশ্বের সে পটলডাঙাকে কেউ এখনো তেমন ক'রে আবিষ্কার করতে পারেনি। সে পটলডাঙা যুবনাশ্বের কলমের নিপুন নির্ভীক আঁচড়ে উদ্ঘাটিত হয়ে সেদিন বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তি ও অস্বস্তিই উৎপাদন করেছিল বেশী। আজ সে অস্বস্তি ও বিরক্তি অনুভব করবার মতো শুচিবায়ু কাটিয়ে উঠে পাঠকসমাজ তার মধ্যে বিস্ময়ের চেয়ে আরো বেশী কিছু পাবেন। সেই বেশী কিছুটি হ'ল চিরন্তন সাহিত্য-রস। লেখকের গভীর মানবতাবোধ যার উৎস।

যুবনাশ্বের সে পটলডাঙা এই নগরের কোথাও টিঁকে আছে কি নেই জানি না; সেখানকার নফর সদী, পটলা খেঁদি বিন্দি ফতিমা হয় ত সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছে, হয় ত তারা অন্য নামে অন্য চেহারায় জীবনের অন্য স্তরে উঠে এসেছে বা নেমে গেছে, কিন্তু সাহিত্যের কল্পলোকে তাদের পরমায়ু অক্ষয় হয়েই রইলো বলে আমার বিশ্বাস।

যত উর্ধ্বলোকেই বিচরণ করুক সব সাহিত্যকে এতদিন এই পটলডাঙা আবিষ্কার করতে হয় মোহাচ্ছন্ন অন্ধতা কাটিয়ে জীবনের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বোঝবার জন্যে। এ আবিষ্কারের অভিযানে প্রথম যারা এগিয়ে যায় কোনো উৎসাহ কারুর কাছে তারা পায় না, পুরস্কারের বদলে লাঞ্ছনা ও শাস্তিই তাদের ভাগ্যে সেদিন জোটে। কিন্তু সাহিত্যের বিবেক চিরকাল অসাড় হয়ে থাকে না, কালের মহাধর্মাধিকরণে সংকীর্ণ গোষ্ঠির সাময়িক রায় পাল্টে যায়। একদিন যা অশুচি বলে অস্পৃশ্য ছিলো পরম সম্মানের বরমাল্য তার জন্য গাঁথা হয়।

'পটলডাঙার পাঁচালী'র সেই বরমাল্য-ই প্রাপ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পটলডাঙার পাঁচালী—যুবনাশ্ব। সেঞ্চুরী প্রেস। কলিকাতা। দাম ২৷৹।

সমালোচনা

The Century of Total War. *By* Raymond Aron. The Beacon Press. Boston. Price $1.50.

মার্কিন মনীষীদের বাস্তববোদ্ধা বলে সুনাম আছে। দুরূহ সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা স্বপ্নরাজ্যে পলায়ন করেন না, উত্তরণের পথ অন্বেষণ করেন। তাঁদের দর্শনে দূরাগত আদর্শ ও মূল্যপরীক্ষার স্থান গৌণ, মুখ্য হোল বর্তমান জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর।

আমাদের ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী একটু স্বতন্ত্র। মহামারির আক্রমণের মুখে আমরা নাম কীর্তন করি, ভূমিকম্প হলে আমরা আকাশে মুখ তুলে শঙ্খ বাজাই। কারণ আমাদের ধরণা জীবনের প্রশ্নও মৌলিক, সমাধানও মৌলিক, বর্তমানের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে তার অনুসন্ধান চলে না।

সুতরাং বিশ শতকের মারমূর্তি জাতি-সংগ্রামের জন্য সাংবাদিক রেমন্ড আরোঁ যখন প্রস্তুতির আহ্বান পাঠিয়েছেন আমরা তখন খুঁজি নিষ্কৃতির নিশানা। মনে সন্দেহ জাগে সত্যই কি এই ধ্বংসযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করাই বাঁচবার অনন্য পন্থা?

এ যুগের জাতি-সংগ্রাম সর্বভুক। যুদ্ধ কেবল সেনায় সেনায় হয় না, হয় দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে। দেশরক্ষা প্রতি নাগরিকের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব। অতএব সৈনিক ও নাগরিক এখন এক। সমরসম্ভার উৎপন্ন হয় বহুপ্রসবিনী যন্ত্রশালায়—তাতে সারা দেশের ধনবল ও জনবল নিয়োজিত। এই বিরাট নাশযজ্ঞে জাতীয়তার পুরাতন মন্ত্র এখন অচল, এযুগে উচ্চারণ করতে হয় উদাত্ত মানবতার মন্ত্র,—সাম্য, মুক্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মহত্তর আদর্শের কথা।

পাশ্চাত্য মানস এই সর্বভুক সংগ্রামের আতঙ্কে আচ্ছন্ন। চোখে নিদ্রা নেই, ক্লান্ত দেহে শয্যার আশ্রয় নেই, প্রতীচ্য জগত সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অতন্দ্র নয়নে দাঁড়িয়ে আছে। এই যুদ্ধসজ্জা ও আয়োজনের মূল্য তাকে দিতে হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তিকে কেন্দ্রায়িত করে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে।

কেন এই আত্মঘাতী উদ্বেগ? সেই পুরাতন কথা,—পাশ্চাত্য রাষ্ট্রমন্ডলীর ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছে। এক রাষ্ট্রের বল যদি অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় তা হলে তার অগ্রগতি হবে দুর্বার, তার পদতলে নিষ্পেষিত হবে স্বাধীনতা ও মানবমূল্য। নেপোলিয়েনের ফ্রান্স ও হিটলারের জার্মানী যেমন ধূমকেতুর মত ইয়োরোপের আকাশে উদিত হয়েছিল, স্টালিনের রুশ তেমনই এক নূতন বিভীষিকা। কম্যুনিজম্-এর মায়াবলে এর সাম্রাজ্য ও সামরিক শক্তি আজ প্রচন্ড হয়ে উঠেছে। নেপোলিয়ন ও হিটলারের এই মায়াবল ছিল না। অতিকায় রুশের দুই প্রান্তে ছিল জার্মানী ও জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপ ও এশিয়ার এই দুই দ্বাররক্ষী বিধ্বস্ত হয়েছে। এশিয়ায় মহাচীন

রুশের সঙ্গে শিবির সন্নিবেশ করেছে। তার পূর্বান্তে ইয়োরোপের শাসনে ও শোষণে বিক্ষুব্ধ এবং রুশের সাম্যবাদের বাণীতে বিমুগ্ধ এশিয়া। আর পশ্চিমান্তে বিভক্ত, ভুলুণ্ঠিত, হৃতগৌরব ইয়োরোপ। পাশ্চাত্ত্য জগতের সামনে আজ রুশ দানবের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নটাই বিশ্বরাজনীতির গোড়াকার কথা।

এই প্রসঙ্গের ভণিতা ও বিস্তার করেছেন রেমণ্ড আরোঁ আমেরিকান দৃষ্টিকোণ থেকে। যুগের ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রের উপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে,—সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের হাত হতে ইয়োরোপের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ। এই হোল তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম।

দুনিয়ায় এখন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্থান নেই। আজকের সর্বভুক সংগ্রামে যে পরিমাণ ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরের প্রয়োজন তা চার পাঁচ কোটি জনসংখ্যার কোন রাষ্ট্রের সাধ্যাতীত। ফ্রান্স, ইটালী এমন কি ইংলণ্ডও নিজ নিজ উপনিবেশ হারিয়ে আজ দৈন্যদশায় উপনীত হয়েছে। ইয়োরোপের বলগর্ব ধনগর্ব এমন কি সভ্যতার গরিমাও আজ ম্রিয়মান। সোভিয়েত রুশ ও আমেরিকা দুই যযুৎসু মহাশক্তির মাঝখানে পড়ে হতাশ আশঙ্কায় সে কালগণনা করছে।

অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে বুঝি বা ইয়োরোপের সূর্য অস্তমান। বুঝি বা বিশ্বের ভাগ্যাকাশে অভ্যুদয় হবে নূতন কোন শক্তি ও সভ্যতার। যে ঐতিহাসিক জাতির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়েছে তাকে বিদায় দিতে হবে, অশ্রুপাত করে লাভ নেই। ইয়োরোপকে এক রাষ্ট্রে সংগঠিত করে উজ্জীবিত করবার চেষ্টাও নিরর্থক, কারণ একরাট্ ইয়োরোপ এক অসম্ভব কল্পনা। সোভিয়েত অথবা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মত ইয়োরোপ খাদ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে স্বাবলম্বী নয়। পরস্পরের অভাব পরিপূরণ করবার ক্ষমতা ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নেই। তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ধরনও পৃথক্। সর্বোপরি তাদের পরস্পরের মধ্যে আছে অবিশ্বাস ও ঈর্ষা। ঐক্যবন্ধনের জন্যে অর্থস্বাচ্ছল্য ও রাষ্ট্রনিরাপত্তার তাগিদ যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন স্বাজাত্যবোধ অথবা কোন একটি আদর্শের প্রেরণা—ইয়োরোপে যার একান্ত অভাব।

সুতরাং ইয়োরোপের মুস্কিল-আসান আজ আমেরিকা। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির বাঁজমন্ত্র হবে অতলান্তিক চক্রকে সুদৃঢ় করা। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র তার চিরাচরিত ঔদাসীন্য বর্জন করে বিশ্বরাজনীতির কুরুক্ষেত্রে অবতরণ করেছে। সে দানসত্ খুলেছে দুর্গত ইয়োরোপের জন্য, দরিদ্র এশিয়ার জন্য। আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আজ আর শোষণের সম্পর্ক নেই। এই ত্রয়ীর মধ্যে নূতন অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এশিয়া কাঁচামাল বেচবে ডলার অঞ্চলে আর শিল্পপণ্য কিনবে ইয়োরোপ থেকে। সকলে হবে সাধারণ উন্নতির অংশীদার।

মোটামুটি এই হোল বিশ শতকের সমস্যা ও সমাধান। সোভিয়েত নীতির বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য লেখক বহু তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছেন। মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের খণ্ডনকল্পে তিনি বহু তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করেছেন। তার অধিকাংশ পুরাতন ও বহুশ্রুত এবং প্রস্তাবের প্রতিষ্ঠায় অপ্রয়োজনীয়। সাম্প্রতিক বিশ্বযুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ব্যাখ্যানে মার্ক্সবাদ অথবা লেনিনবাদের প্রয়োগ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি

করেন না, কম্যুনিস্টরাও না। রুশবিপ্লবে মার্ক্সবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, প্রমাণিত হয়েছে লেনিনের বিপ্লবী কৌশলের কার্যকারিতা—লেখকের এ মন্তব্য অকাট্য। কিন্তু এ নজির সোভিয়েত ও আমেরিকার নীতিমূল্যের বিচারে অবান্তর। আপ্তবাক্যের প্রতি আনুগত্য উদ্দেশ্য বা সততার মানদণ্ড নয়, প্রগতির প্রমাণও নয়।

রুশ ও আমেরিকার মূল্যবিচারে লেখক যে সকল তথ্য ও যুক্তি উপস্থিত করেছেন তা সত্যসন্ধী নয়, প্রচারসুলভ। যথা, রুশের পঞ্চবার্ষিক যোজনায় জনগণের কোন উন্নতি হয়নি; রুশে কম্যুনিস্ট দল জনসমর্থন লাভ করেছে জার্মানদের অত্যাচারের ফলে; দুটি মহাসমরের দৌলতে আজ রুশে ও অন্যত্র কম্যুনিস্ট দল ক্ষমতালাভ করেছে, দেশের সংগঠন অথবা উন্নয়নের কৃতিত্বে নয়। স্টালিনবাদের মন্ত্র ও মর্ম ছিল বিভীষিকা। সম্প্রতি সোভিয়েত রুশে যে স্টালিনবিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে তা কোন আদর্শের পরিবর্তন সূচনা করে না। আত্মবিস্তারের এ এক অভিনব কৌশল।

পক্ষান্তরে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও স্বাধীনতার অনুসন্ধী,—তার শান্তিসাম্রাজ্য শোষণমুক্ত। দুর্গত দেশের অভাব মোচনে সে মুক্তহস্ত, আতঙ্কিত দেশের স্বাধীনতা রক্ষণে তার দণ্ড উদ্যত। গণতন্ত্রের আদর্শে নিবেদিত শুচিশুভ্র তার রাজনীতি স্বার্থলেশহীন।

এ ধরণের বিচার বিশ্লেষণ অবশ্য আমেরিকার দৃষ্টিতে বাস্তবধর্মী, কিন্তু আমাদের তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে প্রচারধর্মী। সোভিয়েত শিবিরের প্রচারকার্যের সমান্তরালে পাশ্চাত্য শিবিরের প্রচারকার্য ও চলবে সমান উদ্যমে,—এ স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এ হোল সর্বভুক সংগ্রামের নান্দীপাঠ, যার নাম 'শীতল সংগ্রাম'। এই বাদানুবাদে কোন পক্ষেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অথবা বৈদগ্ধ্য আশা করা যায় না। যেখানে বিরোধ পরম সত্য, সেখানে বিরোধিতাই বাস্তব ধর্ম। বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাত সেখানে অপাংক্তেয়।

তথাপি স্বীকার করতে হবে যে লেখকের প্রচারকৌশল সংযত, তাতে বিরোধীদলের প্রচারপ্রণালীর ন্যায় উত্তাপ ও কটুবাক্য নেই। কোথাও কোথাও তাঁর উক্তি ও যুক্তি অবধানযোগ্য। আজ শান্তি-আন্দোলনের আওয়াজ হোল আণবিক অস্ত্রের নির্বাসন। এ আওয়াজে রুশ সুর মিলিয়েছে। আণবিক অস্ত্রে সে আমেরিকার পিছনে, ক্যানাডা ও ইংলণ্ডকে নিয়ে যে অতলান্তিক চক্র তার অনেক পিছনে। অন্যান্য অস্ত্রে ও উপকরণে প্রাচ্য শিবির পাশ্চাত্য জগতের সমকক্ষ, বরং ইয়োরোপে রুশ অভিযান রোধ করবার জন্য আমেরিকাই যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। আণবিক অস্ত্র-নির্বাসনের আন্দোলনে রুশের অভিসন্ধি অতি স্পষ্ট। বস্তুত কোন মারণাস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করে শান্তিরক্ষার কল্পনা আকাশ-কুসুম।

রাষ্ট্রীকরণকে লক্ষ্য করে লেখক বলছেন,—উৎপাদনযন্ত্রের কর্তৃত্ব ব্যক্তির হাতে রইল না রাষ্ট্রের হাতে রইল,—তার উপর মানুষের জীবনমান নির্ভর করে না, নির্ভর করে উৎপাদন-শক্তির উপর। অধিকন্তু রাষ্ট্রীকরণে ধনবল ও রাষ্ট্রবল একত্র হয়ে এক সর্বময় আমলাতন্ত্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। স্বীকার করতে হবে যে অন্তত আমাদের দেশে রাষ্ট্রীকরণে সমাজ-বৈষম্যের নিরসন হচ্ছে না। ব্যক্তি-মালিকানায় যদি মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে বেকারির উপশম হয়, ধনের অপচয় বন্ধ হয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আর পক্ষান্তরে কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যদি তার বিপরীত ফল দেখা যায়, তা হলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণীয় হবে তার পুনর্বিচার করা দরকার। সমাজবাদের আসল কথা ধনসাম্য,— মালিকানা উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষ যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা হলে বর্জনীয়। ধনবৈষম্যের সমাধান যে কোন বাঁধাধরা ফর্মুলা দিয়ে হয় না,—অনেক পরীক্ষার ব্যর্থতা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

লেখকের বাস্তববোধ স্বীকার্য। দুঃখের কথা যে বাস্তবধর্মী আদর্শের বিজ্ঞাপন মানুষের অন্তর স্পর্শ করে না। মার্কিন মনীষীর যুক্তিজাল ছিন্ন করে যখন প্রলয়াস্ত্র গর্জন করে ওঠে, তখন অসহায় মানুষ রূঢ় বাস্তবের বাইরে স্বপ্নলোকে আশ্রয় খোঁজে, সন্ধান করে নূতন বাণীর, নূতন এক সমাধান ও সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতির। ইতিহাস আশ্বাস দেয়। কারণ বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তার পথযাত্রা, সামঞ্জস্যই তার ধর্ম। যে বাস্তবী বর্তমানের ঘূর্ণীচক্রে আবর্তিত তার কাছে ইতিহাসের বাণী পৌঁছায় না। যে প্রজ্ঞানী বর্তমানের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে কর্ণপাত করতে পারে সেই শুনতে পায় অনাগত কালের পদধ্বনি, তার বাণীতে ব্যক্ত হয় ইতিহাসের প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅরবিন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সোভিয়েত রুশে একদিন শিক্ষার প্রসারের ফলে তাদের ছাঁচ ফেটে চুরমার হবে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব আবার আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিন হবে একতন্ত্রের সমাধি এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য। অরবিন্দ বলেছেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিবিরের বিরোধের ধার ক্রমশ সংঘর্ষে ক্ষয় হয়ে যাবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজবাদ ও ব্যক্তি-অধিকারে ক্রমমিলন ঘটবে। আজকের উগ্র বৈরিতা এই মন্ত্রসিদ্ধির ভূমিকা।

ইতিহাসের এই প্রতিশ্রুতি আজ বাস্তবের রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করছে। আফ্রো-এশিয়ার জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন অতলান্তিক দুর্গে ফাটল ধরিয়েছে, আজ তেমন পূর্ব ইয়োরোপের জনবিক্ষোভ সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে কাঁপন লাগাচ্ছে।

ভারতীয় মনীষার এই দৃষ্টির পশ্চাতে একটি সুদৃঢ় প্রত্যয় আছে। সে প্রত্যয় এই যে মানবাত্মার বিনাশ নেই। অতীতে যেমন মানুষ নগ্ন নিঃসহায় বন্যদশা হতে বহু যুগসন্ধি অতিক্রম করে মানবতায় উপনীত হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতেও তার জয়যাত্রা হবে অবারিত, অব্যাহত, সে স্থাপন করবে আত্মার সাম্রাজ্য। মানুষের বিশ্ববোধ ও কল্যাণচেতনা শত সহস্র উৎকট বিভীষিকা উত্তরণ করে যুগযুগান্ত ধরে এই দূরায়ত্ত সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে।

অতীন্দ্রনাথ বসু

The Chatto Book of Modern Poetry. Edited *By* C. Day Lewis and John Lehmann. Chatto and Windus. London. 15*s*.

অল্প কথায় এই ধরনের বই-এর ভালোমন্দ বিচার করা কিংবা সংক্ষেপে এর সারমর্ম উদ্ধার করে দেওয়া সহজ নয়, এই কারণে যে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত যে সব ইংরেজ কবিরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ৯৬ জনের দু'চারটি ক'রে কবিতা দিয়ে সঙ্কলনখানির কলেবর গড়ে উঠেছে।

সঙ্কলনে কোন ভূমিকা নেই। মলাটে প্রকাশকরা সংক্ষেপে বলেছেন যে ১৯১৫-৫৫ সালের মধ্যে রচিত এবং তাঁদের মতে ভাব, কাব্যগুণ ও আঙ্গিকের শ্রেষ্ঠত্বে বিশিষ্ট কবিতাই এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, কোন একটা গোষ্ঠী অথবা উদ্দেশ্য দেখে বাছাই করা হয়নি।

এদেশী সাধারণ পাঠকের কাছে এ কবিদের অনেকেই অপরিচিত। কবে এবং কিরকম পরিবেশে তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেদিকে কোন দৃকপাত না করার ফলে পরিপূর্ণ ভিক্টোরীয় হার্ডি কিপলিংদের সঙ্গে সঙ্গে অডেন ডিকিন্সনও রয়েছেন।

পাঠকমাত্রেরই মনে হবে ডে-লুই ও লেম্যানের মতো বিচক্ষণ সম্পাদক এবং সমালোচকরা কেন এই বিশেষ একচল্লিশটি বছর বেছে নিলেন? এর মধ্যে কোন একটা বিশেষ যুগের আরম্ভ ও অবসান ঘটেনি, যুগধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, যার প্রভাব কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে বলে শোনা যায়, তাও কিছু গড়ে ওঠেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যাঁরা কাব্যরচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও কাব্য-রচনা ছেড়ে দেননি। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের মন থেকে একটা আক্রমণাত্মক একগুঁয়ে আদর্শবাদ বিদায় নেয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এই আদর্শবাদের চিহ্নমাত্র নেই। কাজেই একাসনে বসালেও ঐকতান আশা করা যায় না।

তবে যদি শুধুমাত্র খেয়াল অনুসারে সন-তারিখ হিসাব ক'রে সঙ্কলনটি করা হয়ে থাকে, তাহলে কারো কিছু বলবার থাকে না। কেউ কেউ হয়তো বাদ পড়ে গেছেন, কিন্তু যেখানে সকলের স্থান সঙ্কুলান হবে না, সেখানে কাকে ছেড়ে কাকে রাখা হবে, সে বিচার সম্পাদকরাই করবেন। তবে এটুকু মনে হয় যে এইরকম পাঁচমিশেলী আয়োজনে কবিদের জন্মতারিখ ও পরিশেষে একটুখানি ব্যক্তিগত পরিচিতি দিয়ে দিলে বিদেশী পাঠকদের সুবিধা হত।

কবিতাগুলি রচিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের সব চাইতে মর্মান্তিক একচল্লিশটি বছরের মধ্যে যখন একটা নিদারুণ আঘাতে পুরানো মামুলী আদর্শবাদগুলো ভেঙে গিয়ে যদি-বা একটা নতুন মানবিকতা গড়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময়, সে-ধরনের মানবিকতারও যে আদৌ কোন ভিত্তি নেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সে কথা প্রমাণ ক'রে দিল। হয়তো তাতে ভালোই হল, অবলম্বন খসে যাওয়াতে একটা আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠবার অবকাশ পেল।

If, in that Syrian garden, ages slain
You sleep, and know not you are dead in vain, ...
Sleep well, and see no morning, son of man.
But if . . . . . .
You sit and sitting so, remember yet
Your tears, your agony and bloody sweat,
. . . . . and the life you gave,
Bow hither out of heaven, and see and save!
—*Easter Hymn*, Housman.

ইয়েটস-এর মৃত্যুর পর অডেন লিখলেন :

Stares from every human face,
And the seas of piety lie.
Locked and frozen in each eye
Follow, poet, follow right
To the bottom of the night, ...
With the farming of a verse
Make a vineyard of the curse.
In the deserts of the heart

Let the healing fountain start
In the prison of his days
Teach the free man how to praise.
—*Intellectual Disgrace.*

যারা যুদ্ধ করে তাদের চাইতে যারা কাব্য-রচনা করে তারা অনেক বেশী প্রবল। নিদারুণ হতাশার মধ্য দিয়েও যে একটা প্রচণ্ড পৌরুষ গড়ে উঠতে পারে, স্টিফেন স্পেণ্ডারের Polar Expedition-এ তার একটু আভাস পাওয়া যায়।

বাইবেলে একটা কথা আছে, নুন যদি তার লবণত্ব হারায় তাহলে আর সে কোন কাজে লাগবে? আধুনিক কবিতার বিপক্ষেও এই অভিযোগ শোনা যায় যে তার বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু কাব্যগুণের একান্ত অভাব। যে কোন যুগের কাব্যের সমালোচনা করতে হলে সে সময়কার শ্রেষ্ঠ কাব্য নিয়ে বিচার করতে হয়। কিন্তু কাব্যের ভালোমন্দ বিচার হবে কি দিয়ে? ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন সব ভাষাতেই কাব্যের কষ্টিপাথর আছে, যার পাশে দাঁড় করালেই যে কোন কবিতার ভালোমন্দ প্রকট হয়ে পড়ে। ক্রিস্টিনা রসেটির Goblin Market যাঁরা পড়েছেন তাঁরা উইলিয়ম প্লুমারের The Caledonian Market-ও পড়ুন, ভিক্টোরীয় অবাস্তব রূপকথার সঙ্গে আধুনিক বাস্তবদর্শন তুলনা ক'রে দেখুন।

তাই বলে সব কি আর একরকম হয়? সেই প্রাচীন প্রসন্ন ঔদার্যকে খুঁজে পাওয়া শক্ত, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিঙ, টেনিসনের সেই সুগভীর সুবুদ্ধি, যা দিয়ে একটা মনের মতো অন্বয়ে উপনীত হওয়া যেত, যা পাবার নয় তাকে ছেড়ে দেওয়া হত, যা পাবার তাকে চিনে নেওয়া যেত, সব সমস্যার একটা সমাধানের নিদেন একটা সঙ্কেতও পাওয়া যেত। তাকেই যদি কাব্যগুণ বলা হয়, তাহলে হয়তো আর কোনদিনও তাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনে হয় যে কাব্যের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে—আর উদ্দেশ্যও যে থাকতেই হবে এমনই বা কোন কথা আছে কি? তবু যদি থাকে,—সে তো তো সমাধান ক'রে দেওয়া নয়, বরং সে হল অন্বেষণ করা। সমাধানের মধ্যে একটা বিরতির চিহ্ন আছে যা কাব্যধর্মের বিরোধী। পিটার কুইনেলের While I have vision দ্রষ্টব্য।

আধুনিক কাব্য-সমালোচনা সম্পর্কে এ কথাও শোনা যায় যে জীবনকে ও জগতকে ঘৃণা করলে কাব্যরচনা কঠিন হয়ে ওঠে, কোথাও একটা প্রেমের বীজ লুকিয়ে না থাকলে কাব্য হয় না। তবে ঘৃণ্য জিনিসকে ঘৃণা করা ও জীবনকে ঘৃণা করা এক কথা নয়। অযোগ্য আদর্শে বিশ্বাস হারানোও যেমন বিশ্বাসঘাতকতা নয়। এন্‌, আর রজেসের White Christmas শ্লেষে ভরা, কিন্তু তার মূলে ঘৃণার চাইতে প্রেম বেশী।

আধুনিক কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আমার অভিপ্রেত নয়, আজকাল অকবিরা কবিতা লেখেন বলে সমস্যাটি অতিশয় জটিল রূপ নিয়েছে। কাব্য কোন একটা যুগের একচেটিয়া সম্পত্তি হতে পারে না, নদীর মতো ক্রমাগত সে সাগরের দিকেও প্রবাহিত হয় না, মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে যায়। অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যের বিশাল বিমূঢ় প্রকৃতিবাদ, চসারের যুগের প্রবল প্রাণশক্তি, এলিজাবেথীয় ও ভিক্টোরীয় যুগের উদার সমৃদ্ধি, ক্যারোলাইন যুগের উদ্দাম-মধুর আবেগ এবং তৎপরবর্তী যুগের মর্মভেদী শ্লেষ—এসব প্রচণ্ড শক্তি যে পরিবেশে বিকশিত হয়ে ওঠে, আমাদের কবিরা তা পাবেন না। ঝড়-বাদলে কঠিন ভূমিতে যে ফুলকে ফুটতে হয়, সে তার উপযুক্ত রূপ নিয়েই ফোটে। কাব্যগুণশূন্য কোন যুগ হতে পারে না, পূর্বেই বলেছি যুগের সেরা রচনা দিয়ে যুগের অন্য লেখার মান বিচার করতে হয়। সেই দিক

দিয়ে এই সঙ্কলনখানির অনেক সার্থকতা আছে, যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে নাম-করা কবিদেরও যে-সকল কবিতা নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলি তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা কিনা তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। এই তালিকার মধ্যে ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার, ইয়েটস, ব্রিজেস, বিনিয়ন, মেসফিল্ড প্রমুখেরও নাম করা যেতে পারে।

লীলা মজুমদার

Cyprus Challenge. *By* Percy Arnold. Hogarth Press. London. 21*s.*

পার্সি আর্নল্ড একজন ইংরেজ সাংবাদিক; ১৯৪২-৪৫-এ তিনি ছিলেন 'সাইপ্রাস পোস্ট' কাগজের সম্পাদক। দশ বছর আগে সাইপ্রাসে তিনি যা দেখেছিলেন, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার কাহিনী বর্ণনায় আজকের সাইপ্রাসের দুরূহ দুঃখদীর্ণ সমস্যাটি সহানুভূতির সঙ্গে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর্নল্ডের নিজের চোখে দেখা ১৯৪২-৪৫-এর সাইপ্রাস আর ১৯৫৬-৫৭-র সাইপ্রাসে অবশ্য আকাশ-পাতাল তফাত। ১৯৪২-৪৫ ছিল যুদ্ধকালীন অবস্থা, সে সময়ে সাইপ্রাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীক অধিবাসীর দুর্ভাবনা ছিল প্রধানত গ্রীসের ভবিষ্যত নিয়ে; নাৎসী-ফ্যাসিস্টগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাইপ্রাসবাসীরা ছিল ইংরাজের পক্ষে, আর তাদের মনে আশা ছিল যুদ্ধের শেষে সাইপ্রাসকে তার নিজের ভবিষ্যত স্বাধীনভাবে স্থির করবার সুযোগ দেবে হোয়াইটহলের কর্তারা। সাইপ্রাসবাসীদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্তের ছোট এই দ্বীপটুকু দখলে রাখার জন্য হোয়াইটহলের কর্তারা ১৯৫৫ সনের অক্টোবর থেকে যে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' চালু করেছেন তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। সাইপ্রাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীক অধিবাসীদের (৩৬২,০০০) দুর্জয় সংকল্প এবং সংগ্রামেরও তুলনা বিরল। এইরকমেরই আর-একটি ছোট দ্বীপ কর্সিকায়, আঠারো শতকে স্বৈরাচারী ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সাইপ্রাসের সমস্যা আঠারো শতকের কর্সিকার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। প্রথমত, এই ছোট দ্বীপটুকুর মালিকানা নিয়ে বৃটেন, গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে দীর্ঘকালের বিবাদ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাইপ্রাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীক অধিবাসীরা কেবলমাত্র বৃটিশ শাসনের অবসানই চায় না, তারা চায়—সাইপ্রাস গ্রীসের সঙ্গে একীভূত হোক। সাইপ্রাসের এই গ্রীসভুক্তির দাবীর নাম ENOSIS, আর এই দাবী নতুন নয়, বহু বৎসর ধরে এর জন্য সাইগ্রাস ও গ্রীসের অধিবাসীরা, গ্রীস-চার্চের প্রধানরা আন্দোলন ক'রে আসছেন। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে বৃটিশ যুদ্ধবিশারদগণের কাছে সাইপ্রাসের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে ইংরেজকে সরে আসতে হয়েছে, ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়েছে, প্যালেস্টাইন থেকে বৃটিশ তদারকী বন্দোবস্ত তুলে নিতে হয়েছে; তারপর মিশর ও জর্ডান থেকেও পিছু হটতে হয়েছে। সাম্রাজ্যের সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাই গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে strategic island গুলির; জিব্রাল্টার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যিক সামরিক স্বার্থের শেষ আশ্রয় তাই মাল্টা, সাইপ্রাস, এডেন, বুশায়ার, বাহেরিন ইত্যাদি

ঘাঁটিগুলি। অনেক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কথায় ও লেখায় প্রায়ই এখন কাতর আবেদন শোনা যাচ্ছে, "আমরা তো এতই ছেড়ে দিয়েছি, ভারতবর্ষ থেকে গোল্ড কোস্ট পর্যন্ত কত দেশের স্বাধীনতা দিয়েছি, ছোট এইটুকু সাইপ্রাস যদি আমাদের দরকারে হাতে রাখি, তার জন্য এত চিৎকার, এত প্রতিবাদ কেন?" এই আক্ষেপকে বিদ্রূপ ক'রে কোনো কোনো উদারপন্থী ইংরেজ স্মরণ করেছেন বিপথচারিণী তরুণী সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্প—আদালতে গিয়ে হতভাগিনী বলেছিল, "Such a little baby" -র জন্য এত ধিক্কার ও লাঞ্ছনা সইতে হবে কেন। সাইপ্রাস হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থ-প্রসূত "such a little baby."

আরও একটু পেছিয়ে গিয়ে প্রায় আশি বৎসর পূর্বের কাহিনী স্মরণ করা যাক। ১৮৭৮ সনে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলে সাইপ্রাস অধিকার করে বৃটেন তুরস্কের কাছে থেকে। সে সময়টা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ, আর সাম্রাজ্যের স্বর্ণলঙ্কা প্রতিষ্ঠায় ভিক্টোরিয়ার পরম আদরের প্রধান সচিব ডিজরেলীর ভূমিকা যে অসামান্য ছিল এ-কথা সকলেই জানেন। ডিজরেলী বলেছিলেন কূটনীতির চাপ দিয়ে যদি তুরস্কের কাছ থেকে সাইপ্রাস আদায় না করা যায় তাহলে বলপ্রয়োগেই আদায় করতে হবে। একমাত্র লর্ড ডার্বি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত কূটনীতির চাপেই ডিজরেলী সাইপ্রাসে বৃটিশ পতাকা উড়াতে পেরেছিলেন। ১৮৭৮ সনের এই ঘটনার পূর্বে ৩০০ বছর সাইপ্রাস ছিল তুরস্কের শাসনাধীন। সাইপ্রাসের ইতিহাস অবশ্য সুপ্রাচীন, প্রায় দু'হাজার বৎসর কাল তার ইতিহাসের বিস্তৃতি এবং বহু শক্তির উত্থান-পতন।

সাইপ্রাস দখলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডিজরেলীর স্পষ্ট ভাষণ এখানে উল্লেখ করলে বোঝা যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই স্বর্ণযুগে ভারতবর্ষই ছিল সাম্রাজ্যিক সামরিক স্বার্থের চাবিকাঠি। ১৮৭৮ সনে সাইপ্রাস দখলে প্রধানত ভারতীয় ফৌজ পাঠানো হয়েছিল জেনারেল উলসনের অধিনায়কত্বে। সে সময়ে ডিজরেলী লিখছেন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে,

"If Cyprus be conceded to Your Majesty . . . . the power of England in the Mediterranean will be absolutely increased in that region, and Your Majesty's Indian Empire immensely strengthened. Cyprus is the key to Western Asia."

এর তিনমাস পরে ডিজরেলী (তখন লর্ড বিকন্সফীল্ড) হাউস অব্ লর্ডসে আরও স্পষ্ট-ভাষায় ঘোষণা করলেন :

"In taking Cyprus the movement is not Mediterranean, it is Indian. We have taken a step there which we think necessary for the maintenance of our Empire and for its preservation in peace."

ভারতসাম্রাজ্য নির্বিবাদে দখলে রাখার জন্যই সাইপ্রাস চাই—এই ছিল ৭৮ বছর পূর্বে সাম্রাজ্যিক বৃটেনের যুক্তি। ভারতসাম্রাজ্য আজ বিলীন হয়েছে, পশ্চিম এশিয়াতেও বৃটিশের সাম্রাজ্যিক গর্ব ধূলিসাৎপ্রায়। সাইপ্রাসের ঘাঁটি থেকেই ইংরেজ অতর্কিতভাবে আক্রমণ সুরু করেছিল মিশরে পোর্ট সৈয়দের উপরে। সে আক্রমণও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, যেমন ব্যর্থ হয়েছে বৃটেনের সাইপ্রাস-নীতি। আর্চবিশপ ম্যাকরিয়সকে নির্বাসনে পাঠিয়েও সাইপ্রাসবাসীদের স্বাধীনতাসংগ্রাম রোধ করা যায়নি। সাইপ্রাসের বর্তমান শাসনকর্তা একজন যুদ্ধবিশারদ ফিল্ডমার্শাল, স্যার জন হার্ডিং; তিনিও সাইপ্রাসবাসীদের

বিদ্রোহী সংগঠন EOKA-র কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারেননি; যেমন কেনিয়া এবং মালয়ে তেমনি এখন সাইপ্রাসে বৃটিশ অভিভাবকেরা জরুরী সামরিক আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন, লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড পিটুনী ট্যাক্স, জরিমানা চাপিয়েছেন সাইপ্রাসের সহরে ও গ্রামাঞ্চলে। স্যার জন হার্ডিংও স্বীকার করছেন, সাইপ্রাসের সমস্যা কামান-বন্দুক দিয়ে সমাধান করা যাবে না, রাজনৈতিক সমাধানই জরুরী প্রয়োজন। কিন্তু সামরিক স্বার্থে strategic island দখলে রাখার নীতির সঙ্গে মিল রেখে সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসীদের রাজনৈতিক দাবী পূরণের মতো সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে? তাই এখানেও খুব সম্ভবত বৃটিশ সরকার 'Divide and Quit' ধরনের কোনও একটা পরিকল্পনা কাজে খাটানোর মতলব করছেন।

সাইপ্রাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো গ্রীক অধিবাসীরা—লোকসংখ্যার শতকরা ৮০·২ ভাগ। এদের দাবী, সাইপ্রাস গ্রীসের অঙ্গীভূত হোক। এদিকে তুরস্কের হলো পুরানো সম্বন্ধের দাবী সাইপ্রাস দ্বীপের উপরে এবং তা নিয়ে গ্রীসের সঙ্গে তার বিবাদ এখন আরও জটিল হয়েছে। সাইপ্রাসে তুর্কী জনসংখ্যা অবশ্য মাত্র ৮১০০০ অর্থাৎ শতকরা ১৭·৯ ভাগ। কিন্তু তাহলে কি হয়? সাইপ্রাস নিয়ে গ্রীস বনাম তুরস্কের বিবাদে 'নিরপেক্ষ' বৃটিশ সরকার এখন বলবার সুযোগ পাচ্ছেন, গোলমেলে এই সম্পত্তি কারো হাতেই একেবারে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া চলে না। এ-সব ব্যাপারে বৃটিশ অভিভাবকদের দায়িত্বজ্ঞান চিরকালই প্রখর, ভারতবর্ষে তা' আমরা দেখেছি। অতএব ভারতবর্ষ বিভাগের সীমানা-সরহদ্দ করতে যে ভদ্রলোকটির আগমন হয়েছিল সেই র‍্যাডক্লিফকে (বর্তমান লর্ড) পাঠানো হলো সাইপ্রাসে কথাবার্তা চালানোর জন্য। কিন্তু লর্ড র‍্যাডক্লিফ কথাবার্তা বলবেন কার সঙ্গে? সাইপ্রাস-বাসী গ্রীকদের নেতৃস্থানীয় আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স তো নির্বাসনে, আর বে-আইনী EOKA হলো ফিল্ডমার্শাল স্যার জন হার্ডিং-এর দৈনন্দিন শিকার আর রাত্রির দুঃস্বপ্ন। বাকী রইল সাইপ্রাসের তুর্কী এবং আর্মেনিয়ানরা, যারা জনসংখ্যার শতকরা ১৯ ভাগ মাত্র এবং তারা রাজনীতি বিষয়ে খুব সচেতন নয়। লর্ড র‍্যাডক্লিফের সাইপ্রাস-দৌত্য তাই সফল হয়নি, যেমনটি হতে পেরেছিল ভারতে 'Divide and Quit' মন্ত্রের জোরে। ভিকির কার্টুনে তাই দেখি, লর্ড র‍্যাডক্লিফ সাইপ্রাসে এক জনশূন্য প্রান্তরে মাটির ঢিবির উপরে রাজকীয় কায়দায় বসে আছেন, তাঁর চারদিকে বেশ শক্ত মোটা ক'রে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আর সামনে ফলাও ক'রে নোটিশ—"আমি সকলের সঙ্গে দেখা করব!" ("I'll meet everybody!") সাইপ্রাস-নাটকের পঞ্চমাঙ্কের পরিস্থিতি এখন এইরকম; শেষ দৃশ্যে কি হবে তা' কল্পনা করা দুঃসাধ্য। Strategic island দখলে রাখলেই সাম্রাজ্যের সামরিক স্বার্থ নিরাপদ, এই ভ্রান্তধারণা বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এখনও ছাড়তে পারেননি। অথচ সাইপ্রাসের ঘাঁটি থেকে অতর্কিতভাবে মিশরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ায় বৃটেনের সামরিক কিংবা সাম্রাজ্যিক কোনও স্বার্থই শক্তিশালী হয়নি, নৈতিক পরাজয়ের কথা বাদ দিলেও এটা এখন সুস্পষ্ট।

পার্সি আর্নল্ডের সাইপ্রাস-অভিজ্ঞতার বিবরণে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ অবশ্য নেই, থাকা সম্ভব নয়। তবে আর্নল্ড একজন উদারচিত্ত স্পষ্টভাষী সত্যানুসন্ধানী সাংবাদিক। ১৯৪২-৪৫এ সাইপ্রাসের একমাত্র ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে সাইপ্রাসের শাসনব্যবস্থা ও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিযোগগুলি তিনি বে-সরকারী চোখ দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, সহৃদয়তার সঙ্গে সাইপ্রাসের ভবিষ্যত বিচার করতে চেষ্টা

করেছিলেন। আর্নল্ডের সাইপ্রাস-দর্শনের অভিজ্ঞতা দশ-এগার বৎসর পূর্বের হলেও তাঁর বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা সাইপ্রাসের বর্তমান অবস্থাটি বুঝবার পক্ষে চমৎকারভাবে কার্যকরী। ইংরেজ সাংবাদিকের স্মৃতিকথা হিসাবেই বইখানি সরস, সুখপাঠ্য। সবচেয়ে আনন্দের এবং প্রশংসার হলো তাঁর স্পষ্টভাষণ। উপনিবেশবাদ কথা 'কলোনিয়ালিজমের' উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ এবং বেলজিয়ান শাসক-অভিভাবকেরা চিরকালই প্রশংসায় পঞ্চমুখ—উপনিবেশের মালিকেরা নাকি তাঁদের অধীন নাবালক প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই উপনিবেশ চালিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষেও কোনও কোনও মহল বিভিন্ন বিদেশী 'এম্‌ব্যাসী'র কৃপায় উপনিবেশবাদের উপকারিতা বর্ণনায় প্রশংসাকীর্তনে উৎসাহী হয়েছেন সম্প্রতি। এঁদের মতে সুসভ্য ফরাসী উপনিবেশবাদ আলজেরিয়া, মরক্কোর অধিবাসীদের পক্ষে খুব খারাপ নয়, অকৃতজ্ঞ মিশর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক 'অবদান' অস্বীকার ক'রে বড়ই নির্বুদ্ধিতা করেছে। এই ধরনের অনেক ইঙ্গ-ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশবাদের নতুন সহৃদয় মূল্যায়নের জন্য ওকালতি পর্যন্ত সুরু করেছেন। পার্সি আর্নল্ডের কয়েকটি মন্তব্য তাই এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপনিবেশবাদ তথা 'কলোনিয়ালিজমের' পরম উপকারক ভূমিকার ছলনা ও কপটতা ইংরেজ সাংবাদিক পার্সি আর্নল্ড ভালোমতোই দেখেছেন সাইপ্রাসে। আর্নল্ডের কথা দিয়েই উপনিবেশবাদের নতুন দরদীদের জবাব দেওয়া যায়—

"Why then in 1955 and early 1956 were there camps of Cyproits detained without trial, and troops everywhere searching town and village, seashore and forest for subversive elements? . . . . Why is Britain there at all? Indeed, it is precisely because most Englishmen do their best to avoid first this question—why is Britain there at all? —that most of the misunderstanding arises about Cyprus and in Cyprus.

For my part, I find it first a little difficult to believe that Britain continues to occupy Cyprus, as I have heard it said, in order to build roads, which Britain has done moderately well ; or to eliminate malaria, which she has done excellently ; I can indeed, almost believe, having seen the zeal that can possess technical officers, that Britain is in Cyprus so that a forestry official can, before he dies or is transferred, repair the forestal ravages of the ancient Egyptians seeking timber for their ships, but even so, I find it hard to believe that this weighs heavily at British Cabinet discussions about the fate of Cyprus ; I also doubt if Britain is in Cyprus in order to give to the island low-interest loans and free grants now totalling in all some £ 8,000,000 from the Colonial Welfare and Development and other Funds ; and so I do not believe that Britain remains in Cyprus for any one of these reasons, or for the sum total of them.

I find it a decadent form of imperialism for Englishmen to parade a dozen and more pretexts why Britain should remain in Cyprus. They are merely endeavouring to hide the real reason from themselves, because they certainly don't succeed in hiding it from anyone else—and particularly not from the Cypriots. Cypriots—whether they approve, acquiesce or disapprove—know perfectly well why Britain retains control of their homeland.

Britain is in Cyprus in her own interest, and that is her strategic interest. The strategy may be misguided—the Navy for long regarded Cyprus as a disadvantage rather than an advantage, and in 1878 it was the Army that recommended Cyprus as a British place of arms in the eastern Mediterranean ; or in three quarters of a century strategy may have changed, but, just as it was the motive that led Britain into occupying the island in 1878, so it remains the overriding reason keeping Britain there till now."

সরোজ আচার্য

The Dragon and the Unicorn. *By* Kenneth Rexroth. New Directions. New York. $ 3.00.

আধুনিক মার্কিন কবিদের আমি যথেষ্ট সমীহ করি কিন্তু তাঁদের কাব্যকলার কোনো তৃপ্তিকর স্বাদ উপভোগে আমি প্রায়শঃই অপারগ। সমীহ করি কেননা অন্য যে অভাববোধ থেকেই তাঁরা কবিতার চর্চা করুন না কেন, আর্থিক অভাব বোধ হয় তার অন্তর্গত নয়। ভদ্রবেতনে কবিরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হয়ে থাকেন; প্রবেশমূল্যের হার উচ্চ হলেও স্বরচিত কবিতাপাঠের অধিবেশনে উৎসাহী শ্রোতার কখনো অভাব হয় না, এবং সংগৃহীত অর্থের সবটাই কবির প্রাপ্য হয়। কবিরা, মোটকথা, সেদেশে বিশিষ্ট নাগরিকদেরই অন্যতম। নানা আকারের, নানান সুরের কবিতা-পত্রিকাও সেদেশে অসংখ্য। মহিলা আর নববিবাহিতের পক্ষে 'অত্যাবশ্যক' বিলাসদ্রব্যের সচিত্র বাতায়ন স্বরূপ পত্রিকাদিতেও কবিতা ছাপার রেওয়াজ সেদেশে বিরল নয়; আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কবিরা যদিও কদাচ সেদিক ঘেঁষেন না, সে ধরনের কাগজে ছাপাতে পারলে মার্কিন দেশেও ঐ একটি পদ্যের আয়েই পুরোমাসের খরচা মোটামুটি উঠে যেতে পারে বলে শোনা যায়। এদিকে বিত্তবান সম্প্রদায়ের মহিলারাও উদারচিত্তে কবিতা-পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করে থাকেন।

কবিদের পক্ষে অবশ্যটা অতিশয় কাম্য সন্দেহ নেই। এবং এই জন্যেই সে দেশের কবিদের সমীহ করতে হয় যে তাঁরা কবিতার মতো একটা ভাষানির্ভর জিনিস রচনা করেই এহেন সভ্য ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছেন—যে কবিতা দিয়ে কোনো আশু কার্যসিদ্ধির কোনোই সম্ভাবনা নেই, এমনকি যে কবিতায় মার্কিন দেশের সমূহ নিন্দা এবং সমালোচনাও অবাধেই করা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক মার্কিন কবিতা বুদ্ধি আর বিদ্যার উপর অতিমাত্রায় নির্ভর বলেই আমার ধারণা, যার ফলে সেসব কবিতা পাঠ ক'রে মনের মধ্যে বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, যদিও সচেতন নৈপুণ্য দেখিয়ে যথোচিত প্রশংসার দাবী অনেকেই করতে পারেন। বলাবাহুল্য রবার্ট ফ্রস্ট, ডাঃ উইলিয়াম্‌স্‌, মারিয়ান মুর, কিংবা কামিংস-এর মতো কবিকে আমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত করছি না।

সমালোচনার ক্ষেত্রে মার্কিন দেশ অগ্রগণ্য। হয়তো মৌলিকরচনার তুলনায় সমালোচনারই সেদেশে অধিকমাত্রায় অনুশীলন করা হয়। এই সমালোচনার গুণেই রেক্সরথ্‌-দের নামের সঙ্গে পূর্বপরিচয় ছিল। বর্তমান কাব্যগ্রন্থেই তাঁর লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো। এবং তার ফল বিশেষ উৎসাহজনক হ'তে পারলো না বলে দুঃখিত। রেক্সরথের এই কাব্যের বিষয় হচ্ছে বৎসরকালব্যাপী ইউরোপ সফর এবং ইউরোপ-আমেরিকার বর্তমান 'অধোগতি' বিষয়ে তাঁর মনোভাব। যন্ত্রসভ্যতা এবং বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার তিনি যে ঘোরতর বিরোধী সে কথা দু'পাতা পড়লেই বোঝা যায় :

England is gone and London,
Sicker than New York, takes its place.

তাঁর চোখে দেখলে, পশ্চিমী পৃথিবীর কোথাও প্রেম নেই; যদি না বারাঙ্গনার আলিঙ্গনে : উদ্‌ভ্রান্ত এই অপসভ্যতা যেন কোন পৈশাচিক আলেয়ার পশ্চাতে ছুটে চলেছে। রেক্সরথের লেখা থেকেই তুলে দিই :

...'America is today a / Nation profoundly deranged, / Demented and sick, because / Americans with very few / Exceptions believe / .... that / Love is measured entirely / In an interchange of / commodities .... / ..... when they wish / To satisfy their passions, / They go to a movie..... / .....

... You will find more peace and more / communion, more love, in a hour / In the arms of a pick up in / Singapore or Reykjavik, / Than you will find in a lifetime / Married to a middle class / White American woman.....

প্রত্যেকের সঙ্গে কবির এ বিষয়ে মতের মিল হবে তা অবশ্য আশা করা যায় না; কবিও সে আশা করেননি। যেমন স্বদেশের, তেমনই পিতৃভূমি ইউরোপ বিষয়েও তিনি অনুরূপ বিচলিত। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে 'দুর্গত' ইউরোপের বর্ণনাই শুধু স্থান পায়নি, সেই সঙ্গে আছে কবির ব্যক্তিগত জীবন-দর্শনের বিবরণ। আট সিলেব্‌ল্‌-এর লাইনে সাজানো গদ্যেরই রকমফের হলেও বর্ণনা অংশের স্থানে স্থানে তবু উৎসাহ জাগে, বাকি অংশকে মনে হয় ওজনে ভারি, ঠিক যেন খাপ খায়নি। আদর্শবাদী এ্যানার্কিস্ট দর্শন নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলে, লেখাই উচিত। কিন্তু দর্শনের ভাষায় তাকে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত করলে বিরক্ত লাগতে পারে, বিশেষত কবি নিজেই যদি মনে ক'রে থাকেন যে :

'Some aspects of its subjects are coruptese and difficult, some are new, at least to those likely to read the book.'

মোটকথা ভ্রমণ বিষয়ের এই কাব্যগ্রন্থে সভ্যতার সঙ্কট নিয়ে কবির যন্ত্রণা এবং সংগত ক্রোধ, আর সমাজ-সভ্যতার কল্যাণ বিষয়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তা যতই প্রকট কবিতার স্থান ততই

সঙ্কুচিত। মনে হতে পারে গুরুগম্ভীর এক আলোচনারই বই যেন, যার সবটা বুঝতে হলে দেশবিদেশের পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস সংক্রান্ত উল্লেখ এবং অসংখ্য পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক।

সবচাইতে বড় কথা, রেক্সরথের কবিতায় তিক্ত বিদ্রূপ থাকলেও পরিহাসবোধ আদৌ নেই। ঠাট্টাতামাসা ক'রে বিষয়টা সাময়িকভাবেও হাল্‌কা করে দিতে তিনি জানেন না। তার ফলে সমস্ত বইটিকে মনে হয় যেন বক্তৃতা। Chile Herold's Pilgrimage লেখা হয়েছিল দেড়শো বছর আগে, পৃথিবী তখন অন্যরকমের ছিল। কাজেই বাইরনী কাব্যের কথা এই প্রসঙ্গে তুলতে চাই না। অডেন আর লুই ম্যাকনিস্‌ আইসল্যাণ্ড ভ্রমণের পর গদ্যপদ্য মিশিয়ে যে চমৎকার পত্রাবলী প্রকাশ করেছিলেন তার সঙ্গেও কি 'দি ড্রাগন এ্যাণ্ড দি ইউনিকর্ণের' কোনো তুলনা হয়? পাশ্চাত্য সভ্যতার ট্রাজেডি মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে—একথাই যদি বক্তব্য হয়, তবে তার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও সে বক্তব্যের যথোচিত ইঙ্গিত থাকা আবশ্যক। আধুনিক কাব্যে তার দৃষ্টান্ত নেই, তাও তো নয়।

নরেশ গুহ

ছবি-ছড়ার দেশে— বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী। কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

পাতায়-পাতায় রঙীন ছবি,—ছবিতে-ছবিতে রঙের আর রেখার জৌলুষ,—তারই মধ্যে মাঝে-মাঝে সংগত ফাঁক রেখে, এবং দু'একটি ক্ষেত্রে ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তরুণদল অবধি মোট উনসত্তর জনের লেখা বাংলা ছড়া সংকলিত হয়েছে 'ছবি-ছড়ার দেশে'-তে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর সংক্ষিপ্ত 'ভূমিকায় সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। স্বয়ং সম্পাদক বলেছেন, "শুধু ছড়া-সংকলন হলে এতোগুলি লেখককে একসঙ্গে পাওয়া যেতো না। কেননা রবীন্দ্রনাথ, যোগীন সরকার এবং আধুনিককালে অন্নদাশঙ্কর ছাড়া নির্ভেজাল ছড়া-লিখিয়ে হিসাবে খুব তাড়াতাড়ি কারো নাম মনে পড়ে না।" সম্পাদক মশাই এই কথাটি লিখে সমালোচককে ভাবিয়ে তুলেছেন, কারণ, 'নির্ভেজাল ছড়া'-র আদর্শ সত্যিই ভাববার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ, সুখলতা, সুকুমার রায়,—এ'রা তো বাংলার কিশোরদলের সর্বপ্রিয় ছড়া-জাতীয় পদ্যের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। সুনির্মল বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে—এ'দের ছড়ারও প্রসিদ্ধি আছে। এইসব ছড়ার মধ্যে অনেক শাখা-প্রশাখা, স্তর, শ্রেণী, জাতির ভাবনা যে দেখা দিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ছড়ারও জাতিভেদ আছে। এবং ছড়ার এই জাতিভেদের তত্ত্ব প্রধানত প্রসঙ্গভেদের মধ্যেই নিহিত। কারণ ধ্বনির যে লঘু, চপল নৃত্যভঙ্গি অথবা ক্ষেত্রবিশেষে যে মন্থর অথচ ভারহীন মসৃণতা আমরা ছড়া-জাতীয় রচনার আবশ্যিক উপাদান বলেই ভেবে থাকি, সেই ধ্বনিগত বিশেষত্ব সবরকম ছড়াতেই স্বীকার করা হয়।

"হিং-টিং-ছট্‌ প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়োলোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায়"

—সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই প্রসঙ্গ-নির্বাচনের মধ্যে বৈষম্য-বিষাদের যতোই ক্ষুব্ধতা থাক্ না কেন, এ উক্তির ঢং যে ছড়ারই,—এ-উচ্চারণের বেগ যে ছড়ারই, তাতে সন্দেহ নেই। আদি যুগে ছড়াও সরল ছিল, জীবনও হয়তো এ-কালের চেয়ে সহজ ছিল। এ-কালে জীবন জটিল হয়ে উঠেছে,—নানান্ চিন্ততে মানুষের মন সদাই ব্যস্ত। ছোটোদের মহলেও বড়োদের ভাবনা প্রবেশ করছে। কারণ, বয়স্ক লেখকরাই ছোটোদের জন্যে লেখেন। বয়স্ক লেখকদের মনে আজকাল অতীতকালের কিশোর-কিশোরীর অভ্যস্ত স্বপ্নের তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই, সেকথা যদিই-বা সত্য হয়, তাহলেও খেদ অনাবশ্যক। কালের গতি কে-ই বা রোধ করতে পারে?

"আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল;
ডাঙায় চরে রুই কাত্‌লা
জলের মাঝে চিল!"

—যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সেই 'মজার মুল্লুকে'র মধ্যে একালের কবিকল্পনা আর যেন প্রবেশের উৎসাহ পায় না। তার চেয়ে অন্নদাশঙ্করের 'তেলের শিশি'র ছড়া বরং অনেক বেশি বাঞ্ছিত,—সে যেন অনেক বেশি সুখের ঢেউ! তাই বলে চারদিকের রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থ-নীতির প্রবীণজনসাধ্য ভাবনাই যে একালের ছোটোদের প্রিয় ছড়ার একমাত্র বস্তু, সে-অনুমানও আদৌ সংগত নয়। অন্নদাশঙ্করের এবং সুখলতা রাওয়ের যে-দুটি ছড়া এই বইখানিতে ছাপা হয়েছে, সে-দুটির তারিফ তো কিছু কম হয়নি। 'মুখে মুখে হবার' থেকে অন্নদাশঙ্করের কৃতিত্বের একটু নমুনা দেখা যেতে পারে—

"বল্ দেখি কোন্ জানোয়ার
লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে?
মনে হয় ল্যাজ দেখে তার
সাপ যেন ডালে ডালে নাচে।
শুনি তোদের অনুমান!
হনুমান। হনুমান।"

ছড়াতে—কতকটা একই ধরনের স্বাদ পাওয়া গেল সুখলতা রাওয়ের লেখা 'ভজা গজা অজা'-র

"ভজা বল্‌ল—'সজারু এ'
গজা বল্‌ল—'না তো না'
অজা বল্‌ল—'খড়কে ঝাঁটা'
কাঠিগুলো দেখ্‌ছ না?"

পশু-পক্ষী নিয়ে একালেও ভালো ছড়ার সম্ভাবনা আছে বৈকি! তবে, মুস্কিল এই যে, স্বভাবের মধ্যে ছড়ার রুচিটা না থাক্‌লে ছড়ার পথ না মাড়ানোই ভালো,—একথাটা অনেক লেখকও বোঝেন না, সম্পাদকও এ-বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন না। সুনীলচন্দ্র সরকার বাঘা-কুকুর সম্পর্কে যে ছড়াটি লিখেছেন তাতে বাঘা যে কেবলই 'শয্যাবীর'—তার সমস্ত প্রতাপের ঘোষণা যে নেপথ্যবর্তী 'শেয়াল কটাশ ভাম'-দের উদ্দিষ্ট এবং আসলে সেই বাঘা-বীর যে নিতান্তই শয্যাসীন গর্জনসর্বস্ব জানোয়ার, এই মজার খবরটি যথোচিত ধ্বনিগুণে সার্থক হয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'দর্শন'-এর মধ্যেও জন্তুর জায়গা হয়েছে এবং সে জন্তু-প্রসঙ্গ মোটেই বেমানান নয়।

"চামড়াই তার বাসা।
তার মধ্যেই থেকে গরু
হাত পা খেলায় খাসা
গুঁতোয় গরু আবার!
চামড়াখানি খুলে নিলেই
শ্রীমান গরু কাবার।"

—ধন্য এই গো-তত্ত্বের ব্যাখ্যান! এতে রাণ্টীচন্তার তিলও নেই, অতি-কবিত্বের তালও নেই। গরুর চামড়া কোন্ কাজে লাগে?—মাণ্টারমশায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে গরু সম্বন্ধে নরুর এই মন্তব্যটি খাঁটি, নির্ভেজাল ছড়ামাত্র! একেই বোধ হয় নির্ভেজাল ছড়া বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ছড়ার মধ্যে যেসব ভেজাল মাঝে-মাঝে বাজারে চল্‌তি দেখা যায়, সেসব পদার্থের বিশ্লেষণ করলে তাদের এই রকম বস্তুভেদ চোখে পড়ে—কোথাও অতি-কবিত্বের ঢলাঢলি, কোথাও বা অতি-গুরু তত্ত্বচিন্তা বা বিষয়বুদ্ধির উৎপাত। খাঁটি ছড়ার খাঁটি-ভাবটা যে কোন্-কোন্ উপাদানে আশ্রিত তারও একটা তালিকার খসড়া বানানো দুঃসাধ্য নয়। কৌতুক, ক্ষিপ্রতা,—ক্ষেত্রান্তরে অবসাদহীন আবেগও ছড়ার ধর্ম হতে পারে। ছন্দের ঝম্-ঝম্ বাজনা কিংবা টুক্-টাক্ চালটাও কাম্য।

"রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা
ঘর করেছেন আলো;
সমস্ত তার ভালো।
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।"

—বুদ্ধদেব বসুর এই বাদ্যিও থাকতে পারে,—আবার,

"বই তো পড়ো টই পড়ো কি?
তাইতো কাটি ছড়া।
বই পড়া সব মিছেই যদি
না হল টই পড়া॥"

—প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই বাদ্যিও বাঞ্ছিত। তবে, আপত্তি কোন্ বাজনায়? আপত্তি সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে বিয়ে-বাড়িতে শানাইয়ের বদলে ঢাক বাজে, অথবা পাঠাবলির হুজুতের মধ্যে হঠাৎ যখন কেউ বাঁশি বাজায়। এ-বইয়ে তেমন দু'একজনও আছেন। বাংলা কবিতা-সংকলনের একটি নতুন পথ "ছবি-ছড়ার দেশে"র প্রকাশ থেকে শুরু হলো, এমন আশা করা অন্যায় হবে না।

হরপ্রসাদ মিত্র

অতিথি যদি আপনাকে এসে তার তৃষ্ণার কথা জানায়, আপনি তাকে এক পেয়ালা চা ক'রে দিন। —**কনফুসিয়স**

প্রথম পেয়ালায় আমার ঠোঁট ও গলা ভেজে।
দ্বিতীয় পেয়ালায় নিঃসঙ্গতা কেটে যায়।
তৃতীয় পেয়ালায় পরিপূর্ণতা আসে।
চতুর্থ পেয়ালায় দেখা দেয় বিন্দু বিন্দু ঘাম।
পঞ্চম পেয়ালায় আমি পবিত্র।
ষষ্ঠ পেয়ালায় শুনতে পাই সুরলোকের আহ্বান।
সপ্তম, আঃ, কিন্তু আর পান করতে পারবো না। —**লো টুঙ**, টাঙ বংশের কবি

অর্থ এবং ক্ষমতার আসুরিক সংগ্রামে বর্তমান মানবতার আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ। অহঙ্কার এবং বর্বরতার অন্ধ ছায়ায় পৃথিবী পথ হাতড়াচ্ছে। বিদ্যার্জন হচ্ছে, কিন্তু অসৎ বিবেকের মধ্য দিয়ে, দয়া-দাক্ষিণ্যও বিদ্যমান, কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত। জীবনের অমৃত লাভের জন্যে দু'টি মস্ত ড্রাগনের মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তোলপাড় করছে সমস্ত পৃথিবী, কিন্তু ব্যর্থ, ব্যর্থ তাদের চেষ্টা। আর ত্রাণকর্তা যুগাবতারের আবির্ভাব প্রতীক্ষায় বসে আছি আমরা।...আসুন, ইতিমধ্যে একপেয়ালা চায়ে চুমুক দেওয়া যাক। বিকেলের অস্তসূর্যের স্বর্ণাভায় বাঁশবনের মাথা রঙিন হ'য়ে উঠেছে, আনন্দে অস্ফুটে ধ্বনি তুলতে তুলতে চলেছে ঝর্ণাধারা, আর ঐ পাইনবনের মৃদুমর্মর শোনা যাচ্ছে আমাদের কেটলির ফুটন্ত জলে। —**ওকাকুরা**, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জাপানী কবি

যেদিন থেকে চায়ের পাতার চল হলো, সেদিন থেকে কী বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজই না করছে সামান্য ঐ চায়ের পাত্রটুকু। কত হাজার হাজার মেয়ে কেঁদেছে এই চায়ের জন্যে! কত অসুস্থের বিছানার পাশে ধোঁয়া উঠেছে এর! কত জ্বরে-পুড়ে-যাওয়া ঠোঁট শক্তিসঞ্চয় করেছে এর থেকে! মেয়েদের দিয়ে চায়ের চারা লাগিয়ে প্রকৃতি কত উপকারই না করেছে। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, কত ছবি গড়ে ওঠে, কত কল্পনা স্ফূর্তিলাভ করে এই চায়ের পেয়ালা আর পাত্রটিকে ঘিরে। —**থ্যাকারে**

আমি ভীষণ চা খাই, যাকে বলে নির্লজ্জ পাঁড় চা-খোর। চা খেয়ে, সন্ধেটা আনন্দে যায়... মাঝরাত্তির শান্তিতে কাটে...আর ভোরবেলাকে স্বাগত জানাই। —**ডক্টর জনসন**

আপনার শীত-শীত বোধ হ'লে চা আপনাকে উষ্ণ করবে।
খুব গরম বোধ হ'লে চা আপনাকে ঠাণ্ডা করবে।
বিমর্ষ হ'লে চা আপনাকে উৎফুল্ল করবে।
উত্তেজিত হ'লে চা আপনাকে শান্ত করবে। —**গ্ল্যাডস্টোন**

চা খেয়ে আমার মাথা হালকা মনে হলো, কোনরকম ভয়-ভ্রান্তি আর রইলো না। —**ডিউক অব ওয়েলিংটন**

চায়ের বাক্সে অনেকখানি কাব্য এবং মধুরে অনুভূতি বর্তমান। —**এমার্সন**

চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে।
উগ্রবণ উচ্ছল
কাথলিতল-জল
কল কল হে। —**রবীন্দ্রনাথ**

Balmer Lawrie & Co., Ltd.

ENGINEERS MERCHANTS AGENTS

Calcutta
Bombay
New Delhi
Asansol

চতুরঙ্গ

—ত্রৈমাসিক পত্রিকা—

নিয়মাবলী—বৈশাখ হইতে বর্ষ সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" প্রকাশিত হয়। মূল্য বার্ষিক সডাক (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান) ৪৸০ আনা, প্রতি সংখ্যা ১৵০ আনা। বৈদেশিক ১০ শিলিং। "চতুরঙ্গ"-এ প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটওয়ালা লেফাফা থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে। ১০ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য ১৲ টাকা আগে পাঠানো প্রয়োজন। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। বিনামূল্যে নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয় না। নমুনার জন্যে দেড়টাকা পাঠাতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার :

সাধারণ পৃষ্ঠা ২৫০৲ টাকা ; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১২৫৲ টাকা

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

বিনিময় পত্রিকাদি, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা ১৩